বিবিধ কথা

বিবিধ কথা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

সূচী

---

৪১ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে "শৃঙ্গে"র স্থলে ভ্রমক্রমে "গৃহে" ছাপা হইয়াছে।

মুখবন্ধ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন কালে, আমি বাঙালী জাতির সংস্কৃতি ও সাধনার, এবং তাহার অতিশয় বর্ত্তমান লক্ষণ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সকল ভাবনা ভাবিয়াছি, এবং যাহা এতদিন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা আশ্রয় করিয়া ক্রমশ পাঠক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছিল, তাহারই কতকগুলি উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে সংগ্রহ করিলাম। এ আলোচনাও সাহিত্য-চিন্তার বহির্ভূত নয়; কারণ, প্রথমত, যে-কোন সাহিত্যের সহিত পরিচয় করিতে হইলে, তাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার—সেই কালে সেই সমাজের অন্তস্তলে প্রবাহিত সর্ব্ববিধ ভাবধারার—সংবাদ লইতে হয়। শুধুই কবি ও সাহিত্যিক নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সকল বিশিষ্ট ভাবুক, মনীষী ও কর্ম্মীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাঁহাদের সাধনা ও ব্যক্তি-চরিত লক্ষ্য না করিলে, জাতির সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকেও বুঝিয়া লওয়া যায় না। এই গ্রন্থের দুই একটি প্রবন্ধ বাদে, আর সকলগুলিতে সেই সাহিত্যিক জিজ্ঞাসার বশে, বর্ত্তমান বাঙালী-জীবনের ভিতর-বাহিরের কিঞ্চিৎ পরিচয় সাধনের চেষ্টা আছে; কথাগুলি বিবিধ হইলেও তাহাদের মূলে সেই একই উৎকণ্ঠার আভাস পাওয়া যাইবে। 'সত্য ও জীবন', 'দুঃখের স্বরূপ', এবং 'মৃত্যুদর্শন'—এই তিনটি রচনায় কোন বিশেষের ভাবনা নাই—থাকিলেও, তাহা, বাহিরের জীবন অথবা সাহিত্যের সহিত দূর-সম্পর্কিতও নয় বলিয়া মনে হইবে। তথাপি, এগুলির মধ্যে যে সকল

চিন্তাগ্রন্থি মোচন্ করিবার প্রয়াস আছে—তাহা সকল মানুষেরই আত্ম-চেতনার মূলে বিদ্যমান। সাহিত্যই হউক, কিংবা অপর যে-কোন সাক্ষাৎ চিন্তা বা সমস্যার বস্তুই হউক—সেই সকলের মূল্য শেষ পর্য্যন্ত যে আমাদের আধ্যাত্মিক ভাব ও অভাবের দ্বারাই নিরূপিত হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি এই কয়টিতে সেই ভাব ও অভাবের সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা যে ভাবে করিয়াছি তাহাতে আমার প্রাণকেই প্রামাণ্য করিয়াছি, অর্থাৎ, তাহা একান্তই ব্যক্তিগত ধ্যান-কল্পনার ফল; এজন্য, এগুলিকে খাঁটি 'রচনা' হিসাবেই আমি পাঠকগণের প্রাণের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

'বাঙালীর অদৃষ্ট' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি সর্ব্বশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিবার আছে। এই প্রবন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা আদৌ ঐতিহাসিক গবেষণা নয়; আমি ইহাতে জাতিহিসাবে বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ের যে চেষ্টা করিয়াছি, সে পক্ষে—ধর্ম্ম, সমাজ, ও সাহিত্যে তাহার অন্তর্জীবনের যে ধারা আজিও সমান বহিয়া চলিতেছে, এবং গত শতাব্দীতে প্রবল পরধর্ম্মের সহিত প্রথম সংঘর্ষে তাহার যে পরিচয় আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—তাহার উপরেই প্রধানত নির্ভর করিয়াছি। সেই চরিত্রের সকল লক্ষণ মিলাইয়া দেখিবার সামর্থ্য বা অবকাশ আমার হয় নাই; তথাপি, আমার বিশ্বাস, বাঙালীর যে ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই—সেই ইতিহাস যখন সম্পূর্ণ তথ্য-প্রমাণ সহকারে লিখিত হইবে; যখন, আমি যাহাকে 'অদৃষ্ট' বলিয়াছি তাহা 'দৃষ্ট' হইবে, তখন ভিন্ন উপায়ে লব্ধ আমার এই জ্ঞান ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত বলিয়া মনে হইবে না। ইদানীন্তন কালে যে কয়টি অনন্যসাধারণ প্রতিভায় জাতির সেই বৈশিষ্ট্য অতিশয় লক্ষণীয়

হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহাদের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহা যদি কোন অংশে যথার্থ হইয়া থাকে, তবে আশা করি, আমার এই আলোচনা ব্যর্থ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার ফলাফল সম্বন্ধে আমি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইবেন জানি, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমি এ প্রবন্ধে—যেমন অন্যত্র বহু প্রসঙ্গে —রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব বা ব্যক্তিপ্রতিভার মূল্য নির্দ্দেশ করি নাই। বাঙালীর জাতি-ধর্ম্মের বিকাশে এবং তাহার যুগোচিত সংস্কৃতি-সাধনে সেই প্রতিভা কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহারই একটা ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছি; এবং তাহাতেও আমি আমার আনুপূর্ব্বিক চিন্তা-ধারারই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছি। আমার সেই সিদ্ধান্ত অপ্রিয় হইতে পারে—কিন্তু যদি তাহা যুক্তিবিরুদ্ধও হয়, তবে সমগ্র আলোচনাই নিষ্ফল হইয়াছে। এ যুগ ব্যক্তি-প্রাধান্যের ও বিশ্বমানবতার (দুই-ই মূলে এক) যুগ। এ জন্য আজকাল অনেকেই জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলিয়া কিছুকে স্বীকার করেন না; তাহা ছাড়া, বাঙালীর আবার এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা গুরুতর আলোচনা বা গণনার যোগ্য হইতে পারে—এমন প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করিয়াছেন। এই শ্রেণীর আধুনিক পণ্ডিতগণের মানস-অভিমান তৃপ্ত করিবার দুরাশা আমার নাই; কিন্তু বাঙালীর চরিত্রে ও বাঙালীর ভাবনা-সাধনায় যে একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে, এই প্রবন্ধে তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ দিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বাকি দুই একটি প্রবন্ধ 'বিবিধ কথা'র বিবিধত্বেরই নিদর্শন।

নীলক্ষেত, রমনা
ঢাকা, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪৮।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জাতির জীবন ও সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পরিচয় করিতে গিয়া এই জাতির সমাজ ও ধর্ম্মজীবন, নৈতিক সংস্কার, পুরুষপরম্পরাগত সাধনার ধারা—তাহার অন্তরের আকৃতি ও বাহিরের দৈন্য, মনের দীপ্তি ও চরিত্রের দুর্ব্বলতা—যে ভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আজ এই জাতির জন্য আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে জাতিস্মরতার বেদনা জাগিয়াছে, এ জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দর্শনে আমি অতিশয় বিহ্বল হইয়াছি। আজ আমি বাঙালী কবি ও বাংলা কাব্যের কথায় উৎফুল্ল হইতে পারিতেছি না, এমন কি, বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হইলেও, সে চিন্তাও দূর করিয়া আপাতত এই জাতির জীবন-মরণ সমস্যার কথা ভাবিয়া অধিকতর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি। বাংলা সাহিত্যের কথা যখন চিন্তা করি, তখন ইহাই ভাবিতে বাধ্য হই যে, যে ভাষা ও যে সাহিত্য আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি, এবং আধুনিক ভারতের সংস্কৃতিকে যাহার দ্বারা পুষ্ট করিয়াছি, সেই সাহিত্য ও সেই ভাষা এক শতাব্দী পরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হইবে কি না; এত বড় মন্বন্তরের মুখেই যদি পড়িতে

হইবে, তবে এই স্বল্প কালের জন্য আমাদের এই জাগৃতি ঘটিল কেন? আমাদের দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের জন্ম হইল কেন? বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন বয়স অল্প ছিল, প্রবল জীবনানুভূতি যখন মৃত্যুকে স্বীকার করিত না, তখন সে যুগের সেই ঘূর্ণিবাত্যায় বাঙালীর বাস্তুভিটার ভিত্তিমূল যখন টলিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আত্ম ও পর উভয়বিধ শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে যখন ভিতরে ও বাহিরে আগুন লাগিয়াছিল—তখনও আশা করিতাম, এ জাতি মরিবে না; শ্মশানে শব লইয়া সাধনা করার অভ্যাস ইহার আছে, তাই বিভীষিকার সকল প্রহরে ইহার প্রাণশক্তি অটুট থাকিবে, ভিখারী হইয়াও সে অমৃতের স্বাদ ভুলিবে না। কারণ, তখনও উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজন্মের ঘটনা দূরবর্ত্তী হয় নাই—বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগরের করস্পর্শ এ জাতির বক্ষে তখনও শীতল হয় নাই। তাই মনে হইত, যে মাটিতে এই সকল অমর প্রাণ অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে মাটিতে জীবনের অমর বীজ নিহিত আছে, মৃত্যু তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আজ আর সে ভরসা পাইতেছি না; দিকে দিকে মৃত্যুর বাতাস বহিতেছে, জাতির জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, যেন জীবধর্ম্মও লোপ পাইতেছে।

কালরাত্রির এই প্রহরে, এই সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে, ঘোর ঘনঘটাক্ষুব্ধ আকাশতলে দাঁড়াইয়া আমি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী প্রতিভার বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি আলোচনা করিব? আমার মত ব্যক্তিও—যে চিরদিন ভাব-চিন্তার জগতে ঘুরিয়াছে, যে জীবনের কর্ম্মশালার ঘর্ম্মাক্ত ধূলিধূসর দেহের অভিজ্ঞতা সভয়ে বর্জ্জন করিয়াছে—স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী একটা জীবনই যাহার কাম্য ছিল—সেও

আজ সূক্ষ্ম চিন্তা ও সূক্ষ্ম ভাবের চর্চ্চাকে নিতান্ত নিরর্থক মনে করিতে বাধ্য হইয়াছে। গাছই যদি মরিয়া গেল, তবে ফুলের হিসাবে আর প্রয়োজন কি? ভিটাই যদি উৎসন্ন হইল, তবে পুষ্পোদ্যানের ভাবনা করিয়া কি হইবে? তথাপি একটা কাজ আছে। সাহিত্য তো কেবল কাব্যসৃষ্টিই নয়, ভাষা কেবল বিদ্যারই বাহন নয়। যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে, ততক্ষণ ভাবনাও আছে, সাহিত্যও শেষ পর্য্যন্ত সেই শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবাহ। অতএব একালে সকল সাহিত্য-চর্চ্চার মূলে থাকিবে জাতির জীবনরক্ষার ভাবনা—মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রের আরাধনা।

দেশে অতিশয় বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই, সেদিকে তাকাইলে হৃদয় অবসন্ন হয়। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সে যেন মানুষের হাতে আর নাই—আমরা এখন ভগবানের বা মহাকালের দরবারে বিচারাধীন হইয়াছি। কিন্তু তাহাতেই অভিভূত হইলে চলিবে না, বিনাশের মহাগহ্বরতীরে দাঁড়াইয়া চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। কারণ, মানুষের প্রাণ, কৃতকর্ম্মের বিচার বা প্রায়শ্চিত্তের ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তেও জাগ্রত থাকে—আত্মার দুর্ব্বলতা কোন কালেই মার্জ্জনীয় নয়। মৃত্যু যদি অবধারিত হয়, তথাপি মানুষের অধিকার ত্যাগ করিব না; ন্যায় ও সত্যের নিকটে যেমন মস্তক অবনত করিব, তেমনই মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই প্রেমকে ক্ষুণ্ণ করিব না। আমার জাতি অপরাধ করিয়াছে—ইহাই যদি সত্য হয়, যদি পাপ করিয়াছে বলিয়া দণ্ডের যোগ্য হয়, তথাপি সেই পাপ ও অপরাধকে স্বীকার করিয়াও, তাহার প্রতি প্রেমহীন হইব না। জাতির মধ্যে যদি একজনও প্রেমিক থাকে, তবে তাহার পুণ্যে সমগ্র জাতি উদ্ধার পাইবে;

যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে মৃত্যুতেও সদ্‌গতি লাভ করিব—এই বিশ্বাসে আমাদের প্রত্যেককে সেই প্রেমের সাধনা করিতে হইবে। আজ এই চরম দুর্গতির দিনেও ভগবানের আশীর্ব্বাদে বিশ্বাস রাখিব, প্রেমের মহাশক্তিকে হৃদয়ের মধ্যে সঞ্জীবিত করিব। ইহাই মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রের সাধনা, এবং সে সাধনার জন্য, অন্যান্য ক্ষেত্রের মত, সাহিত্যের পঞ্চবটবেদিকায় আসন দৃঢ়তর করিবার প্রয়োজন আছে।

এ সঙ্কটে, সাহিত্যের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন আরও যে কারণে আছে, তাহাই বলিব। সম্মুখে যে অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া উঠিতেছে, তাহাতে নিকট-ভবিষ্যৎও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় স্বভাবত পশ্চাতে একবার ফিরিয়া চাহিতেই হয়। কিন্তু এ জাতির তেমন ইতিহাস নাই, যাহার দ্বারা উত্তীর্ণ পথের বাধা-বিঘ্ন ও উত্থান-পতনের কাহিনী ভাল করিয়া বুঝিয়া লই। তথাপি বহির্জীবনযাত্রার সেই ইতিহাস না থাকিলেও, এ জাতির অন্তর্জীবনের ইতিহাস, তাহার সাহিত্যের স্রোতোধারায়, কালের অক্ষয় তটে উৎকীর্ণ হইয়া আছে। আমি প্রধানত তাহারই সাহায্যে আমার জাতিকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথাও বলিতে বাধা নাই যে, আমি প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের সাহিত্যই আলোচনা করিয়াছি এবং তাহা হইতেই আমার মনে এ জাতির বিশিষ্ট চরিত্র ও প্রতিভার ধারণা জন্মিয়াছে। তৎপূর্ব্ব-ইতিহাসে যে আর এক জাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহার কথাও জানি; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সেই অপূর্ব্ব উদ্দীপ্তির কথা এই সদ্যতম জাগরণের প্রখর আলোকে জন্মান্তর-স্মৃতির মত কতকটা ম্লান হইয়া আছে। এ কথাও সত্য যে, সে ইতিহাস ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই, তাহার উপযুক্ত জ্ঞান-সাধনা আমি

করি নাই। তথাপি যেটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে সে যুগের বাঙালী-সমাজের একটা বৃহৎ রেখাচিত্র আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। সে যুগের বাঙালী-জীবনের সেই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার যুগ্মধারার মধ্যে জাতির ধাতুপ্রকৃতির যে পরিচয় পাই, তাহাতে বিস্ময় বোধ করি। স্পষ্ট দেখিতে পাই, শাস্ত্র ও সংহিতার দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ এক সমাজ—সেই সমাজে অতিশয় স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু পুরুষপরম্পরা; এক দিকে ভক্তিসাধনার আত্মবিলোপ, অপর দিকে শক্তিসাধনার বজ্রকঠিন মনোবৃত্তি; আচার-অনুষ্ঠানের নাগপাশে যেমন আত্মশাসন—সমাজের হিতার্থে আত্মসংকোচ, তেমনই, ব্যক্তিগত ভাবসাধনার পূর্ণ স্বাধীনতা। সে যুগের রাষ্ট্রীয় অধীনতার মধ্যেই স্বধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য এ জাতির সেই আগ্রহ—এবং তাহার উপায় উদ্ভাবনে ধর্ম্মে ও সমাজে, ভাবে ও চিন্তায়, প্রতিভা ও মনীষার সেই অভাবনীয় আকস্মিক স্ফুরণ—সে কাহিনী সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর না হইলেও আমি তাহাকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি; উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নূতনতর আদর্শে দীক্ষিত ও প্রভাবিত হইলেও, আমার চিত্ত সেই পিতৃ-পিতামহগণের মহিমা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হয়। আমি রঘুনাথ, রঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্য ও কৃষ্ণানন্দ—সকলের স্মৃতিকে সমভাবে অর্চ্চনা করি। জাতির অতীতকে যে শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করে নাই, সে আত্মজ্ঞান লাভ করে নাই—তাহার আত্মা জাতিভ্রষ্ট হইয়াই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। বিশ্বমানববাদের কোন অর্থ বা মূল্যই নাই, যদি তাহার মূলে জাতিধর্ম্মেরও সুস্থ প্রেরণা না থাকে। যে সমাজের অতীত নাই, সে সমাজ কালস্রোতে শৈবালের মত; তাহার বর্ত্তমানই আছে, ভবিষ্যৎ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার চিত্তবিকাশ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর

সেই নবজাগরণের মধ্যাহ্ন-দিবালোকে, আমি জন্মিয়াছিলাম বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগরের যুগে। তেমন যুগ যে-কোন জাতির ইতিহাসে একটা গৌরবময় যুগ; সে যুগে জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেমের মানুষী-সাধনার জন্য বাংলা দেশে যেন দেবকুল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অসংখ্য সাধকের মধ্য হইতে বাঙালী-প্রতিভার এই তিন চূড়া সেদিন বাংলা দেশের আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল; এই তিন যুগন্ধরই বাঙালী জাতির জন্য বৃহত্তর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন—ইঁহাদের সহিত সেকালের আর কাহারও তুলনা হয় না। তাই বলিয়া আমি অপর কোন বিশিষ্ট প্রতিভার অসম্মান করিতেছি না। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহাদের সাধনমন্ত্র ও সাধনক্ষেত্র সকলের এক ছিল না; না থাকিলেও কেহ কেহ বিশেষ ক্ষেত্রে অপর সকল অপেক্ষা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন; এবং সে প্রতিভা বাঙালীরই, অতএব বাঙালীমাত্রেরই নমস্য। আজ আমি যাঁহাদের বন্দনা করিতেছি, তাঁহাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বই তাহার একমাত্র কারণ নয়—উৎকৃষ্ট চিন্তা, অসাধারণ মেধা বা দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতাই তাঁহাদের মহত্ত্বের কারণ নয়। তাঁহাদের সেই প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ছিল। কেবল মস্তিষ্কচর্চ্চার মৌলিকতা বা আত্মমতনিষ্ঠার নির্ভীকতাই নয়,—সেই আত্মগত অভিমান অপেক্ষা, তাঁহারা জাতিগত চেতনার উৎকণ্ঠায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সাধারণ জনগণের পথেই পথিকের হৃদয়-মনের সঙ্গে আপনার হৃদয়ের যোগ রক্ষা করিয়া, তাঁহাদের কেহ—সমাজ ও শিক্ষা, কেহ—পৌরুষ ও উচ্চাভিলাষ, কেহ বা—আধ্যাত্মিক কল্যাণ, এই ত্রিবিধ মার্গের উন্নতিসাধনে প্রাণের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভার সঙ্গে মহাপ্রাণতার যে অগ্নিদীপ্তি ছিল—হৃদয়ের

যে সত্যকার কাতরতা ছিল, তাহাতেই জাতির প্রাণে সাড়া জাগিয়াছিল, সাম্প্রদায়িক চিত্তোৎকর্ষ নয়—সার্ব্বজনীন চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল। তাই আজিকার দিনে এই তিন মহাপুরুষের মাহাত্ম্যই ধ্যান করিতে হইবে; তাহাতে এই পরম সত্যের উপলব্ধি করিব যে, ব্যক্তিবিশেষের বিবেক বা আত্মগত সত্যের আদর্শ যত বড় হউক, তাহাতে জাতির কল্যাণ হয় না; কোন একটা আইডিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব মনে মনে স্বীকার করিলে এবং তাহাই প্রচার করিলে, এই একান্ত দেহদশাধীন মানুষের মৃত্যুভয় নিবারিত হয় না। আজ ইহাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, নিশ্ছিদ্র যুক্তি, অত্যুচ্চ ভাব, নিরপেক্ষ সত্য—এ সকলের মূল্য বিশ্বজীবনের পক্ষে এবং ব্যক্তির আত্মার পক্ষে যতই কল্যাণকর হউক, জাতির জীবনে তাহার অতিরিক্ত অনুশীলন তীব্র বিষের মতই ভয়াবহ। আমি আজ যাঁহাদের নাম লইতেছি, তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, তাহার মূলে ছিল—পরার্থে আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা; 'আমি' নয়, 'তুমি'—ব্যক্তি নয়, জাতিই ছিল তাহার মূলমন্ত্র।

আজিকার এই সাহিত্য-সভায় আমি যে অসাহিত্যিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, তাহার কৈফিয়ৎ ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। তথাপি আমার এ চিন্তা যে একেবারে সাহিত্যসম্পর্কবর্জ্জিত নয়, তাহার আভাসও আপনারা পাইয়াছেন। দূর ও নিকট ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে না পারিলেও, জাতির এই জীবন-মরণ সঙ্কটের দিনে, আমি যে মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রের সন্ধান করিয়াছি, তাহার নির্দ্দেশ ও আশ্বাস গত যুগের সাধনার ইতিহাসে আছে। সে ইতিহাস মুখ্যত ভাবসাধনার ইতিহাস, এবং সেজন্য তাহার অধিকাংশ সাহিত্য হইলেও, তাহাতে এই জাতির

প্রাণ-ধর্ম্মেরই একটি পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া আছে। আমি এক্ষণে তাহারই সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু বলিব। সে যুগের যে তিন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহাদেরই সাধনায় ও সাধন-মন্ত্রে সেই পরিচয় মিলিবে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাণে যে নূতন ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা, ভারতীয় হিন্দু-সাধনার যে মূল আদর্শ, তাহা হইতে ভিন্ন, কোথাও বা—সেই আদর্শেরই একটা যুগোচিত নূতন প্রবর্ত্তনা। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ শেষ পর্য্যন্ত আত্মা বা অহংকেই মুখ্য সাধনবস্তু করিয়াছে; তাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তা, জীবে দয়া, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টির যে তত্ত্বই থাকুক, তাহার মূল লক্ষ্য—ব্যক্তি; সে সাধনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক—বহুর উপরে একের প্রতিষ্ঠাই তাহার মূল প্রবৃত্তি। এই অধ্যাত্মবাদ ব্যক্তির স্বতন্ত্র মুক্তিসাধনারই অনুকূল; ইহা একান্তই তত্ত্বপ্রধান ও ভাবতান্ত্রিক—জাগতিক সর্ব্বব্যাপারে অনাসক্তির জন্মদাতা। ইহা মানুষকে—অর্থাৎ পরকে—সর্ব্বজীব বা সর্ব্বভূতের সামিল করিয়া দেখে; মানুষের বাস্তব জীবন-সমস্যা, ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি দেহদশার নিয়তিকে কোন পৃথক মূল্য দেয় না; মানুষকে মানুষহিসাবেই শ্রদ্ধা করিয়া তাহাকে ভালবাসার যে মানব-ধর্ম্ম, তাহা এই ভারতীয় আদর্শে কোন বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জাতির যে নবজাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহাতে এই জগৎবিমুখ ব্যক্তিসর্ব্বস্ব আধ্যাত্মিক আদর্শই বিচলিত হইয়াছিল। সেই নব ভাব-বন্যার তিনটি তরঙ্গচূড়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, বাঙালী এই যুগে তাহার জীবনে এক নূতন সত্যের প্রেরণা পাইয়াছিল। সেই ভাব-বন্যার প্রথম বিপুল তরঙ্গ বিদ্যাসাগর; তাঁহার ধর্ম্মে কর্ম্মে, ভাবনা-চিন্তায় আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র ছিল না—

কেবল মানব-সেবার—মানুষের ঐহিক কল্যাণ-সাধনের—এক অতি প্রবল কামনা তাঁহার সারা জীবনে যজ্ঞাগ্নির মত জ্বলিয়াছিল। সেই কামনা এমনই সহজাত ও দ্বিধাহীন যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান—যাঁহার চিত্ত হিন্দুশাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শনে আজন্ম লালিত হইয়াছিল, যিনি হিন্দু-সংস্কার ও হিন্দু-আচারের দ্বারা আজীবন পরিবেষ্টিত থাকিতে আপত্তি করেন নাই—তিনিই হিন্দুর শিক্ষা হইতে ষড়দর্শনকে বহিষ্কারযোগ্য বলিয়া স্বমত-প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মানুষের বাস্তবজীবন-সমস্যার সঙ্গে এইরূপ বিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই; বরং ইহার অতিরিক্ত অনুশীলন মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলে। মানুষের পক্ষ হইতে এতবড় বিদ্রোহ-ঘোষণা এ সমাজে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। এই সঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিরাজি স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কেন বিদ্যাসাগরকেই সেই নবযুগের পূর্ণ প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

এই ধর্ম্মকেই আর এক দিক দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি ভাবের ক্ষেত্রকে একটু সঙ্কীর্ণ করিয়া, মানব-সেবার প্রাথমিক ব্রতহিসাবে, একটা জাতি বা গোষ্ঠীচেতনার উদ্বোধন করিয়াছিলেন; এই মানব-প্রেমকেই একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্-দেশে, তটশালিনী নদীর রূপে, প্রবাহিত করিবার জন্য সমস্ত প্রাণ-মন ও প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এজন্য, তিনি ব্যক্তির স্বতন্ত্র-জীবনকে বৃহত্তর সংঘ-জীবনে যুক্ত করিয়া, ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কল্যাণকে একই সাধনার লক্ষ্য করিয়া 'বন্দে মাতরম্'-মন্ত্র প্রচার করিলেন; এই মন্ত্রে, ব্যক্তিগত ইষ্টসাধনার যে দেবতা, সেই দুর্গা প্রভৃতির স্থানে, জাতি বা গোষ্ঠীর কল্যাণ-রূপিণী দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দেবতার

নাম—দেশ; বিগ্রহপূজক হিন্দুর জন্য তিনি এমন এক বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রতীক নয়; জীবনে প্রতি পদে যাহার সহিত পরিচয়, যাহার মূর্ত্তি রসে ও রূপে সহজে হৃদয়গোচর হয় বলিয়াই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার সাক্ষাৎ উৎস-স্বরূপিণী হইবার যোগ্য, তাহাকেই তিনি আপন প্রতিভাবলে বাঙালীর একমাত্র ইষ্টদেবতারূপে স্থাপন করিলেন। এ ধর্ম্মেরও মূলে রহিয়াছে সেই এক প্রেরণা—মানব-প্রেম ও মানব-সেবা, সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির আত্মবিসর্জ্জন—সকল অহঙ্কার বা আত্ম-মমতার উচ্ছেদ। ইহার পর, সে যুগের সেই নব প্রেরণাই বিবেকানন্দে আরও প্রখর ঊর্দ্ধশিখায় জ্বলিয়া উঠিল; তাহাতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে অস্বীকার না করিয়া—তাহাকে যেন বিপরীত মুখে উলটাইয়া ধরিয়া—অতি তীব্র আধ্যাত্মিক পিপাসাকেই মানব-প্রেমের আকারে শোধন করিয়া লওয়া হইল। আশ্চর্য্য নয় কি? এই তিন মহাপুরুষের জীবনে সেই এক বাণীই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল! সে বাণী এই যে—মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নাই; পুরুষের পরম পুরুষার্থসাধনের ক্ষেত্র এই ইহলোক—এই জগৎ ও জীবন; মানুষের মত বাঁচিতে হইলে মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে, সেই শ্রদ্ধা প্রেমে ও সেবায় সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে; আত্মচিন্তা ও আত্মসাধনা সকল অনর্থের মূল; পরের জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া ধন্য হও—অহংচেতনাকে খর্ব্ব কর। এই তিন জন তিন রূপে এই বাণীকে রূপ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কোন তত্ত্বচিন্তা বা ঐতিহাসিকতার ধার ধারিতেন না। সাক্ষাৎ যথাপ্রাপ্ত জগতে অতিশয় নিকট ও প্রত্যক্ষ যাহা, তাহারই উপরে তিনি যেন অন্ধবিশ্বাসে আপনার হৃদয়-মনকে প্রচণ্ডভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে বাঙালীও কেবল মানুষ—বাঙালীজাতি বলিয়া কোন

সংস্কার তাঁহার ছিল না। বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুর দ্বারা আরও দুরূহ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রবল হৃদয়াবেগ একটা বড় তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়াছিল। সে তত্ত্বও তাঁহার গুরুর মূর্ত্তিতে শরীরী হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের মনুষ্যত্বকে কোন দিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। যে প্রেম ভূমিকে ভূমার সহিত যুক্ত করিয়া এই মর্ত্ত্যজীবনেই মানুষকে মহামহিমার অধিকারী করে—সেই প্রেমকেই বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুর মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন; তাই তাঁহার জন্মগত অধ্যাত্ম-পিপাসা, ব্যক্তিসাধনার পথে বাধা পাইয়া, মানব-প্রেম ও মানব-সেবার বিপরীত মুখে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমন্বয়ের অবতার—তাঁহার প্রদর্শিত পথে, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে বর্জ্জন না করিয়াও, মানুষকে তাহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

যে সঙ্কটের ভাবনায় আমি গত যুগের বাঙালী-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট পরিচয় আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি, সেই সঙ্কটে, এই তিন যুগন্ধর পুরুষের মধ্যে যাঁহার মনীষা ও প্রতিভা সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে অতঃপর কিছু বিশেষ করিয়া বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের মত, এই মানব-ধর্ম্মের সহজ সংস্কারবশে, যুগসন্ধির একটা সাক্ষাৎ প্রয়োজন-সাধনে জীবন উৎসর্গ করেন নাই। বিদ্যাসাগর সমাজের ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া তাহার বর্ত্তমান সম্বন্ধেই পূর্ণ-সচেতন ছিলেন—তাঁহার ভাবিবার সময় ছিল না, তিনি কেবল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মানব-প্রেম কোন চিন্তা-ভিত্তির সন্ধান করে নাই—সে প্রেমকে জাতির ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনবোধ তাঁহার ছিল না। তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বা চিন্তানায়ক—

কোনটাই ছিলেন না; তিনি যেন মানব-প্রেমের সাকার বিগ্রহরূপে সমাজমধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য বিদ্যাসাগর নিজের মধ্যেই নিজে সমাপ্ত, প্রেম ও পৌরুষের একটি অক্ষয় প্রতিমারূপে, এ জাতির পূজা-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিবেকানন্দের মত ছিলেন না; তিনি মানব-প্রেমকে দেশ-জাতি-নিরপেক্ষ একটা অত্যুচ্চ আদর্শের প্রভায় মণ্ডিত করিয়া সর্ব্বমানবের উপযোগী সাধনপন্থা আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি ছিলেন কবি—কেবল ভাবুক বা ধ্যানী নয়,—শিল্পী ও স্রষ্টা। তাই তিনি তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্যের—নির্ব্বিশেষ অপেক্ষা বিশেষের—অনুরাগী ছিলেন। তিনি সর্ব্বমানবের আদর্শকেই, একটা জাতির বিশিষ্ট হৃদয়-মনের উপাদানে, একটা বিশেষ রূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি খাঁটি মানবতার পূজারী, মানবধর্ম্মী ছিলেন বলিয়াই, উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ ভাবের নিরাকার-সাধনা সাবধানে পরিহার করিয়াছিলেন—সকল শ্রেষ্ঠ সংগঠনী ও সৃজনী প্রতিভার মত, তাঁহার প্রতিভাতেও তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে প্রখর বাস্তবজ্ঞান ছিল। তিনি এক দিকে যেমন প্রেমহীন যুক্তিবাদ বা আত্মভাবপন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনই, মহাপ্রেমিক হইলেও—জাতিবর্ণহীন সন্ন্যাসীর আদর্শ তাঁহার আদর্শ হইতে পারে নাই। বিবেকানন্দ মানুষকে তাহার স্বকীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া নির্ভয় হইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও আত্মদর্শন বা অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রেমকে মানুষের সুস্থ ও সহজ জীবন-চেতনায় জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন; এজন্য শাশ্বত সত্যের সন্ধানকে আপাতত দূরে রাখিয়া, এমন একটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—যাহাতে প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রেরণাই মানুষকে তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের

গণ্ডি হইতে উদ্ধার করিতে পারে। তিনি বাঙালীর মধ্যে মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী কালের কবির ভাষায়, "শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি,—লাভক্ষতি টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশভাগ, কলহ সংশয়" তাহার জীবনে অতিশয় প্রবল হইতে দেখিয়াছিলেন ; অতি হীন স্বার্থপরতাই তাহার অধঃপতনের মূল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ইহার ঔষধস্বরূপ, স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রেমকেই তিনি অপেক্ষাকৃত সহজ অথচ উদার সাধনমার্গ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ঋষির মতই ছিল, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সত্যকার যুগধর্ম্মকে ধরিতে পারিয়াছিলেন। মনুষ্যজীবনের মহিমাও তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনই ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুগে মনুষ্যত্ব-সাধনের অন্য পন্থা নাই। অতঃপর উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার সাহায্যে তিনি ইহাকেই রূপে ও রসে একটি সর্ব্বজনহৃদয়বেদ্য মূর্ত্তি দিয়াছিলেন—মনের উপলব্ধিকে প্রাণের প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিলেন। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয়তা-ধর্ম্ম বা 'বন্দে মাতরম্'-মন্ত্র বিলাতী 'ন্যাশনালিজ্‌ম' নয় ; ইহা অতিশয় আধুনিক হইলেও—ইহার মূলে য়ুরোপীয় প্রভাব থাকিলেও, বঙ্কিমের প্রতিভা ইহাকে ভারতীয় উপাদানে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাতে স্থূল বাস্তব বা ব্যবহারিক সত্যের বশ্যতাও যেমন ছিল, তেমনই ভারতীয় হিন্দুমনের শ্রেষ্ঠ আকৃতির কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। ইহাকেই বলে—সৃষ্টি-প্রতিভা! মনীষার সঙ্গে উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টির এই মিলন হইয়াছিল বলিয়াই সে যুগের বাঙালীর ইতিহাসে এমন একটা নবজীবনপ্রয়াস সম্ভব হইয়াছিল।

এমনই করিয়া আমরা সেদিন আসন্ন মন্বন্তরের সূচনামাত্রে মৃত্যুকে

জয় করিবার উদ্যম করিয়াছিলাম। এই যে নবধর্ম্মের প্রেরণা, ইহার মূলে ছিল—প্রেম; আত্মদানের মহাব্রতই এই নবধর্ম্মসাধনার নামান্তর। মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, কিন্তু আপাতত তাহার সাধন-ক্ষেত্র এই দেশ ও এই সমাজ। এ সাধনার প্রথম সোপান—চিত্তশুদ্ধি; তজ্জন্য নিজ জাতি ও নিজ সমাজের কল্যাণকে একান্তভাবে বরণ করিতে হইবে; তাহাতে জাতি বাঁচিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমারও আত্মার সদ্‌গতি লাভ হইবে। জাতির সেবা করিতে হইলে—তাহার পাপ, তাহার অজ্ঞান, তাহার সকল দুর্গতি ও লাঞ্ছনা আপনার সর্ব্ব অঙ্গে বহন করিতে হইবে; পতিতের পাতিত্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না, সেই পাতিত্যকে নিজেরই পাতিত্য মনে করিয়া অধীর হইতে হইবে। এই প্রেম বিবেকানন্দেরও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেম-কল্পনা দেশমাতৃকার একটি মহনীয় মূর্ত্তির ধ্যান ও তাহারই দেশকালসম্মত বিগ্রহ রচনা করিয়াছিল; তিনি সেই মূর্ত্তির প্রতি ভক্তি উদ্রেক করিয়া পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাইতে চাহিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের প্রেম জ্ঞানমূলক, বঙ্কিমের ভক্তিমূলক; বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতির মর্ম্মের কথা জানিতেন।

কিন্তু এই ধর্ম্মের সাধনপথে শীঘ্রই বিঘ্ন উপস্থিত হইল। প্রথমত, জাতি মানুষ হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই রাজনৈতিক সংগ্রামে মাতিয়া উঠিল। যাহারা অন্তরে জ্ঞান ও শক্তি লাভ করে নাই, নিঃস্বার্থ জনসেবার দ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই—তাহাদের পক্ষে এই রাজনৈতিক আন্দোলন পরধর্ম্মের মতই ভয়াবহ। আগে সমাজ, পরে রাষ্ট্র—অন্তত জাতির শিক্ষা ও সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত না হইলে, রাজনীতির আলেয়া যে তাহাকে দিক্‌ভ্রান্ত করিবেই, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই জানিতেন; এজন্য তাঁহারা এ বিষয়ে বার বার

জাতিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের আর তর সহিল না—বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণীরই এক ভাব-বিকার উৎকট আত্মত্যাগের মোহে জাতিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল—প্রবল জীবনানুভূতিই তীব্র সন্ন্যাস ও মৃত্যুপিপাসার নিদান হইল। সেই সময়ে ভাগ্যদোষে এমন সকল নেতা ও শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব হইল, যাঁহাদের আত্ম-অভিমান অথবা পর-বিদ্বেষ জাতি-প্রেমকেও অতিক্রম করিল—জাতির ঐতিহ্য, তাহার গূঢ়তর ভাব-অভাবের সহিত ইঁহাদের পরিচয় ছিল না, জাতির সহিত সামাজিক হৃদয়-বন্ধনও ছিল না। এক দিকে যেমন এই রোচক মিথ্যা বা পরানুচিকীর্ষা প্রসূত আবেগের উত্তেজনা, তেমনই আর এক দিকে, সাহিত্যের আদর্শও ইতিমধ্যে দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল—সমাজের উপরে ব্যক্তির, বস্তুগত তথ্যের উপরে ভাগবত সত্যের প্রাধান্য বাড়িয়া উঠিতেছিল। শেষে সমাজ ভাঙিতে আরম্ভ করিল; জাতি, গোষ্ঠী বা সংঘের সকল চেতনা লোপ পাইতে বসিল। গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই আত্মঘাতী আত্মপরায়ণতা অন্যান্য কারণ সহযোগে দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছে। দারুণ অভাবের তাড়নায়, সমাজের নিম্ন ও মধ্য স্তরে, মনুষ্যত্বের পরাজয় যেমন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই, সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া সমাজকে রক্ষা করাই ছিল যাঁহাদের স্বাভাবিক অধিকার—সেই ধনী মানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ জাতি ও সমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন; নৃত্যকলার যে নটমনোভাব, এবং নবতন ব্যক্তিতান্ত্রিক সাহিত্যের যে স্বৈরাচার—একালে তাহাই উৎকৃষ্ট কাল্‌চারের নিদর্শনরূপে, তাঁহাদের দারুণ স্বার্থপরতার আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিত্রিক অধঃপতন হইতে এই যে নূতন ব্যক্তিধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কাহিনী আমি আর

এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করিব না—জাতির পক্ষে তাহা গ্লানিকর, ভাগ্যদেবতার পরিহাসরূপে তাহা অসহ্য বেদনাময়। একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখা যাইবে, জাতির আত্মবিনাশ-যজ্ঞের সেই অগ্নি এখনও দিগন্ত জুড়িয়া জ্বলিতেছে। আজ আমরা জাতীয়তার নামে শিহরিয়া উঠি; মানবজাতির ইতিহাসে যাহা অতুলনীয়, সেই হিন্দু-সংস্কৃতির উল্লেখ করিতেও আমাদের রসনা অবশ হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই নয় যে, আমরা এক্ষণে আরও বড় সংস্কৃতি লাভ করিয়াছি—আমাদের প্রাণে-মনে কোন উদারতর উপলব্ধি ঘটিয়াছে। ইহার এক মাত্র কারণ, আমাদের মনুষ্যত্ব আর বাঁচিয়া নাই, আমাদের চরম অধঃপতন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতির চরিত্রে যে কদর্য্য স্বার্থপরতা দেখিয়া শঙ্কিত, এমন কি হতাশ হইয়াছিলেন, তাহাই আজ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কাল্‌চারের অনুমোদন পাইয়া নির্লজ্জ তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে। বড় কথাকে আমরা সাগ্রহে শিরোধার্য্য করিয়াছি, পাছে ছোট কথার অপরিসর গণ্ডিতে আত্মসুখচর্চ্চার ব্যাঘাত হয়। আজ বাঙালীর বিদ্যাসাগর নাই, বঙ্কিমচন্দ্র নাই, বিবেকানন্দ নাই; শিবা ও সারমেয় বেষ্টিত কয়েকটা শশ্মান-প্রহরী মাত্র আছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে আমাদের নবজীবনলাভের প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার কাহিনী সংক্ষেপে আপনাদিগকে শুনাইলাম। ইহা অবশ্য ঘটনা বা তথ্যগত ইতিহাস নয়; কিন্তু জাতির চারিত্রিক কোষ্ঠীবিচারে যে গুরু-বল ও শনির দৃষ্টি—উভয়ের ফলাফল দেখা যায়, আমি সাধ্যমত তাহাই বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি—ঘটনাগত ফলাফল আপনারা মিলাইয়া দেখিবেন। আপনারা যেরূপ সাহিত্য-সেবায় ব্যাপৃত আছেন, তাহার সহিত জাতির এই

ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথাও যেন ভাবনা ও চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। সাহিত্যের সঙ্গে জাতির সর্ব্ববিধ আশা-আকাঙ্ক্ষার যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ, তাহা আপনারা জানেন; বাহিরের সংঘাতে জাতির অন্তর্জীবনে যে স্রোতোবেগ বা তরঙ্গভঙ্গ উৎপন্ন হয়, সাহিত্যের উন্নতি-অবনতি মুখ্যত তাহার উপরেই নির্ভর করে। সেই স্রোত যদি রুদ্ধ হইয়া আসে, বাহিরের জগতে যদি সে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তখন আর সাহিত্যের সাহিত্যিক সমস্যা, ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বই, কোনও বিদ্বন্মণ্ডলীর একমাত্র গবেষণার বস্তু হইয়া থাকিতে পারে না। তাই আজিকার দিনে আমি সাহিত্য অপেক্ষা জীবনের কথা ভাবিতেছি, সাহিত্যের কলাশিল্প অপেক্ষা তাহার অন্তর্গত পৌরুষ, প্রতিভা ও প্রাণশক্তির সন্ধান লইতে ব্যাকুল হইয়াছি। জাতির ভাষা ও সাহিত্যই তাহার প্রাণশক্তির আধার, সেই আধারেই তাহার শ্রেষ্ঠ সাধনার সিদ্ধিফল সঞ্চিত হইয়া থাকে; কিন্তু অমৃতের সঙ্গে বিষও উৎপন্ন হয়, জীবনের উৎসঙ্গে মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ না হইতেই আমাদের সাহিত্যে সেই মৃত্যুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে—জীবনোত্তাপবর্জ্জিত ভাবসৌন্দর্য্যের আরাধনা, আত্মরতির গীত-রস, ও কলাকৌশলময় শব্দবিন্যাসের মোহ আমাদের মেরুদণ্ড শিথিল করিয়াছে—চরিত্রবল হরণ করিয়াছে। এ যুগে সাহিত্যের যে আদর্শ আমাদিগকে মুগ্ধ করিল, তাহা ব্যক্তির মানস-বিলাসের অনুকূল; তাহাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ আত্মীয়তার অবকাশ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল; সামাজিকতা ও সমজাতীয়তার যে প্রাণ-স্পন্দন ও তজ্জনিত যে দায়িত্ববোধ, তাহার পরিবর্ত্তে স্বৈরতন্ত্রের দুর্নীতি, ও আর্টের সর্ব্বসংস্কারমুক্তি অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইল; এবং তাহার ফলে

একালে ইহাই যেন সত্য হইয়া উঠিল যে—"for the creative artist the right and wrong of æsthetics are above the right and wrong of morality"। আমাদের মত একটা জাতি, যাহার জীবনই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারে নাই, যে বহুকালের জড়ত্বের পর সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার সাহিত্যে এই তুরীয় ভাব-সাধনার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে; সেই সঙ্গে ইহাও চিন্তা করুন যে, এ জাতি স্বভাবতই ভাবপ্রবণ, কর্ম্ম অপেক্ষা স্বপ্নের প্রতিই ইহার আস্থা অধিক; ইহার—সাহিত্যে জীবনের প্রভাব অপেক্ষা, জীবনের উপরেই সাহিত্যের প্রভাব বেশি। এ হেন জাতির পক্ষে 'right and wrong of morality' হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এমন সুযোগ ব্যর্থ হইতে পারে না। এমনই করিয়া আমরা অবশেষে জীবনকে তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুর সাধনা করিয়াছি।

জাতির যে অবস্থা আমি চিত্রিত করিয়াছি, আপনাদের অনেকের মতে হয়তো তাহাতে কিছু অতিরিক্ত নৈরাশ্যের ছায়া আছে; যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাহাতে আমা অপেক্ষা কেহ অধিক সুখী হইবে না। কিন্তু আমি গতযুগের সহিত এ যুগের প্রবৃত্তির তুলনা করিয়া যে সকল দুর্লক্ষণ গণনা করিয়াছি—এবং জাতির যে পরিণাম আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোথাও আশার স্থল দেখি না। তথাপি এই নৈরাশ্যের মধ্যেও এক আশা আছে, সে আশার কথা সর্ব্বপ্রথমে জানাইয়াছি, এবং তাহারই আশ্বাসে এ পর্য্যন্ত এই দুঃখের কাহিনী আপনাদিগকে শুনাইবার মত সামর্থ্য রক্ষা করিয়াছি। সে আশা এই যে—এমনই দুর্দ্দিনে, এই চরমতম দুর্গতির তলদেশে, জাতির মহাপ্রাণীর নিরুদ্ধ হাহাকার হইতেই শক্তির বিকাশ হইবে; সে শক্তি প্রেমের, এবং

প্রেমের বলিয়াই—অলৌকিক। সে শক্তি অসাধ্য সাধন করে, তাহার প্রাণদ মন্ত্রে মরুভূমিতে উৎসবারি, শুষ্ক তরুতে মঞ্জরীশোভা, এবং রুক্ষ পাষাণে অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হইয়া থাকে। সেই শক্তির আবির্ভাব হইবে—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের তপস্যা নিষ্ফল হইবে না। আমাদেরই বংশধর বর্ত্তমান যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই প্রাণের আভাস ইতিমধ্যেই যেন কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে। সত্য বটে, বয়স্ক-সমাজ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের আচার-আচরণ লক্ষ্য করিয়া, এবং দেশের মধ্যেই কোন শক্তি বা ধর্ম্মবুদ্ধির আশ্বাস না পাইয়া, তাহারা দেশ ও জাতির গণ্ডি অতিক্রম করিবার প্রয়াসী; তাহাতে যে জীবনের সত্য নাই, ইহাও ঠিক। কিন্তু মতবাদের জড়ধর্ম্মের উপরে হৃদয়ের প্রেমধর্ম্ম যদি জয়ী হয়, তবে এ ভুল শীঘ্রই ভাঙিবে, এবং ইহাদেরই মধ্য হইতে সেই পুরুষের আবির্ভাব হইবে, যাঁহার নিশ্বাস-বায়ুর স্পর্শমাত্রে সমগ্র জাতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। এই সঞ্জীবনী-শক্তির প্রমাণস্বরূপ আমি গত শতাব্দীর সেই সাধনার কথা বলিলাম, মানব-প্রেম ও মানব-সেবার সেই প্রাণগত আদর্শের পরিচয় করিলাম। উত্তরকালে মানব-প্রেমের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—এ প্রেম তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ প্রেম আত্মার নামে আত্মপূজা করে না, মানুষকে ভাল না বাসিয়া মহামানবকে ভালবাসে না, ভালবাসা নিষ্ফল হইল দেখিয়া আক্ষেপ ও অনুশোচনায় অধীর হয় না, আপন শুচিতা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা কলুষভয়ে ভীত নয়, মুমূর্ষুর শিয়রে বসিয়া তাহার পাপের পরিমাণ চিন্তা করে না। সেরূপ সূক্ষ্মহিসাবী সত্যনিষ্ঠ প্রেমের মোহ হইতে আমি আমার জাতির মুক্তি কামনা করি। তাহার জন্য যে ধরনের সাহিত্যচর্চ্চা আবশ্যক, সকল সাহিত্য-সংসদ যেন তাহারই সহায়তা করেন—এ কালরাত্রির সকল

প্রহরে সতর্ক থাকিয়া আমরা যেন সেই মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রের সাধনা করিতে পারি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মেদিনীপুর শাখার সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ]

সত্য ও জীবন

আমরা সকলেই সত্যের অনুরাগী; সত্যের যাহা বিপরীত, অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা আমাদিগের মনকে বিমুখ করিয়া তোলে; কথায় ও কাজে আমরা সত্যনিষ্ঠার পক্ষপাতী। কিন্তু এই সত্য কি? জাগতিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক অর্থে ইহার মূল্যভেদ আছে কি না? দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র যে সত্যের সন্ধান বা প্রচার করে, তাহার কোনও প্রয়োজন আছে কি না? এইরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

সত্য ও সত্যবাদ সম্বন্ধে ইংরেজ দার্শনিক বেকন তাঁহার প্রবন্ধের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—What is Truth? said jesting Pilate and would not stay for an answer। অর্থাৎ—সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর নাই, অতএব প্রশ্নই বৃথা—সংশয়বাদী Pilate এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু দর্শনে বা বিজ্ঞানে যেমন হউক, ধর্ম্মে ও নীতিশাস্ত্রে সত্যবাদ ও সত্যাচরণের একটা আদর্শ বহুদিন হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ধর্ম্মগুরু বা সংহিতাকার সামাজিক জীবনযাত্রার আদর্শ যুগে যুগে যতই পরিবর্ত্তন করুন, সত্যের এই নৈতিক মূল্য বা মর্য্যাদা মানুষের সংস্কারে চিরদিন অটুট হইয়া আছে। এই সত্যনিষ্ঠার গৌরবে রামায়ণের নর-চরিত্র দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

এই সত্যনিষ্ঠা আদিম বর্ব্বর জাতির মধ্যে আরও অকৃত্রিম, আরও প্রবল। তাহার কারণ, সৃষ্টির মধ্যে যে আত্মরক্ষণ-নীতি আছে, যাহা জীবধর্ম্ম-নীতি, তাহাই এই সত্যনিষ্ঠার মূল। জটিলতর সমাজ-জীবনে

উন্নত মনোবৃত্তির প্রভাবে মানুষের এই স্বভাবধর্ম্ম যেমন সজ্ঞান ও সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই ব্যক্তি ও সমাজ এই উভয়ের স্বার্থ যতই পরস্পরবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে, ততই যাহা এককালে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জৈব প্রবৃত্তি ছিল, তাহাই ক্রমশ স্বার্থসম্বরণমূলক ত্যাগধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই আদিম সত্যনিষ্ঠার মধ্যে কোনও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ছিল না; যাহা জানি বলিব, যাহা বলিব তাহা করিব—ইহা যেমন সহজ তেমনই স্বাভাবিক ছিল; সে সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ চিন্তার বাধা ছিল না। কিন্তু যখনই সেই বাধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখনই এই সত্যভাষণ ও সত্যাচরণ আর সহজ বা স্বাভাবিক রহিল না; ইহার জন্য আত্মনিগ্রহ, এমন কি আত্মবিসর্জ্জন করারও প্রয়োজন হইল। সেজন্য এক দিকে যেমন ইহার মূল্য বাড়িয়া গেল, তেমনই আর এক দিকে ইহার অর্থ কমিয়া গেল। স্বভাব বা স্বাস্থ্যের জন্যই ছিল যাহার প্রয়োজন, তাহাই একটা নৈতিক আদর্শ-নিষ্ঠায় পরিণত হইল; অর্থাৎ, তাহার দ্বারা কোনও প্রত্যক্ষ কল্যাণ সাধিত না হইলেও—এমন কি অনিষ্ট ঘটিলেও, একটা ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহের মহিমাই ইহার একমাত্র অর্থ হইয়া দাঁড়াইল, একটা নৈতিক অহংজ্ঞানই মুখ্য কারণ হইয়া উঠিল।

অতঃপর এই সত্য-সাধনের মধ্যে মানুষের মনের একটা সূক্ষ্ম অহংকার জড়িত হইয়া গেল—মানুষ আপনার মধ্যে বিবেক নামক যে বস্তুটির আবিষ্কার করিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজেরই উচ্চতর অহংকার। এইরূপে হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা মানসবৃত্তির প্রাধান্য ঘটিল। কারণ, প্রেম এই ন্যায়-অন্যায়-বোধের বিরোধী—অন্যায় বা অসত্য যত বড়ই হোক, প্রেম তাহাকে ক্ষমা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে

এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার পক্ষে কোনরূপ অসত্যের সঙ্গে সন্ধি করা অসম্ভব। মানুষ এই দ্বন্দ্বের নিরসন-চেষ্টাও করিয়াছে, সত্যের সঙ্গে ধৃতি ও ক্ষমাকেও মহাপুরুষ-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু এ সাধনা অতি কঠিন সাধনা,—ইহার মূলে সত্যের যে উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন, তাহা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা বৈরাগ্যমূলক ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে এই নৈতিক সত্য বা চরিত্র-ধর্ম্মের মূল্যও যেমন অল্প, তেমনই, যে প্রেম বলে—"It is really the errors of man that make him lovable"—সেই প্রেমের মোহ নাই বলিলেই হয়।

"To know all is to pardon all"—এই বাক্যে যে প্রকার জ্ঞানের ইঙ্গিত আছে, সেই জ্ঞানের কাছে সমাজনীতি বা চরিত্রনীতি ছোট হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্যনিষ্ঠার মধ্যে একটা অহঙ্কার আছে, ব্যক্তির একটা স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান আছে; যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ, সে যেন সমাজের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করিতে চায়, কারণ, সকলেই তাহার মত সত্যনিষ্ঠ নয়, তাহা সে জানে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সে সত্যকে বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত করিয়া, সকলকে তাহার অন্তর্গতরূপে দেখে বলিয়া, সকলের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে এমন একটা মহানিয়ম আবিষ্কার করে, যাহার জন্য কাহাকেও দায়ী করিতে পারে না। এমন অবস্থায় 'মরালিটি'কে সে একটা সংস্কার বলিয়াই মনে করে; একেবারে নিষ্প্রয়োজন মনে না করিলেও, সে তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

যে অহং-সংস্কার মানুষের জীবধর্ম্ম, যাহার স্ফূর্ত্তি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন—আদিম সমাজের সত্যনিষ্ঠায় যাহা বীজরূপে বর্ত্তমান

ছিল, তাহাই সমাজ-জীবনের জটিলতার প্রভাবে একটা সজ্ঞান নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু আরও পূর্ব্ব হইতেই, ইহারই বশে মানুষের প্রাণে আর একটা বৃত্তি জাগিয়াছে, ইহার নাম ভক্তি বা Faith। জগৎ বা জীবন-ব্যাপারের একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য মানুষকে প্রতি পদে অভিভূত করিয়াছে—আপনার অহং-সংস্কারের উপযোগী করিয়া মানুষ যাহাকে ধরিয়া থাকিতে চায়, বাহিরে চতুর্দ্দিকে তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ তাহাকে দিশাহারা করিয়া তোলে। প্রকৃতি যেন প্রতি পদে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে—যাহা তোমার জীব-ধর্ম্মের প্রয়োজন, তাহার অধিক জানিতে চাহিও না। প্রকৃতি-পরবশ মানুষ তাহাই স্বীকার করিয়াছে, নিজের অহং-সংস্কার একটা বৃহত্তর অহংকে সমর্পণ করিয়া দুই দিক রক্ষা করিয়াছে। এই পরাজয়-মূলক জয়, এই যে আত্মরক্ষার জন্যই আত্মসমর্পণ, ইহারই নাম—Religion। এ প্রবৃত্তি অতিশয় আদিম ও অতিশয় প্রবল। যে নৈতিক সত্যনিষ্ঠার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে মানুষ আপনার উপরেই অনেকটা নির্ভর করে, এবং আপনার মত করিয়া একটা যুক্তি-বিচারও খাড়া করে, এবং শেষ পর্য্যন্ত বিবেকের দোহাই দেয়। ইহার মধ্যেও প্রকৃতির প্ররোচনা আছে—কেবল, সে তাহা স্বীকার করে না—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান মানুষ এই অহংকে বিসর্জ্জন দিয়াই একটি অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এই Faith বা ভক্তির মূলে যাহাই থাক, ইহার বশে হৃদয়বৃত্তি জ্ঞানবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখে। সত্যনিষ্ঠার মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ আছে, তাহাতে সত্য-জিজ্ঞাসা না থাকিলেও একটা ব্যবহারিক সত্যাসত্য-জ্ঞান আছে; ধর্ম্ম-বিশ্বাস অন্ধ, এখানে 'ত্বয়া হৃষীকেশ

হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—অথবা গুরুর আদেশই অভ্রান্ত। ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও বিবেক এক নয়—'হৃদিস্থিত হৃষীকেশ' বিবেকেরও উপরে। বিবেকের অন্তরালে যে অহং-জ্ঞান আছে, তাহাকেও আবৃত করিয়া এই হৃষীকেশ আপনার আসন পাতিয়াছেন, অর্থাৎ মানুষের ক্ষুদ্র চেতনা বিশ্বচেতনার অঙ্গীভূত হইতে চাহিতেছে। মানস-বৃত্তির অনুশীলনে মানুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করে, এই স্বাতন্ত্র্য-কল্পনায় বাহিরের সঙ্গে অন্তরের যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মানুষ আর একটা সত্তার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে—জানে না, এখানেও সেই প্রকৃতি-পারবশ্য; বাহিরে যাহাকে স্বীকার করে নাই, অন্তরে তাহারই শক্তি 'হৃষীকেশ'-রূপে তাহাকে জয় করিয়াছে, বুদ্ধি পরাভূত হইয়া একটা অজ্ঞান চেতনার অপূর্ব্ব আবেশে ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের এক দিক —অতিশয় ব্যক্তিগত—নিঃসঙ্গ সাধকের অবস্থা। কিন্তু যাহাকে আমরা বহুব্যাপী সামাজিক ধর্ম্ম-বিশ্বাস বলি, তাহার মধ্যে এই অন্তরচেতনা তেমন পরিস্ফুট নয়; সেখানে অহংকার আরও স্পষ্ট—মানুষ গুরুর নামে নিজের অহংকারকে গোপনে তৃপ্ত করে। কারণ, জগতের যাঁহারা ধর্ম্মগুরু, তাঁহারা যে Idea বা তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহার মধ্যে একটা অতিশয় কঠিন আত্ম-প্রত্যয় আছে। তাঁহাদের এই আত্ম-বিশ্বাসের অপরিমিত শক্তিই শিষ্যবর্গকে জয় করিয়াছে; সেখানে তত্ত্বটাই বড় নয়, বড় তাঁহাদের সেই Personality, সেই Character। কেবল মাত্র Idea-র মূল্য খুব বেশি নয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা দার্শনিকের প্রতিপত্তি অনেক বেশি হইত। কিন্তু—"If both an Idea and a Character come together, they give rise to events which

fill the world with amazement for thousands of years"। তাই, এই সকল গুরুদের বাণী মানুষের মনে কোনও জিজ্ঞাসামূলক সত্যের প্রতিষ্ঠা করে নাই, মানুষকে অন্ধ-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান করিয়াছে মাত্র। বাণী অপেক্ষা গুরু বড় হইয়াছে, গুরুর পূজা বাণীতে বর্ত্তিয়াছে। যে বুদ্ধ সত্যকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন, যিনি বার বার উপদেশ দিয়াছিলেন, 'বুদ্ধ' কোনও ব্যক্তি নয়, মানুষ মাত্রেরই সাধনার আদর্শ-স্বরূপ একটা Idea—সেই বুদ্ধই পরিশেষে শত সহস্র বিগ্রহ-রূপে পূজা পাইয়াছেন!

ইহাই মানুষের স্বভাব, ইহাই তাহার ধর্ম্ম। সত্য কি? এ জিজ্ঞাসা মানুষের প্রকৃতিগত নয়; মানুষের প্রকৃতি ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। সত্যের যে আদর্শ মানুষের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, তাহা কোনও তত্ত্বের ধার ধারে না। জীবধর্ম্মের দুইটা প্রয়োজন—আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার; এই দুইটির স্বাভাবিক নিয়মে যে নীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তত্ত্ববিচারের অধীন নয়। মানুষ যাহা বিশ্বাস করে তাহাই সত্য। এই বিশ্বাস ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। মানুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার সূত্রপাত করিয়াছে, তাহা তাহার মনোবৃত্তির বিলাস মাত্র; এই বিলাসকেই যদি সে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, তবে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে মানুষের একটা স্থূল ঐক্যবুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ভিতরে ও বাহিরে একটা কিছুকে এক করিয়া লইতে চায়—এই একনিষ্ঠার মধ্যে যে সত্য-চেতনা আছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার বশে আত্মসম্বরণ ও আত্মপ্রসার—এই দুই ধারায় মানুষের জীবন প্রবাহিত হইতেছে।

Pontius Pilate যে প্রশ্ন করিয়াছিল—What is Truth? এবং উত্তরের অপেক্ষাও করে নাই—সেই Truth-এর সন্ধান মানুষের একটা মানসিক ব্যাধি মাত্র। মানুষ যে সমস্যার সমাধান করিতে চায়, সে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার জীবধর্ম্মের ব্যতিক্রমে; সেই জন্যই জীবনের আলো মৃত্যুর ছায়ায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব মানুষের পক্ষে যদি কোনও সত্য-সমস্যা থাকে, তবে সে প্রকৃতির অনুযায়ী জীবনযাপনের সমস্যা। এই জীবনের আদি-অন্ত রহস্যময়। দূর হইতে এই রহস্য চিন্তা করিবার নয়—এই রহস্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া নিজেও রহস্যময় হইতে হইবে। সত্য এক নহে, বহু—এ জন্য সকলই সত্য, এবং সকলই মিথ্যা। যেখানে জীবনের স্ফূর্ত্তি, সেইখানেই সত্য। এই স্ফূর্ত্তির কি কোনও নিয়ম আছে? এই বৈচিত্র্যকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিবে কে? এই ক্ষণ-সত্যের আদর্শ নির্ণয় করিবে কে? গতি ও প্রবাহই যাহার নিয়ম, মৃত্যুময় জীবনপ্রাচুর্য্যই যাহার ধর্ম্ম—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, স্বপ্ন-জাগরণ, স্মৃতি বা বিস্মৃতি যাহার অঙ্গে এতটুকু চিহ্ন রাখে না, তাহার আবার সত্য কি? কোন্ মাপকাঠিতে তাহাকে মাপিবে? ইহার অর্থ করিতে গেলেই—প্রহেলিকা; তত্ত্ব সন্ধান করিলেই—শূন্যবাদ। তাই যাহারা জীবনধর্ম্ম পালন করে, কোনরূপ সত্য-জিজ্ঞাসার মতিভ্রমে যাহারা পড়ে নাই, তাহারাই সত্য পালন করিয়াছে, অজ্ঞানে জ্ঞানীর কাজ করিয়াছে।

সত্য কি,—প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর, বুঝিতে পারিবে। নিজের মধ্যে যে শক্তি যেটুকু আছে, সেই শক্তিটুকুই সত্য; তাহার প্রেরণায় যে জীবধর্ম্ম তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহাই সত্য। যে সংস্কার তোমার প্রাণে বদ্ধমূল, তাহাই তোমার স্বধর্ম্ম; আবার যে সংস্কার তোমার

প্রাণকে বিচলিত করে, বিদ্রোহী করিয়া তোলে, তাহাই তোমার বিধর্ম্ম। কল্পনা-বিলাস বা তত্ত্ব হিসাবে যাহা তোমার শ্রেয়ঃ, তাহাই সত্য নয়; কারণ, তোমার নিজ চেতনার বাহিরে, কেবলমাত্র চিন্তাহিসাবে, কোনও সত্য নাই; আবার, যাহা তোমার জীবচেষ্টাকে অলস করিয়া দদ্রু-কণ্ডুয়নের মত সুখসাধন করে, তাহাও সত্য নয়; কারণ, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। যাহা তুমি বিশ্বাস কর, তাহাই সত্য। সূক্ষ্ম তত্ত্ব, উৎকৃষ্ট যুক্তি বা উদার ভাব—সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট বা উদার বলিয়াই সত্য নয়; যদি প্রাণে সাড়া না পায়, যদি বিশ্বাস উৎপাদন না করে, তবে তাহাও তোমার পক্ষে মিথ্যা। এই বিশ্বাস অর্থে মনের সম্মতি নয়, ভাব-বিভোরতাও নয়—প্রাণের মধ্যে শক্তিসঞ্চার। এই বিশ্বাসের প্রমাণ—নিষ্ঠা, অভয় ও একাগ্রতা; নিদ্রালস সুখস্বপ্ন নয়, প্রলাপোক্তি নয়, শক্তিক্ষয়ের সুখলাম্পট্যও নয়। তুমি যাহা বিশ্বাস কর তাহাই সত্য, কারণ, তাহাই তোমার স্বধর্ম্ম। জীবনের স্বাস্থ্যই সত্যের একমাত্র প্রমাণ, সত্যের সত্যহিসাবে আর কোনও মূল্য বা অর্থ নাই।

তাই মানুষ যখন আপনার সেই প্রাণকে আবৃত করিয়া পরের অনুকরণে আপনাকে সজ্জিত করে, সত্যকে একটা বহির্গত আদর্শ মনে করিয়া এবং আপনা হইতে তাহাকে অতিশয় উচ্চ দেখিয়াই, তাহার রঙে নিজেকে রঙিন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে—বিদ্রোহী বীর বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায়, অথবা বহুজন-পূজিত কোনও ব্যক্তির সাদৃশ্যলাভের আশায়, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সেই মিথ্যার পীড়নে তাহার আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে। সারা জীবন একটা অভিনয়ের ভূমিকা রক্ষা করিতে গিয়া সে একটা প্রাণহীন যন্ত্র হইয়া উঠে; বাহিরের প্রতিষ্ঠাই তাহার একমাত্র সম্বল বলিয়া, সে অন্তরে শক্তিহীন

হইয়া পড়ে। স্বধর্ম্মের মূল—আত্মস্ফূর্ত্তি, তাহার ফল—বিশ্বাস, ও লক্ষণ—নির্ভীকতা; পরধর্ম্মের মূল—আত্মসঙ্কোচ বা কুণ্ঠা; তাহার ফল আত্মপ্রবঞ্চনা, ও লক্ষণ ভয়। সত্যকে যাহারা তত্ত্ব, শাস্ত্রবিধি বা স্বনুষ্ঠিত পরধর্ম্মের মধ্যে উপলব্ধি করিতে চায়, নিজের প্রাণকে প্রামাণ্য না করিয়া কেবল মনেরই মনরক্ষা করে, জগতে তাহার মত ভাগ্যহত আর কে আছে?

জগৎ ও জীবনকে মানুষ আপনার প্রাণের মধ্যে আপনার মত করিয়া গ্রহণ করে, তাই জগৎ সম্বন্ধে সকলের মনে একটা সাধারণ ধারণা থাকিলেও, প্রত্যেকের জগৎ স্বতন্ত্র। মন এই প্রাণের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া জগৎকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ একটা সত্ত্বারূপে ভাবনা করে, তাই দর্শনের সত্য অদর্শন হইয়া উঠে। বিজ্ঞান জড়ের রহস্য ভেদ করিতে চায়, সেও মনের ক্ষুধা, প্রাণের নয়। দুঃশাসন মন প্রকৃতি-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে চায়,—সে বসন যতই পর্দ্দায় পর্দ্দায় বিচিত্র ও রাশীকৃত হইয়া উঠে, ততই তাহার লালসা বাড়ে; শেষে সে আপনাকেও ভুলিয়া যায়, যাদুকরীর যাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া ভূতগ্রস্তের মত বিচরণ করে। সত্যকে সেও পায় না, হয়তো শেষে আর চায়ও না—অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ কতকগুলি তত্ত্ব, জড়শক্তির কতকগুলি ব্যবহারিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়া, তাহা হইতেই এমন একটা সিদ্ধান্ত করে, যাহাতে সংশয়ই সত্য হইয়া উঠে; মন প্রথম হইতে যে সত্যের সন্ধান করিয়াছিল, সে সত্যের আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রকৃতির অবগুণ্ঠন খুলিতে গিয়া সে এমন একটা যন্ত্রের আভাস পায় যে, গণিতশাস্ত্রই তাহার বেদ হইয়া উঠে। বিজ্ঞান যে-রহস্যের সমাধান করিতে পারে নাই, তাহার রসটুকু বাহির করিয়া দিয়াছে; যন্ত্রের জড়ধর্ম্মই মানুষের জীবন-ধর্ম্মের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মানুষের প্রাণ এখনও মরে নাই, এবং সম্ভবত কখনও একেবারে মরিবে না, তাই সত্যকে সে আর এক দিক দিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই অসীম বৈচিত্র্য ও বিরোধকে সে প্রাণের দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া এক আশ্চর্য্য উপায়ে তাহার মধ্যে একটি ঐক্যরস উপভোগ করে, প্রেমের দ্বারা সে সকল জিজ্ঞাসা ও সকল সংশয় দূর করে; আদি-অন্তের ভাবনা না করিয়া একটি আশ্চর্য্য প্রাণশক্তির বলে সে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতিকে যেন একটি গানের সুরে বাঁধিয়া লয়। দর্শন যে প্রশ্ন সমাধান করিতে গিয়া শেষে তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে, বিজ্ঞান যে দুঃখ দূর করিবার আড়ম্বর মাত্র করে—ফলে আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া তোলে, সেই দুঃখকে স্বীকার করিয়াই, এই প্রেম তাহাকে নিরস্ত করে। ইহার কারণ কি? প্রেম কোনও সত্যের অধিকারী হইতে চায় না, জগৎ ও জীবনের কোনও অর্থ করিতে চায় না—আপনাকে তাহার নিকটে সমর্পণ করে, বিলাইয়া দেয়। যাহার প্রাণশক্তি যত বেশি, অর্থাৎ যে যত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে এই জগৎ-সমুদ্রে স্নান করিয়া সাঁতার দিয়া ইহার তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়াই তত আনন্দ পায়। যে মানুষের প্রাণে এই আনন্দ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে, তাহার প্রাণে সৃষ্টির বেদনা সঙ্গীতরূপে উৎসারিত হয়, ব্যক্তির সুখ-দুঃখ নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠে। এই ব্যক্তির নাম—কবি। ইনি এই আনন্দের সত্যকে রূপ দেন; কিছু বলেন না, কিছু বুঝান না, প্রাণে প্রাণে জানাজানি কানাকানি হয়; যে সত্য জগৎসৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে, মানুষের প্রাণের মধ্যেই সেই রহস্য রসময় হইয়া উঠে। এই রসানুভূতিই সত্যানুভূতি। সত্যের আর কোনও পরিচয় নাই, আর কোনও রূপে তাহাকে জানিবার উপায় নাই।

পৌষ, ১৩৪৫

অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম-জীবনী বা বঙ্কিম-সাহিত্য—কোনটারই সম্যক আলোচনা এ যাবৎ বাংলাসাহিত্যে হয় নাই। না হওয়ার কারণ অনেক। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, সে যুগের এই তিন মহত্তর বাঙালী পুরুষ মনঃপ্রাণের যে শক্তি ও যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এই অলস, ভাবাতিরেক-দুর্ব্বল চরিত্রহীন জাতিকে ক্ষণেকের জন্য বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়াছিল মাত্র—সে জীবন, সে চরিত্রকে বুঝিবার শক্তিও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালী মৌলিকতাকে ভয় করে—তৎপরিবর্ত্তে বিদেশী বিদ্যার ধার-করা বড়-বড় বুলি সংক্ষেপে ও সহজে মুখস্থ করিয়া তাহারই আবৃত্তি দ্বারা স্বদেশী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে। গত এক শত বৎসরের অধিক কাল যে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষারূপে পরিণত হইয়াছে—সে শিক্ষা এই প্রবৃত্তির পুষ্টি-সাধনপক্ষে বড়ই উপযোগী হইয়াছে। এক ধরনের মেধা—যাহাকে পরবিদ্যা মগজস্থ করিবার শক্তি বলা যাইতে পারে—স্বকীয় চিন্তার বিঘ্নমাত্র ব্যতিরেকে পরকীয় চিন্তার অনুসরণ, ও তদ্দ্বারা মস্তিষ্ক-ভরণ করিবার সেই যে শক্তি—তাহাই সাধারণ বাঙালী-জিনিয়াস। ইহাতে, যে সকল বিষয় বিদেশের পণ্ডিতেরা সমাধান করিয়া দিয়াছেন, সেই বিষয়ে পঞ্চমুখ হওয়া তাহার পক্ষে সুখসাধ্য, এবং তাহাই পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিবার সহজ পন্থা। কিন্তু নিজের সমাজে, সাহিত্যে ও জীবনে, যদি ভাবিবার মত কিছু থাকে—কোনও নূতন আবির্ভাব, মৌলিক প্রতিভা বা অভিনব প্রকাশ ঘটে, তবে তাহার বড়ই মুশকিল হয়। যদি সে সম্বন্ধে কোনও

প্রশ্ন উঠে, তবে দুই উপায়ে তাহার সমাধান হইয়া থাকে—তাহাকে বাংলা বা বাঙালী বলিয়া আলোচনার অযোগ্য হিসাবে বিদায় করা; অথবা, বিদেশী বিদ্যার স্বদেশী প্রয়োগে তাহার এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যে, তাহার স্বরূপ-বিরূপ একাকার হইয়া যায়।

এ তো গেল পণ্ডিতদের কথা। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর ভাব ও ভাবুকতা যাত্রা-থিয়েটারেই চরিতার্থ হয়। সমাজের মধ্যে যাহারা বড়, তাহারা যে দিকে যে কারণে বড় হউক, তাহাদিগকে আমরা ভয় অথবা ভক্তি করি—বিচার বা চিন্তার ধার ধারি না। জ্ঞানের সবচেয়ে বড় যা—সেই আত্মজ্ঞান এ জাতির নাই বলিলেই হয়; হাসিয়া কাঁদিয়া, কখনও মুক্তকচ্ছ, কখনও কৃতাঞ্জলি হইয়া, জীবনটাকে কোনওরূপে সহাইয়া লওয়াই এ জাতের ধর্ম্ম। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, বঙ্কিম বেড়ে লেখে, এবং বিবেকানন্দ সাহেবদের দেশে হাততালি পাইয়াছে—ইহার বেশি জানিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন তাহার নাই, কারণ বৈঠকখানায় বা চণ্ডীমণ্ডপে ঐটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিত ও অপণ্ডিতে তফাৎ এই যে, একজন ধূর্ত্ত, অপরটি বোকা; একজন শহুরে, অপর জন গেঁয়ো।

এই সমাজে যখন বঙ্কিমের মত অতিশয় অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়, তখন মনে না হইয়া পারে না যে, সে কথায় কান পাতিবার আগ্রহ কাহারও নাই—আগ্রহ থাকিলেও সে কথার ভাবগ্রহণ করিতে হইলে যে সংস্কার থাকা প্রয়োজন তাহা নাই। কিন্তু কিছু না শুনিয়া এবং না বুঝিয়া, এই সমাজে দাদাঠাকুরের মত পাণ্ডিত্য জাহির করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই হইবে। কারণ, যাহারা থলিতে পরের বুলি বাজাইয়া বাজার সরগরম করে—তাহাদের রসনা নিরঙ্কুশ।

দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে শুধুই পাণ্ডিত্য ও রসবোধ নয়—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার প্রয়োজনও আছে। সস্তা পাণ্ডিত্যের ও যা-খুশি বলিবার সৎসাহস যাহাদের আত্মপ্রসাদের কারণ, নিজেরা মনে ও প্রাণে অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া মহত্ত্বের প্রতি যাহাদের সহজাত আক্রোশ—বড়র প্রতি দাঁত খিঁচাইয়া নিজেদের ইতরতা প্রকাশ করিয়া দিতে যাহাদের কিছুমাত্র বাধে না—তাহাদের সমাজে বঙ্কিম-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই অতিশয় সঙ্কোচ বোধ হয়। উত্থাপন করিয়া কোনও লাভ নাই। সমুদ্র দেখিয়াও যাহারা তাহাকে একটা খুব বড় পুকুর বলিয়া ধারণা করে, গৌরীশৃঙ্গ দেখিয়া একটা অত্যন্ত বিসদৃশ বিপর্য্যয় এবং দুরারোহ পাথুরে-কাণ্ড বলিয়া যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করে—তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কে? কিন্তু উঁচু ঢিবি ও তালপুকুরের কথা সকলেই বোঝে। এ আসরে বঙ্কিমের পরিচয় করিতে পাওয়া বাতুলতা নয় কি?

তথাপি কথাটা তুলিয়াছি। সত্যকার রসিকের সংখ্যা কোনও কালে কোনও সমাজে অধিক নয়। একালে আরও কম। কারণ এ যুগের আবহাওয়াই রসিকতাবিরোধী। যেটুকু রসিকতা আমাদের এই সমাজে ছিল বা এখনও আছে, তাহাও এই যুগ-বিরুদ্ধতার ফলে যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে—মুখ ফুটিতে পায় না। এককালে অল্পই বহুকে শাসন করিয়াছে—যখন বিদ্যার কৌলিন্য ছিল, তখন তাহার কাছে মূর্খতা আত্ম-সম্বরণ করিত। এখন দুই টাকায় যেমন বড়মানুষী করা যায়, তেমনই দুই পাতা বর্ণজ্ঞান লইয়া রসনার আস্ফালনে বাধা নাই! এ অবস্থা বিশেষ করিয়া দাস-জাতির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী; কারণ, আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ যাহার নাই, তাহার মহৎকে অপমান করিতে বাধে না। এ সমাজে ইহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথবা ইহাদের লইয়াই সমাজ। এখানে বিদ্যা,

ভদ্রতা বা রসিকতা যদি কোথায়ও থাকে, তবে তাহা নির্ব্বাসন-দুঃখ ভোগ করিতেছে। বোল না ফুটিতেই যাহারা বাপান্ত করে, তাহাদের সম্মুখে কথা কহিবে কে? তাই সাহিত্য-রসিকও নীরব। রসিকের পক্ষ সমর্থন করিবার প্রয়োজন নাই জানি, আমিও পক্ষ সমর্থন করিতে বসি নাই—কারণ, রসবোধ বাদ-প্রতিবাদের বস্তু নয়, বেরসিকের বিরুদ্ধে রসিকের একমাত্র উপায় স্থান-ত্যাগ। কিন্তু বঙ্কিম-সম্বন্ধে কোনও রূপ আলোচনা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—সে আলোচনা এ যুগের রসিকসমাজে নূতন করিয়া আরম্ভ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছি। তাই মূর্খ ও বেরসিকের আক্রমণকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আমি রসিকজনের সঙ্গেই কিঞ্চিৎ আলাপ করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যের কে, তাহা যাহাদিগকে তর্ক করিয়া বুঝাইতে হয়, তাহাদের জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে এক দল সাহিত্যিক (অধিকাংশই রবীন্দ্রশিষ্য!) রব তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের যত বড় লেখকই হউন, তিনি যে উপন্যাসগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহা উৎকৃষ্ট আর্টের দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। এ ধুয়া আরও উচ্চে উঠিল—আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-বিরোধী মনোভাবে। তাহারও পরে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তে, শৌখিন সাহিত্যিক-মজলিসে যে উঁচুদরের সাহিত্য-সমালোচনা হইয়া থাকে, এবং যাহা মৌলিক সমালোচনা-প্রবন্ধ-রূপে—বাংলা মাসিকে, অর্থাৎ, হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রসিক পাঠকগণের দরবারে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে অপদস্থ না

করিলে আধুনিক হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের মনোভাব অতিশয় সহজবোধ্য, রবীন্দ্রনাথের ততটা নয়। শরৎচন্দ্র যে বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা সমালোচনা নয়—সমালোচনা বলিয়া মনে করিলে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা হয়। কারণ, কোনরূপ সবল মনোবৃত্তি বা বিচারশক্তি যদি তাঁহার সৃজনী শক্তির সহিত যুক্ত থাকিত, তবে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তেমনটি হইত না—শরৎচন্দ্র এত 'পপুলার' হইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আক্রোশ যদি না থাকিত, তবে বিস্মিত হইবার কারণ ঘটিত। বঙ্কিম-প্রতিভা ও শরৎ-প্রতিভা—পুরুষ ও নারী-চরিত্রের মত বিপরীত; অতএব ভাবের ক্ষেত্রে, বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি শরৎ-চিত্তের একটা আদিম বিতৃষ্ণা বা natural antipathy থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা, বিশেষত এই শেষ বয়সে, একটু বিচিত্র বটে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্ম অতিশয় স্ব-তন্ত্র হইলেও, তাঁহার প্রতিভা খুবই আত্মসচেতন; এবং সেই জন্য অন্ধ আত্ম-সংস্কারকে—অতিশয় অবোধ instinct-কেই অবলম্বন করিয়া তিনি, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা অন্য কোনও ভিন্ন-ধর্ম্মা শক্তিমান সাহিত্যিকের কবিকীর্ত্তির মূল্য নিরূপণ করিবেন—তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার যে ভঙ্গির পরিচয় আমরা বহু পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, কবি-ব্যক্তিত্বের বহুত্বই তাঁহার যেমন কাম্য, তেমনই সমালোচনা বা যুক্তি-চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি বহু-বচনের পক্ষপাতী। তা ছাড়া, সকল কালের সমবয়সী হওয়ার—বা সর্ব্বদা 'আপ-টু-ডেট' থাকিবার যে সাধনা, তাহাতে তিনি অতিমাত্রায় বিশ্বাসী; তিনি বৃদ্ধ হইবেন না—এবং স্থাবরতাই স্থবিরতার লক্ষণ—সেজন্য

স্থাবরতাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, এমন একটা সঙ্কল্প তাঁহার ইদানীন্তন সাহিত্যিক প্রয়াসগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কালধর্ম্মে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাতিল হইতে বসিয়াছেন, তখন অতিশয় সজাগ থাকিয়া সেই কালের অনুবর্ত্তন করিতে না পারিলে তিনিও বাতিল হইয়া যাইবেন—এ ভয় তাঁহার প্রবল; তাহার প্রমাণ অতি-আধুনিকদিগের সঙ্গে বারবার রফা করিবার চেষ্টায় নিত্যই পাওয়া যাইতেছে।

বঙ্কিমের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—তাঁহার কল্পনার 'অ্যারিস্টোক্রেসি'; তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষকে লইয়া উপন্যাস রচনা করেন নাই, অর্থাৎ রামা-শ্যামা বা রামী-বামী তাঁহার সহানুভূতি লাভ করে নাই—তিনি জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেন নাই। আর এক গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি ধর্ম্ম ও নীতিকে তাঁহার রচিত চরিত্র ও ঘটনা-সৃষ্টিতে এতই প্রাধান্য দিয়াছেন যে, তাহাতে রসিকের রসবোধকে পীড়িত, অপমানিত করা হইয়াছে। এত বড় জবরদস্ত নীতি-শিক্ষক ও গোঁড়া বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণ যে, সে কবি হয় কেমন করিয়া? তাঁহার উপন্যাসগুলির প্লট এক-একটা ছেলে-ভুলানো ফাঁকি—তাঁহার চরিত্রগুলা এমন ভাবে চলে যে, তাহাতে সাইকলজির সত্য নাই, জীবনের স্ফূর্ত্তি তাহাতে নাই। এই সকল উক্তির সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা আর কিছুই নয়—তাহাও এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি; অর্থাৎ, যেহেতু তাহাতে নীতি ও ধর্ম্মের প্ররোচনা আছে এবং যেহেতু তাহার মধ্যে বাস্তবানুকৃতি নাই, অতএব সেগুলা আর্ট-সম্মত রসরচনা নহে।

এই সকল কথার অন্তরালে যে মনোবৃত্তি বা সাহিত্য-জ্ঞান আছে, আমাদের দেশে অতিশয় শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তিও তাহার উপরে উঠিতে

পারেন না। রসবোধ বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-জ্ঞান সকলের কাছে আশা করাই অসঙ্গত; কিন্তু প্রাকৃত রুচি ও অশিক্ষিত মনোবৃত্তি যদি শিক্ষিত সমাজেও প্রশ্রয় পায়, তবে সর্ব্ববিধ সাহিত্যিক আলোচনাই নিষ্ফল। আধুনিকত্বের ধ্বজাধারী নব্য রসিকসম্প্রদায় যে রুচি ও রসবোধকে সদম্ভে প্রচার করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া লাভ নাই; কারণ যাহা নিতান্তই সাময়িক, এবং সেই হেতু বহুব্যাপ্ত, তাহাকে লইয়া বিচার চলে না। কিন্তু আধুনিককে ছাড়িয়া, প্রাচীনতর ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে সাহিত্যকীর্ত্তি, কালের নিকষে যাহার মূল্য একরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে; তিন চার পুরুষ ধরিয়া যাহার রস-সংবেদনা বহু-রসিক-চিত্তে গভীরভাবে সাড়া জাগাইয়াছে—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ প্রতিভারূপে যাঁহার আসন আজিও সকল সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যজ্ঞানী বাঙালীর হৃদয়ে অটল হইয়া আছে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যসম্বন্ধে, এ কালের বড় হইতে ছোট সকলের মুখে এই যে সকল কথা নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হইতেছে, ইহার কারণ অনেক হইতে পারে; কিন্তু যে একটা কারণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত বাঙালীর সম্বন্ধে লজ্জিত হইতে হয়। ব্যক্তিগত রুচি বা রসবোধ লইয়া বিবাদ করা চলে না—বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে যে রস আছে, তাহা আধুনিক মনোধর্ম্ম বা জৈব-প্রবৃত্তির অনুকূল না হইতে পারে—যেখানে ধর্ম্মগত বিরোধ আছে, সেখানে রসবিচার অবান্তর। কিন্তু এইরূপ মনোধর্ম্ম ও ব্যক্তিগত সংস্কার, বা বিশেষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা সাহিত্যের সার্ব্বভৌমিক আদর্শকে অস্বীকার করে, এবং সাহিত্য-সমালোচনা বা রসবিচারের মূল নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও যুক্তি-তর্কের আস্ফালন করে, তাহারাই যদি বাঙালী শিক্ষিত-সমাজের

মুখপাত্ররূপে গণ্য হয়, তবে এ জাতির শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় সত্যই লজ্জাজনক। দায়িত্বজ্ঞান কুত্রাপি নাই! য়ুরোপীয় সাহিত্যে আজ সমালোচনার যে নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—সমগ্র রস-শাস্ত্রকে যেভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে, যে পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও রসবোধ, যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টি, যে আস্তিক্যবুদ্ধি এবং বিচারনৈপুণ্য তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে—তাহাতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশে তাহার খবর অন্তত এই তথাকথিত সাহিত্যরথীরা রাখেন না। তাঁহারা সে সাহিত্যের ভাঁড়ামি ও চটকদার বুলি, দুষ্ট রসিকতা ও সুনিপুণ ফাজ্‌লামিকে গলাধঃকরণ ও বমন করিয়া, সস্তায় সাহিত্যিক এবং সমালোচক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। সেখানকার অতি-আধুনিকেরা শেক্সপীয়ারকে কবি বলেন না, এখানকার অতি-আধুনিকেরা তদ্দৃষ্টান্তে বঙ্কিমকেই তাঁহাদের আধুনিকত্বের পাদুকা বহন করাইতে চান।

রস সকল যুগেই এক—খাঁটি রসিকতারও একটা গূঢ় লক্ষণ আছে যাহা যুগাতীত। রসসৃষ্টি, জীবনকে বাদ দিয়া নয়,—বরং জীবনেরই গভীরতর পরিচয় হইতে হইয়া থাকে বলিয়া, এবং সেই জীবন ব্যক্তি ও জাতি, যুগ ও যুগান্তরে বিচিত্র বলিয়া, রসের রূপসৃষ্টি, সকল যুগের সকল কবির কল্পনায় একই রূপ হয় না। সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা লেখেন, বা সাহিত্যের সমালোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা ইহার কারণ জানেন; যাঁহারা রসিকমাত্র—সাহিত্যজ্ঞানী নহেন—তাঁহারা কারণ না জানিয়াও রসসৃষ্টির সেই বৈচিত্র্য সাগ্রহে উপভোগ করেন এবং তাহাতে তাঁহাদের রুচি যেমন আরও মার্জ্জিত ও উদার হয়, তেমনই

রসবস্তু সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যভিজ্ঞা আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। প্রাচীন কাল হইতে কাব্যের কত রূপ-বিবর্ত্তন হইয়াছে—গান, গীতিনাট্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি—রসসৃষ্টির কত রূপ উদ্ভূত হইয়াছে ; ঐতিহাসিক তাহার যুগ-কারণ অথবা সেই সকল পরিবর্ত্তনের মূলে বৃহত্তর নিয়ম—জাতি ও সমাজের উপর নানা শক্তির ক্রিয়া, জাতীয় প্রকৃতি ও নানা ঘটনার সংঘাত প্রভৃতি—কত-কিছুর হিসাব লইবেন, কিন্তু খাঁটি রসের দিক দিয়া এ সকলের প্রয়োজন হয় না। যুগ, জাতি বা দেশ হিসাবে যত ব্যবধান বা পার্থক্য থাকুক, বাল্মীকি-ব্যাস, হোমার-এস্কাইলাস আরব্যউপন্যাস-কথাসরিৎসাগর, কালিদাস-শেক্সপীয়ার, দান্তে-ফারদৌসী, চণ্ডীদাস-শেলী, স্কট-হিউগো, ডিকেন্স-বঙ্কিমচন্দ্র, হার্ডি-ডস্ট্য়েভ্স্কি—সকলেই রসস্রষ্টা ; ভাবনা, কল্পনা বা উপাদান-উপকরণ যাঁহার যেমনই হউক, আকার যে ছাঁচেরই হউক, ইঁহারা যে কবি, ইঁহাদের কাব্য যে উৎকৃষ্ট রসের বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি—রসিকমাত্রেই তাহা জানেন, আর কিছু জানিবার প্রয়োজন তাঁহার নাই। যদি কেহ তাহা অস্বীকার করে, তবে তাহার সহিত তর্ক চলে না—কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি ইঁহারা সেই সকল কবি, যাঁহাদের সম্বন্ধে তর্ক বা প্রমাণের কাল আর নাই, জগতের সাহিত্যে ইঁহাদের আসন কায়েম হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবি কি না, এমন প্রশ্ন এই শতকের প্রারম্ভে একটা গুরুতর প্রশ্নই ছিল ; আজ সে প্রশ্ন যেমন হাস্যকর, শতাব্দী পরেও তাহা তেমনই হাস্যকর হইবে ; কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সম্মান আমরা যতই অল্প করিয়া থাকি, অথবা মতান্তরে, যতই অতিরিক্ত করিয়া থাকি—রবীন্দ্রনাথ যে এক জন খাঁটি কবি ও বড় কবি, এ বিষয়ে যুগান্তরেও কোনও সংশয় ঘটিবে না, এ কথা যে-কোনও রসিক ব্যক্তি জোর করিয়াই বলিতে পারিবেন। আরও

একটা কথা এইখানে বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যখন সেকালের সাধারণ সাহিত্যরসিক অতিশয় সন্দিগ্ধ ছিলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যথার্থ রসিকসমাজের অগোচর ছিল না। সাধারণের রুচি বা রসবোধ মৌলিক প্রতিভার পক্ষে এমনই ব্যর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যথার্থ রসিক বা আসল 'ক্রিটিক' যিনি—তিনিও কবির মতই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী, তাঁহারা এক হিসাবে 'প্রফেট'। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত কবি ফাঁকি দিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন না—এবং যে প্রতিষ্ঠা তাঁহারা লাভ করেন, তাহাকে পরবর্ত্তী কোনও যুগেই লোপ করিতে কেহ পারে না। শেক্সপীয়ার বা মিল্‌টনকে তোমাদের ভাল লাগিতে না পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; শেক্সপীয়ারের কবিগৌরব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল, সমসাময়িকগণ তাঁহাকে বিশেষ আমল দেন নাই—যুগমনোবৃত্তির সহিত রসিকতার সম্বন্ধ এমনই! সকল যুগেই বেরসিকের সংখ্যা বেশি; এ যুগে আরও বেশি এই জন্য যে, সেই সকল বেরসিকেরাই সস্তা ছাপাখানার দৌলতে বাচাল হইবার সুযোগ পাইয়াছে—এজন্য ঝিঁঝিপোকার সংখ্যা আজকাল এত বেশি বলিয়া মনে হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রমাণ যুগ-মনোবৃত্তির যুক্তি-তর্কের অতীত; বঙ্কিমচন্দ্রকে গালি দিয়া কিছু করিতে পারা দূরের কথা—বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা এ পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাও অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। সে প্রতিভা যে কত বড়, তাঁহার উপন্যাস-কাব্যে যে অসামান্য সৃষ্টিশক্তির পরিচয় আছে, তাহার বিচার-বিশ্লেষণ এখনও আরম্ভই হয় নাই। যদি উপযুক্ত সমালোচনা আরম্ভ হয়, তবে দেখা যাইবে যে, সে প্রতিভার সে সৃষ্টির এত দিক আছে এবং

তাহা এতই গভীর যে, যুগ হইতে যুগে সে সম্বন্ধে নূতন কথার শেষ হইবে না।

কিন্তু ইহা তো যুক্তির কথা হইল না। আধুনিক রসিকেরা যুক্তি চায়—যুক্তি না পাইলে একটি আধলা-পয়সাও দিবে না! তাহারা সেয়ানা হইয়াছে—যত সেয়ানা লইয়া দল পাকাইয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে ক্যানেস্তারা বাজাইয়া 'সাধু সাবধান!' বলিয়া সাধুকে শাসাইতেছে!

এ চীৎকারের মধ্যে কথা কহিবে কে? শুনিবে কে? সাহিত্য-সমালোচনায় যাহারা যুক্তি-তর্কের আস্ফালন করে ও প্রতিপক্ষ খাড়া করিয়া অব্যর্থ শরসন্ধানের দাবি করে, তাহাদের অন্তত একটুও সাহিত্য-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাহিত্যিক বিচারে যুক্তির দ্বারা রসের প্রমাণ হয় না, তথাপি তর্ক যদি করিতেই হয়, তবে সাহিত্যের সমালোচনারও একটা ব্যাকরণ, অভিধান আছে—ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য উকিলদের যেরূপ বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ চোথা-বুলির কসরত দেখাইতে পারিলেই এখানেও কেল্লা ফতে করা যায় না। লেখাপড়ার ধার ধারি না; সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, রস-রহস্য, রূপ-বৈচিত্র্য বা তাহার বিকার-বিবর্ত্তনের ঐতিহাসিক ধারা—এ সকলের কিছুরই জ্ঞান নাই; কেবল কতকগুলি প্রাকৃত-জন-বোধিনী 'অকাট্য' যুক্তির বলে সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ ও নীতিকে ধূলায় টানিয়া চীৎকার করিব—এ কেমন কথা? রসের কথা তোমাদের সঙ্গে নয়, কিন্তু যুক্তিতর্কই বা কি করিব?—বুঝিবার শক্তি, প্রবৃত্তি বা অবকাশ আছে?—কারণ, 'পড়িলে ভেড়ার গৃহে ভাঙে হীরার ধার।'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—উপন্যাস নয়? 'উপন্যাস' কি? বাস্তব-জীবনের নিখুঁত প্রতিকৃতি?—এ কথা কোন্ শাস্ত্রে বলে? উপন্যাস যদি তাহাই হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলিকে 'উপন্যাস' বলিও না—কেহ মাথার দিব্য দেয় নাই। মানুষেরই জীবন ও চরিত্র লইয়া এ যাবৎ পৃথিবীর সাহিত্যে মহাকাব্য, ট্রাজেডি, আখ্যান-আখ্যায়িকা, গল্প-উপন্যাস, নভেল প্রভৃতি নানাজাতীয় কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে—সকলেরই সার্থকতা রসসৃষ্টিতে। আরব্য উপন্যাসও উপন্যাস—আজও তাহা বিশ্বসাহিত্যের ক্ল্যাসিক; ট্রাজেডিও উপন্যাস, কারণ তাহাও মানুষের কাহিনী লইয়া রচিত; গল্প-রোমান্স ও আধুনিক নভেলও তাহাই;—সর্ব্বত্রই মানুষের চরিত্র, জগৎ ও জীবন কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে—কেবল রসসৃষ্টির রূপভেদমাত্র। উৎকৃষ্ট রস-প্রেরণা বা কবির রসদৃষ্টি যাহা সৃষ্টি করে, তাহার কোনও সংজ্ঞা নাই—সংজ্ঞা বা কোনও একটি বাঁধা-ধরা আকার-প্রকারের নিয়ম-অনুসারে কবি-কল্পনা বাধ্য নয়। হোমার এক কালে যাহাকে এক রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, শেক্সপীয়ার তাহাকেই আর এক রূপে, এবং আধুনিক কবি সেই বস্তুকে অন্যতররূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যুগ, জাতি বা ব্যক্তি-মানসের বৈচিত্র্যবশে সেই একই রস বিভিন্ন প্রেরণায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে—এই রূপ-বৈচিত্র্যে রসিক-চিত্ত আরও আশ্বস্ত ও চরিতার্থ হয়। প্রতিভা যেমন মৌলিক, তাহার প্রকাশভঙ্গিও সেইরূপ মৌলিক; এজন্য, কোনও উৎকৃষ্ট কাব্য—গদ্য বা পদ্য—কোনও সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বা চিহ্নিত হইতে পারে না। তুমি তোমার বুদ্ধিবৃত্তির মূঢ়তাবশত সকল বস্তুকেই একটা সাধারণ নামের মধ্যে না ধরিতে পারিলে তৃপ্তি পাও না, তাই কতকগুলাকে এক-জাতীয় মনে করিয়া একটা নাম, আর কতকগুলিকে

আর এক-জাতীয় বলিয়া আর একটা নাম—ওইরূপ 'ক্লাসিফিকেশন' করিয়া থাক। শুধু তুমি কেন, কবিগণেরও ঐরূপ একটা সংস্কার তাঁহাদের বহিঃ-চেতনায় থাকে—কিন্তু সৃষ্টিপ্রেরণার আবেশকালে সে সংস্কার লুপ্ত হয়। তাহার একটা উদাহরণ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য'। কবি পরম পাণ্ডিত্যসহকারে সর্ব্ববিধ আয়োজন করিয়া, উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মহাকাব্য ফাঁদিলেন; কিন্তু দেখা গেল, তাহা সেই সংজ্ঞা-অনুযায়ী বস্তু হয় নাই, তাহা মহাকাব্য নয়, গীতিকাব্যও নয়—তাহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্র। তাহাই হয়,—এবং না হইলে বুঝিতে হইবে, সেই কবি-প্রেরণাই সত্য নহে। এই জন্য আধুনিক সমালোচকেরা কাব্য-সমালোচনায় এইরূপ মধ্যযুগীয় পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়াছেন। যাহা নিয়তিকৃতনিয়মরহিত তাহার সম্বন্ধে কোনও বহির্গত আদর্শ বা সংজ্ঞা খাড়া করিলে, কাব্য-বিশেষের যে অনন্য-সাধারণত্ব তাহার প্রধান রস-প্রমাণ, তাহাকেই অগ্রাহ্য করিতে হয়। অতএব পূর্ব্ব হইতে একটা নাম খাড়া করিয়া, এবং সেই নামীয় বস্তুর লক্ষণ কি হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, কোনও খাঁটি রস-রচনাকে বিচার করিতে বসা—সমালোচনা-রীতির এই উন্নতির যুগে শুধুই বেরসিকতা নয়, মূর্খতাও বটে।

তোমার কথা কি? উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাভূমি হইবে বাস্তব জীবন? কথাটার মধ্যে দুইটা মিথ্যা বা মূর্খতাসুলভ সংস্কারের প্রমাণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রসসৃষ্টির কোনও বাঁধা-ধরা সংজ্ঞা-নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই—উপন্যাস বলিয়া যদি কোনও রচনাকে নির্দ্দেশ করিতে হয়—সে তোমারই নিজের সুবিধার জন্য, তাহার জন্য কবি দায়ী নহেন। তারপর, যদি 'উপন্যাস' শব্দটি ব্যবহারই করিতে হয়, তবে সর্ব্বকালের সকল রকমের

উপন্যাস-কাব্য মনে করিয়া—ভাব ও রূপ, বিষয়-উপাদান ও আকার-ভঙ্গির যত বৈচিত্র্য আছে এবং আরও হওয়া সম্ভব, এবং সেই সঙ্গে কবির স্বতন্ত্র মৌলিক রস-দৃষ্টির বিশিষ্ট প্রয়োজন চিন্তা করিয়া—উপন্যাসবিশেষের লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে। ইংরেজীতে এই ধরনের গদ্য কথা-কাব্যের নানা অভিধা থাকিলেও একটি সাধারণ নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে—'ফিক্‌শন'। তাহার কারণ স্পষ্ট; সকলে এক জাতীয় না হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা রূপ-সামান্য আছে। এইরূপ সংজ্ঞা-নির্ম্মাণও বিচার-সৌকর্য্যের জন্য; নতুবা, কবির সৃষ্টি প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, তাহাদের কোনও জাতি নাই। আধুনিক সমালোচনা-বিজ্ঞান জাতি ধরিয়া কোনও রস-রচনার বিচার করে না—কেন করে না, তাহার একটু আভাস মাত্র এখানে দিলাম, সুধী রসিক-মাত্রেই বাকিটা বুঝিয়া লইবেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বলিতে আমরা একজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তির বিশিষ্ট প্রেরণার বিশিষ্ট রূপের—বা ছাঁচের—সৃষ্টি বুঝিব; তাহাকে উপন্যাস বলিতে হয় বল, না বলিলেও কিছুমাত্র হানি নাই; বরং তাহাতে রস-প্রমাণের বাধা আরও অল্প ঘটিবে। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি বঙ্কিমী গদ্যকাব্য—তাহার রূপ তাহারই, আর কাহারও সহিত তাহার সগোত্রতা থাকিতে পারে না; কারণ, অন্যতর কবিও স্বতন্ত্র, তাঁহার সৃষ্টিও তদ্‌জাতীয়; তাহার সমজাতি অন্য কোনও উপন্যাস পূর্ব্বে ছিল না, পরেও হইবে না। ইহাই রসবিচারের গোড়ার কথা।

বঙ্কিমের সেই সৃষ্টি যদি সার্থক রস-পরিণতি লাভ না করিয়া থাকে, তবে তাহা 'উপন্যাস' হয় নাই বলিয়া নহে—তাহারই নিজস্ব প্রেরণা বা ভাব-প্রকৃতিকে সে লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া। যাহারা উপন্যাস বলিতে

অতি-আধুনিক কোনও আদর্শের দোহাই দেয়, এবং তাহারই মাপ-কাঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে মাপিয়া তাহার রস-বিচ্যুতি প্রমাণ করিতে চায়, তাহারা শুধুই বেরসিক নহে, মূর্খও বটে। কারণ, রস-বিচারের পদ্ধতি সম্বন্ধেই তাহারা অজ্ঞ। গোলাপ বাঁধাকপি হইল না, কাব্য ইতিহাস হইল না—বলিয়া যাহারা তর্ক উত্থাপন করে, তাহারা ফুলের বাগানে ফলের গাছ দেখিতে না পাইয়া, বা অর্কিড্-হাউসে লাল-নীল মাছের চৌবাচ্চা না দেখিয়া, নিরাশ হইয়া নিজেদেরই রুচি ও রসবোধের অভ্রান্ত পরিচয় দেয় মাত্র। বঙ্কিমের উপন্যাস শরৎচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নহে; অতি-আধুনিক সাইকলজি, সেক্সলজি, বায়োলজি বা সোশিয়োলজি-মূলক রস-প্রবন্ধও নহে। রসকে যাহারা কোনও যুগ-মনোবৃত্তির—কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের তত্ত্ব-বুদ্ধির—সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া তবে স্বীকার করিয়া লয়, তাহারা সাহিত্য, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের রসপিপাসা মিটাইবার উপায়, তাহার চর্চ্চা না করিয়া দর্জ্জীর দোকান খুলিয়া নিত্য-নূতন পোষাকের ফ্যাশন সম্বন্ধে তাহাদের ফতোয়া জারি করিলে তবু একটা কাজ হয়—আধুনিকত্ববিলাসী বাবুদের মনোরঞ্জন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

জানি, এ কথাটাও ছিদ্রহীন হইল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস উপন্যাসই হউক বা আর যাহাই হউক, তাহার মধ্যে উপাদান-বৈষম্যহেতু রস-বিরোধ ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, তিনি যে সব চরিত্র ও ঘটনার উপাদানে এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবের ভান আছে, অথচ তাহা বাস্তব-অনুকারী নহে। অভিযোগটা মারাত্মক বটে। বাস্তবের কথা বলিলে তো আর কথাটি কহিবার জো

নাই! কথাটা কিন্তু এইরূপ দাঁড়ায়। আরব্য-উপন্যাস বাস্তবের ভান করে না—তাহা নিছক কাহিনী মাত্র। কিন্তু এ ধরনের উপন্যাস (আবার সেই জাতিবাচক নাম!) যে পরিচিত প্রত্যক্ষের দোহাই দেয়! অর্থাৎ, বাস্তব-জীবন বা মানুষের সত্যকার নিয়তি সম্বন্ধে গল্প করিতে বসিয়াও (তাহাকে লইয়া কাব্যসৃষ্টি করিবার কালেও!)—কল্পনাকে বাস্তব তথ্যের কঠোর শাসন স্বীকার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পোস্টমাস্টার' গল্পে 'রতন' মেয়েটির কথা বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকেও বাস্তবের শাসন মানিতে হইয়াছে—আমরা পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র রতনের মত গ্রাম্য-বালিকার মুখেও অতি সূক্ষ্ম ও গভীর কাব্য-কল্পনাসুলভ হৃদয়টিকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; এবং পোস্টমাস্টারটির মত কলিকাতার ছেলেরই নয়—যে কোনও আপিসের যুবক-কেরানীর প্রাণে, মানব-ভাগ্যের দার্শনিক কাব্যিয়ানা এমনই ভাবে উৎসারিত হইতে দেখি। কাজেই 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি বাস্তবের প্রতিলিপি বলিয়াই এমন একটি সার্থক রস-সৃষ্টি হইয়াছে! কিন্তু 'ভ্রমর'—সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ হইলেও অশিক্ষিত, এবং তাহার জীবন বৈচিত্র্যহীন; অর্থাৎ, সে না পড়িয়াছে লরেটোয় বা ডায়োসিসানে, না করিয়াছে ট্রামে-ট্যাক্সিতে প্রেম, না পড়িয়াছে সেক্সলজি—তাহার মত মেয়ের মধ্যে এত বড় ট্রাজেডির নায়িকা সম্ভব হইল কেমন করিয়া! আবার, বঙ্কিমচন্দ্র যে সব বীর-পুরুষকে নায়ক করিয়াছেন—তাহারাও শেষে আর কিছু করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়! ইহা কি জীবনের সত্য? সন্ন্যাসী হইব কোন্ দুঃখে? দেখ দেখি, আমি—আধুনিক সভ্য মানুষ—কেমন সসম্মানে কুলচুরী-সমাজে বাস করিতেছি! বিবাহ করি নাই—সে মূর্খতা আমার নাই। বিবাহ করিলেও স্ত্রী যদি অনন্যপূর্ব্বা হইত,

অথবা 'নিখিলেশে'র স্ত্রীর মত বন্ধুর সঙ্গে প্রকাশ্যেও প্রেম করিত, তাহাতে কষ্ট পাইবার মত ক্ষুদ্র অশিক্ষিত জীব আমি নহি। চরিত্র-নীতির কোনও দুর্ব্বলতাই নাই, তাই কোনও সংশয় বা আধ্যাত্মিক সঙ্কট আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। তিন পয়সার চাকরি বা পাঁচ পয়সার ঘুষে আমি আত্মবিক্রয় করিয়া থাকি; এক কাপ চায়ের জন্য ধনী বন্ধুর আড্ডায় মোসাহেবি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না; কিন্তু সেই আমি বিশ্বমানব ও বিশ্বসাহিত্যের অতি-উচ্চ আদর্শ কেমন উপলব্ধি করিতে পারি! জীবন-রস-রসিকতার এই যে আধুনিক কৌশল, ইহা বঙ্কিমের সেকেলে কল্পনার অগোচর। তাই, এই অতি সরস বাস্তবতা উপেক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কি উপন্যাসই লিখিয়াছেন! সন্ন্যাসী হইতে চায়! কোন্ দুঃখে? মানুষের দেহে বা প্রাণে জুতার আঘাত এমনই কি অসহ্য হইতে পারে যে, মানুষ খুন করিবে বা সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে? আর সন্ন্যাসী হওয়া?—হিন্দুর ছেলে কোনও কারণে সন্ন্যাসী হইয়া যায়, ইহাও কি বাস্তব? বঙ্কিম উপন্যাস লেখেন নাই—কারণ, বাস্তব জীবনের কথা লইয়াই উপন্যাস, এমন গাঁজাখুরি গল্প সে নয়।

খুব সত্য কথা! ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করাই বাতুলতা। এমন গভীর বাস্তব-রস-রসিকতার মুখে বঙ্কিমের উপন্যাস তো ঐরাবত হইলেও ভাসিয়া যাইবে। রসের তর্কে হার মানিলাম; কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে, বাস্তব জিনিসটা কি? দার্শনিক তর্ক না তোলাই ভাল—সেখানে কোনও উত্তরই মিলিবে না। কারণ, বাস্তবের এই 'বস্তু' যে কি, তাহার স্বরূপ এ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই; সর্ব্ব রহস্যের মূল রহস্য তাহাই, আজও তাহারই সন্ধানে কত নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনা হইতেছে। দর্শনের কাজ

তাই আজিও ফুরায় নাই—কখনও ফুরাইবে না। ঋষির দিব্য-দৃষ্টি তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়া দাবি করে, কিন্তু কাহাকেও তেমন করিয়া দেখাইতে পারে না—অথবা, দেখিবার সেই শক্তি কেবল ঋষিরই আছে। কবি এই বাস্তবেরই রসরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাই যে উপায়ে প্রকাশিত করেন, সেই উপায়গুলিই বিবিধ কলা-কৌশল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেও বাস্তবের বস্তুরূপ নয়—রস-রূপ; এবং সে রূপ এক নয়—বহু; কাজেই তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, মানুষের মনোবৃত্তি তাহাকে ধরিতে পারে না—এমন কি, তাহার সেই বৈচিত্র্য বা বহুরূপই তাহার স্বরূপের একমাত্র আভাস। বস্তুর সেই তত্ত্ব—সেই 'burden of the mystery' কবিকল্পনায় যে-রূপে ধরা পড়ে, তাহাই কাব্য; এবং এই কবি-দৃষ্টি যে রচনায় নাই তাহা সাহিত্যিক সৃষ্টি-নামের অযোগ্য। অতএব, যেখানে রস-বিচারই মুখ্য অভিপ্রায়, সেখানে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নই অবান্তর। বরং, বস্তুসকলের অন্তর্নিহিত এবং অপরোক্ষ অনুভূতি-গোচর যে বাস্তবতা—রস-সৃষ্টিতে সেই বাস্তবতাই ফুটিয়া উঠে বলিয়া রসিকচিত্ত গভীরভাবে আশ্বস্ত হয়। এই বাস্তবতা ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে যাচাই করিবার নয়। রসলোক বা কাব্যজগৎ এই ব্যবহারিক জগতেরই একটা মানস-প্রতিচ্ছবি নয়, তাহার অবাস্তবতা-প্রমাণে সে জগতের সাক্ষ্য চলে না। কোনও গদ্য বা পদ্য-কাব্য এইরূপ বাস্তবতার গুণেই যেমন উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নয়, তেমনই তাহার অভাবেই, উৎকৃষ্ট কাব্য নহে। জীবনকে যে-ভাবে ইচ্ছা দেখিবার স্বাধীনতা কবিমাত্রেরই আছে—তথাকথিত বাস্তবেরই অবাস্তব-রমণীয়তা সৃষ্টি করিবার অধিকার যেমন তাঁহার আছে, তেমনই অবাস্তবকেও আমাদের রসচেতনার পরিধির মধ্যে আনিয়া এবং তাহার

অনুগত করিয়া, বাস্তব-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকারও কবিরই আছে। সেই যাদুশক্তিকেই কবিপ্রতিভা বলে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তত্ত্বের দিক দিয়া যেমন, তেমনই কাব্যরসের দিক দিয়াও বাস্তব বলিয়া কিছু নাই, কারণ, 'বাস্তব' একটা ব্যবহারিক প্রাকৃত সংস্কার মাত্র। বস্তুকে কেহ দেখে নাই; সেই জন্য কাব্য-সাহিত্যও বাস্তবতার দাবি করে না—বরং বস্তুর অন্তরালে যে পরম রহস্যময় সত্তা আছে তাহারই রূপ, নানা ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে আমাদের রসচেতনার গোচর করিতে চায়—জ্ঞানচেতনার নহে। এই জন্যই প্রত্যেক রসসৃষ্টি মৌলিক ও স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটির একটা নিজস্ব ভাব-সঙ্গতি আছে—সেই সঙ্গতিই তাহার বাস্তবতার প্রাণ। এই সঙ্গতি-রক্ষা যদি কোনও কাব্যে না হইয়া থাকে, তবে কবি-প্রেরণা সত্য ও সার্থক হয় নাই বুঝিতে হইবে। আধুনিক সাহিত্যে যে বাস্তবতার জয়-ঘোষণা হইয়া থাকে, তাহা রস-বস্তুর বাস্তবতা নয়—উপাদানের বাস্তবতা মাত্র। সেই বাস্তবতার বিরুদ্ধে রসিকের কোনও নালিশ নাই; কিন্তু সেই সকল রচনা যদি সার্থক রসসৃষ্টির দাবি করে, তবে সেই উপাদান-বস্তু সত্ত্বেও তাহাকে রস-পদবীতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, নতুবা বাস্তবতার দোহাই দিয়াই তাহা কাব্যপদবাচ্য হইবে না। অতএব কবি-কল্পনার আশ্রয় যাহাই হউক, সেই উপাদান-বৈচিত্র্য রসরূপেরই বৈচিত্র্য বিধান করে—কেবল বাস্তবতার দাবিতেই কোনও রচনা উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। জীবনের এমন কোনও দিক নাই—এমন কোনও বিষয় নাই, যাহা কবিকল্পনার অধিগম্য নহে। সকল কাব্যসৃষ্টির মত উপন্যাসেও বাস্তব-অবাস্তব ভেদ নাই—জীবন ও জগতের একটা রসরূপ উদ্ভাবন করাই তাহার মূলীভূত প্রেরণা। বরং,

যে কাব্য বাস্তব ও অবাস্তবের প্রাকৃত-সংস্কার লোপ করিয়া দেয়, পাঠক-চিত্তে বাস্তব-বুদ্ধিকে দমন করিয়া, সকল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দেয়—সেই উপন্যাস কাব্যগুণে, অর্থাৎ রসসৃষ্টিহিসাবে তত উৎকৃষ্ট। ঘোড়ার পিঠে দুইখানা পাখা বসাইয়া দিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না—যদি সেই কাব্যে পক্ষবান ঘোড়াকে সত্যকার জীবন্ত ঘোড়া বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোনও বাধা না পাই। এই যে "**suspension of disbelief**"—পাঠকের স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ—ইহাই কবির যাদুশক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিতেছি, তাহার বিধান আমারই বিধান; আমার কল্পনা বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া, সম্ভব-অসম্ভবের সকল প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, তোমার প্রত্যক্ষ পরিচিত জগৎকেও উল্টাইয়া ধরিয়া—মূককে বাচাল করিয়া, পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাইয়া, বীরকে কাপুরুষ ও কাপুরুষকে বীর করিয়া, নদীকে সাগর করিয়া, বাঙালী পল্লীবধূর পায়ের মলের আঘাতে ঘোড়া ছুটাইয়া, কিংবা তাহার মুখরতায় শাহান-শা বাদশাহকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করাইয়া—যে কাব্য নির্ম্মাণ করিবে, তাহাই আরও সত্য, আরও বাস্তব। যদি তাহা না হয়, তবে, হয় তুমি রসাস্বাদনের অধিকারী নও, নয়, আমারই শক্তির অভাব আছে; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে তোমার এই বাস্তব-জগতের সাক্ষ্য নিতান্তই অপ্রযুক্ত ও হাস্যকর;—এমন কথা বলিবার অধিকার যে কোনও কবির আছে।

আমি বলিয়াছি, যুক্তি-তর্কের যে বাস্তব—তাহা কাব্যসৃষ্টির বাস্তব নহে। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়াও যুক্তি-তর্কের বাস্তব নির্ভরযোগ্য নয়। মানুষের জীবনই ধরা যাক। সাধারণ মনুষ্য-জীবন বা ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা সম্যক্ বা সম্পূর্ণ নয়। জীবনের

সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ব্যর্থতা ও সফলতা—এ সকলের স্বরূপ-নির্ণয় বা স্থির-সিদ্ধান্ত আমাদের বুদ্ধির অতীত। সুখ-দুঃখের আপেক্ষিক মূল্য, অবস্থা ও চরিত্র-বিশেষে তাহার জমাখরচের হিসাব, কে কবে ঠিক করিয়া দিতে পারিয়াছে? পাপ ও পুণ্য দুই-ই তত্ত্বহিসাবে যাহাই হউক—তথ্য হিসাবে সত্য; কারণ, পাপ ও পুণ্য-বোধ মানুষের চেতনায় সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে—সুস্থ ও সহজ মানুষের সংস্কারে তাহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই পাপ-পুণ্যের সার্ব্বজনীন কোনও নিরিখ নাই। মানুষের মনুষ্যত্ব বলিতে আমাদের যে একটা সাধারণ ধারণা আছে তাহাও বাস্তব নহে; কারণ, প্রত্যেক মানুষই অপর হইতে ভিন্ন, অতএব প্রতিপদে মনুষ্যত্বের সেই সংজ্ঞা কোনও না কোনও অসাধারণ লক্ষণের সম্মুখে মিথ্যা হইয়া পড়ে। ভাল করিয়া দেখিতে জানিলে, জীবন ও জগৎঘটিত কোনও-কিছুর বিষয়ে তুমি বাস্তবের একটা মাপকাঠি খুঁজিয়া পাইবে না। আবার প্রত্যেক মানুষের জগৎ তাহারই নিজস্ব প্রকৃতি, সংস্কার ও বোধশক্তির ফলে একটা স্বতন্ত্র জগৎ। তাই রসিক ও ধ্যানী যাঁহারা, তাঁহারা এই কারণেই কখনও বস্তুর বাস্তবতার মোহ স্বীকার করেন না। কবির কাব্যে এই তথাকথিত বাস্তব—অজ্ঞানীর পক্ষে যাহা সত্য, এবং জ্ঞানীর চক্ষে যাহা আদি-অন্তহীন সংশয়সঙ্কুল একটা বিরাট ধাঁধা, এবং সেই কারণেই অর্থহীন, নীতিহীন—তাহাই কেবলমাত্র একটি রসরূপের ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় সকল সংশয়ের—সমাধান নয়—লোপ করিয়া, বাস্তব-মুক্তির আনন্দ দান করে। যাহারা সে আনন্দের অধিকারী বা প্রার্থী নহে, তাহারা তাহাকে বিশ্বাসই করে না—তাহারা ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্ম্মী। বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে শাক্তের, বৈদান্তিকের বিরুদ্ধে ঈশ-বাদীর, হিন্দুর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানের

যে বিদ্বেষ—এ বিদ্বেষও ঠিক সেইরূপ। তর্কযুদ্ধের দ্বারা ইহার অবসান কখনও হইবে না।

বাস্তব-অবাস্তবের কথা বলিয়াছি, কাব্যের পক্ষে সেই ভেদ-বুদ্ধি কতখানি সত্য, তাহাও বলিয়াছি। তথাপি রচনাবিশেষে একরূপ অবাস্তবতার স্পষ্ট অনুভূতি জাগে। কিন্তু সে অবাস্তবতা-বোধের কারণ কাব্যবর্ণিত ঘটনা বা চরিত্রই নয়; যে কোনও ঘটনা বা চরিত্র—আমাদের প্রাকৃত সংস্কারে তাহা যতই অসম্ভব বলিয়া মনে হউক—কবির কল্পনা-গুণে বাস্তবরূপে প্রতিভাসিত হইতে পারে। কিন্তু কবি যে জগৎ তাঁহার কাব্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জগতের একটা গূঢ় নিয়ম-সঙ্গতি আছে—চরিত্র ও ঘটনা সেই সঙ্গতি-বিরুদ্ধ হইলেই রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে, সেইজন্য কাব্য অস্বাভাবিক বা অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। অতএব সে অবাস্তবতার প্রমাণ বা মানদণ্ড বাহিরের কোনও বস্তু-সত্য নহে। কবির দৃষ্টি যদি দিব্যদৃষ্টি হয়, তবে কাব্যে সকল বিরুদ্ধ উপাদান একটি সমান রস-পরিণতি লাভ করে। অসম্ভব ও বালকোচিত কাহিনীও কবিকল্পনার বস্তুভেদী দৃষ্টির বলে একটি সুসমঞ্জস রসরূপ পরিগ্রহ করে। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'লীয়ারে'র সমগ্র নাট্য-সৌধ এইরূপ ছেলেমানুষী কাহিনীর উপরেই নির্ম্মিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গেই তাঁহার নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদান গ্রথিত হইয়াছে। অত্যুচ্চ, অতি-গম্ভীর, এবং অতিরিক্ত কাব্য-প্রধান ট্রাজেডিগুলিতে অতি-পরিচিত ও সাধারণ চরিত্র, এবং অতিশয় ঘরোয়া—এমন কি, ভাঁড়ামিপূর্ণ চিত্রও—সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অনেক কমেডিতে ঘটনার অসম্ভব যোগাযোগ বা আকস্মিক রূপান্তর নির্ব্বিরোধে স্থান পাইয়াছে; এমন কি,

'ক্যালিবানে'র মত অনাসৃষ্টিও অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবতার সাধারণ প্রাকৃত মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে এ সকল গাঁজাখুরির সমর্থন করিবে কে? তাই বলিয়া শেক্স্‌পীয়র কি জগৎ ও জীবন—মানুষের চরিত্র বা হৃদয়রহস্যকে তাহার সমগ্র বাস্তবতায় মণ্ডিত করিতে পারেন নাই? এই বাস্তবতার প্রমাণ অন্যরূপ। মানুষের মধ্যে যে সহজ মনুষ্যত্ব আছে, তাহারই গভীরতর চেতনা রসিকের রস-বোধের মধ্যে জাগ্রত হইয়া থাকে; জগতের যাহা-কিছু তাহার বাস্তব-স্বরূপ—তাহা এইরূপ গভীরতর চেতনার সহায়ে রসিকের হৃদয়গোচর হয়, সেখানে ফাঁকি চলে না। যাহা অবাস্তব, তাহা সেই চেতনার প্রবেশ-দুয়ারে বাধা পায়। কবির সৃষ্টি যেমন সমগ্র-দৃষ্টির ফল, তেমনই কাব্যরস-আস্বাদনে রসিকেরও সেই সমগ্র-দৃষ্টি আবশ্যক। এই রসদৃষ্টি লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ যথার্থ রসিক হইতে হইলে, 'genuine being' হইতে হইবে। খণ্ড ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সংস্কার বা কতকগুলা অসংলগ্ন চিন্তাপ্রসূত মতবাদের দর্পণে এই বাস্তব-রূপ প্রতিবিম্বিত হয় না। এইরূপ অবাস্তবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের জাতীয় মহাকবি, মহানাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে প্রায়শই দৃষ্টিগোচর হয়। মানব-জীবন বা চরিত্রের যে রূপ তাঁহার নাটকে চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে অতিচারী কল্পনার মহামহোৎসব বলা যাইতে পারে। 'প্রফুল্ল'-নাটক বাঙালী রসিক-সমাজের বড়ই প্রিয়; কিন্তু এই নাটকের অভিনয় দেখিবার কালে যে মানুষের অন্তরতম মনুষ্যত্ব বিদ্রোহী না হয়, সে খাঁটি বাঙালী হইতে পারে, কিন্তু খাঁটি মানুষ নয়। মানুষকে সু এবং কু-রূপে চিত্রিত করিতে গিয়া এই ভাবাতিরেকগ্রস্ত নাট্যকার যে আতিশয্যকে অভিনয়-সাফল্যের একমাত্র উপায় করিয়া, মানুষের মনুষ্যত্বকে যে ভাবে

লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করিয়াছেন তাহা বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদর্শ নাট্যকলা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ রচনাই কাব্যগত অবাস্তবতার চরম নিদর্শন। ইহাতে কল্পনার সত্য নাই; যে সত্য ঘটনাগত বাস্তবেরও বহু উর্দ্ধে, যে বাস্তবতার গভীরতম উপলব্ধির জন্য রসিকচিত্ত আকুল, এবং যাহার জন্য কবির নিকটে তাহারা কৃতজ্ঞ, সেই সত্য, সেই বাস্তবতা যে কি—এই সকল রচনায় তাহার একান্ত অভাবই সে সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও সচেতন করিয়া তোলে।

নাটকই হউক, আর উপন্যাসই হউক, আর কাব্যই হউক—প্রাচীন হউক বা আধুনিক হউক, তথাকথিত realistic হউক বা idealistic হউক—সাহিত্যের রসবিচারের পদ্ধতি সর্ব্বত্রই এক। কবির কল্পনা আপন প্রয়োজনে উপাদান সংগ্রহ করে, এবং নিজস্ব দৃষ্টি অনুযায়ী রূপ-সৃষ্টি করে। এজন্য উপাদান যেমনই হউক, সেই রূপ বা form-ই কাব্যের সর্ব্বস্ব,—content তাহার সহিত অভিন্ন, একাকার হইয়া থাকে। উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, পৃথকভাবে তাহার মূল্য যাচাই করিয়া, কোনও কাব্যের রসরূপ—যাহা সমগ্রতায় সমাহিত হইয়া থাকে—তাহাকে বিচার করা চলে না। বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনার জন্ম আজিও হয় নাই, তাই যাহারা রসিক নয়, বিদ্বানও নয়—তাহাদের দায়িত্বহীন ও নির্লজ্জ আত্ম-ঘোষণায় সমালোচনার ভবিষ্যৎও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। আত্মঘোষণা বলিলাম এই জন্য যে, ইহারা সাহিত্যের ধার ধারে না—সাহিত্য-সমালোচনার অজুহাতে কতকগুলা দুঃসাহসিক উক্তি করিয়া পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই, বিগত শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য—যাহা বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, এবং সেই সাহিত্যের যিনি অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি-পুরুষ, তাঁহাকে লইয়া বপ্রক্রীড়া

সুরু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথই হউন, আর শরৎচন্দ্রই হউন—পরবর্ত্তী যে কোনও প্রতিভাশালী লেখক হউন—এ সাহিত্যের যে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, সেখান হইতে সকলকেই উচ্চকণ্ঠে এ কথা বলিবার অধিকার তাঁহারই আছে—"**Not to know me is to argue yourself unknown.**"

পৌষ, ১৩৪৩

রামমোহন রায়

রামমোহন-শতবার্ষিক-উৎসব হইয়া গেল, বক্তৃতামঞ্চে ও সংবাদ-পত্রে ক্ষণকালের জন্য বাংলা দেশ রামমোহনের নামকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠিল। রামমোহন যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, গত এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতির যে দিকে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, সে সকলের মূলে একা রামমোহন—এই কথাটাই বাঙালীকে স্মরণ করাইয়া দিবার একটা প্রচণ্ড প্রয়াস আমরা দেখিলাম ; কারণ এ উৎসব কেবল স্মৃতি-উৎসব নয়, ইহা রামমোহনের রাজ্যাভিষেক-উৎসবও বটে—সমগ্র বাঙালী শিক্ষিত সমাজ রামমোহনের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব একরূপ স্বীকার করিয়াছে, এদিক দিয়া অনুষ্ঠাতৃবর্গের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এই উৎসবে শিক্ষিত সমাজের দিগ্‌গজগণ পড়াপাখির মত যে ধরনের আলোচনা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে, বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় যে একটি কথা বলিয়াছিলেন তাহাই বার বার আমার মনে পড়িয়াছে—সে কথাটি এই যে, বাঙালী জাতির সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ, বাঙালী চিন্তা করিবার শক্তি হারাইয়াছে। গড্ডালিকাবৃত্তির এমন পরিচয় বাঙালী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেয় নাই।

রামমোহন রায় একজন অসাধারণ পুরুষ, শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের—যে সমাজকে বাংলার জাতীয় সমাজ বলা যায়—সেই বিরাট হিন্দুসমাজের নানা ক্ষেত্রে এমন বহু মনীষী ও অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির

অভ্যুদয় হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া একমাত্র রামমোহনকে এ জাতির প্রফেট বা ভবিষ্য-বিধাতা বলা যায় না—কেন, তাহাই আমার জ্ঞানবিশ্বাসমত একটু আলোচনা করিবার জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। রামমোহনের স্মৃতিপূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার কোনও মতান্তর নাই। অন্যান্য বিশিষ্ট বাঙালীর স্মৃতিপূজা যেমন সঙ্গত ও শোভন, রামমোহনের স্মৃতিপূজাও তেমনই সঙ্গত ও শোভন। কিন্তু আজিকার দিনেও রামমোহনকে এ জাতির ভবিষ্য-বিধাতা বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। রামমোহনকে যাঁহারা একটা অসঙ্গত উচ্চ আসনে বসাইবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবই তাহার কারণ। আজ তাঁহারা সেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই সমগ্র জাতির উপরে চাপাইবার সুযোগ লইয়াছেন। জানি, বাহিরের এই উৎসব-ঘনঘটা বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ হুজুগ-প্রিয়তার পরিচায়ক, এরূপ অনুষ্ঠানের মূল্য খুব বেশি নয়; তথাপি, এই উপলক্ষ্যে কতকগুলি মিথ্যা ধারণার প্রচার বাড়িবে, এবং মোহগ্রস্ত বাঙালীর মোহ ঘুচিতে চাহিবে না।

বাঙালী তাহার উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ভাল করিয়া জানে না; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং কতক পরিমাণে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পণ্ডিতগণ যেটুকু উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসাদে তাহার কিছু কিছু শিক্ষিত বাঙালীর জানা আছে; কিন্তু যে যুগের অবতাররূপে রামমোহনকে খাড়া করা হইয়াছে, সেই উনবিংশ শতাব্দীর বহুমুখী সাধনা ও আন্দোলনের ইতিহাস সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী—এমন কি অতিশিক্ষিত বাঙালীও—সম্যক অবগত

নহেন। অন্তত যতখানি জ্ঞান থাকিলে সে যুগের ইতিহাসে রামমোহনের স্থান বুদ্ধিবিচারসহকারে স্থির করিয়া লওয়া সম্ভব, সে জ্ঞান এই হুজুগকারীদের নাই। রামমোহনের ইহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না; কারণ, জাতির নিকটে যেটুকু শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহার প্রাপ্য এই অত্যুক্তি ও অযথা-ভাষণের আপাতসাফল্যের পরিণাম সে পক্ষে সুবিধাজনক নয়। রামমোহনকে এ-জাতি এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পায় নাই, এবারে এতবড় একটা উপলক্ষ্যেও সে সুযোগ হইল না। এক শত বৎসর পূর্ব্বে, সেই যুগের প্রতিবেশ ও বিশিষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে, রামমোহনের মত মনীষীর যে অসাধারণত্ব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু সেই জন্যই তাঁহাকে ভাবী কালের দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলিয়া ঘোষণা করিলে কেবল রামমোহনকেই বিড়ম্বিত করা হয় না, এই কালের অন্যান্য যুগন্ধর পুরুষের প্রতি অবিচার করা হয়; তাহাতে জাতিরও গৌরববৃদ্ধি হয় না। রামমোহন যদি মহাপুরুষ হইতেন, তাঁহার চরিত্রে যদি এমন কোনও আত্মিক শক্তি বা সর্ব্বাঙ্গীণ মানবীয় মহিমার প্রদীপ্তি প্রকাশ পাইত, তবে জাতির চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ তাঁহার সেই দিব্য দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিবার প্রয়োজন থাকিত; সকল মহাপুরুষই এই কারণে সর্ব্বকালের ও সমগ্র মানবগোষ্ঠীর পূজনীয় হইয়া থাকেন। রামমোহন সাধারণ মানুষের চেয়ে যত বড়ই হউন, একটা জাতির জীবনে একক গুরু বা আদি আদর্শরূপে তাঁহার স্থান হইতে পারে না। এই ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু মহাপুরুষ, বহু প্রেমিক ত্যাগী কর্ম্মী ও মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বাণী ও সাধনার ফল জাতির মর্ম্ম-স্থলে এখনও জাগ্রৎ হইয়া আছে। এই প্রাচীন জাতিকে

আধুনিককালের কোনও একজন ব্যক্তির শিষ্যত্ব স্বীকার করাইতে হইলে, প্রথমে প্রমাণ করা আবশ্যক যে, এই জাতি তাহার পূর্ব্ব সাধনা ও ঐতিহ্য, তাহার যুগান্তরাগত ঋকৃথ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবাপন্ন হইয়াছে; সে তাহার পৈতৃক সকল সম্পত্তি তুচ্ছ করিয়া কেবল উপনিষদ-বেদান্তের এক অভিনব ভাষ্যকেই সভ্য ও ভদ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রমাণ করিতে হইবে যে, রামমোহনের পরে আর কেহ সেই অতীতকে আর কোনও রূপে উদ্ধার করিয়া ভিন্নতর আদর্শে এই জাতির নবজন্মবিধানে সহায়তা করেন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গত শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস এখনও ভাল করিয়া আলোচিত হয় নাই; শিক্ষিত সমাজ এখনও সে বিষয়ে অজ্ঞ; এই অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া অতিশয় দায়িত্বহীন উক্তি বা অত্যুক্তি করিলে কোনও স্থায়ী ফল হইবে না। ইহা ছাড়া, রামমোহনের জীবনবৃত্ত যাহা প্রচলিত আছে, তাহা যে নির্ভরযোগ্য নয়, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। যে সমাজ তাঁহাকে এতকাল আপন কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে—হিন্দুর সাধনা-ধারণার প্রতি একটা উদ্ধত অবজ্ঞার মনোভাব এবং সাম্প্রদায়িক মতবাদের দ্বারা তাঁহার প্রকৃত পরিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আজ এতকাল পরে রামমোহনের সেই অযথার্থ ও অনৈতিহাসিক মূর্ত্তিকে পূজা করিবার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান করা সেই সমাজের পক্ষে, আর যাহাই হউক—সততার কার্য্য নহে। সত্যকার রামমোহনকে তোমরা বুঝিতে দিবে না—জাতীয় জাগৃতির বহুমুখী সাধনার ক্ষেত্রে অন্যান্য মহাপুরুষগণের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায়, সে ঐতিহাসিক বিচার তোমাদের মনঃপূত নয়; আর কোনও হিন্দুর সাধনা, ত্যাগ, চরিত্র ও প্রতিভার উল্লেখ পর্য্যন্ত

তোমাদের অসহ্য—এক কথায়, জাতির দিক দিয়া, বৃহত্তর সমাজের সার্ব্বজনীন ভাব-অভাবের দিক দিয়া, রামমোহনের মনীষা ও কৃতিত্বের বিচার তোমাদের অভিপ্রেত নয়। কাজেই বলিতে হয়, যে রামমোহনকে তোমরা খাড়া করিয়াছ, সেই রামমোহন একটা ভাক্ত বিগ্রহ; তাহাকে পূজা করিয়া জাতির, ইহলৌকিক বা পারলৌকিক, কোনও কল্যাণ হইবে না।

রামমোহনের যুগ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ মাত্র; ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামমোহনের কীর্ত্তিকাল। এই কালেই আমরা তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট বাঙালী মনীষীরূপে প্রত্যক্ষ করি। জাতি তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু জাগিবার বিলম্ব নাই; রামমোহন পূর্ব্বেই জাগিয়াছেন—ইহাই রামমোহনের গৌরব। কিন্তু রামমোহনই আর সকলকে জাগাইলেন, তাঁহারই জাগরণী-মন্ত্রে সকলে জাগিয়াছিল, কেহ স্বতঃ জাগরিত হয় নাই—এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা জাতির কথা বলেন না, সম্প্রদায়ের কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্তি কতকটা এইরূপ। রাজা রামমোহন যেটুকু জাগাইয়াছেন, এ জাতি ঠিক ততটুকু জাগিয়াছে; হিন্দু বাঙালী-সমাজে—ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে—যে জাগরণ-চিহ্ন দেখা যায়, তাহার যতখানি রামমোহন-নিরপেক্ষ ততখানিই তুচ্ছ; কারণ, তাহার মূলে পৌত্তলিকতা রহিয়াছে। ইহার উত্তরে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ইতিহাস বাঙালী হিন্দুজাতির নব অভ্যুত্থানের ইতিহাস; তাহার মূলে খ্রীষ্টান অথবা আর কোনও ধর্ম্মমতের দংষ্ট্রাদীপ্তি নাই। এই জাগৃতির মূলে যদি কোনও শক্তি কাজ করিয়া থাকে, তবে তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। এই প্রভাব, জাতির বিশিষ্ট ভাবপ্রকৃতির সহিত ক্রমান্বয়

ঘাত-প্রতিঘাতে, অবশেষে তাহার মগ্ন চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে আত্মস্থ করিয়াছে। এই প্রভাবের প্রথম ফল রামমোহন; কিন্তু রামমোহনে যাহা একরূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাই অনতিবিলম্বে স্বাভাবিক নিয়মে নানারূপে ফুটিয়া উঠিল। রামমোহনের মধ্যে যাহা মনকে মাত্র স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী কালে জাতির প্রাণে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর ও গভীরতর স্পন্দন সৃষ্টি করিয়াছে; তজ্জন্য রামমোহনই দায়ী নহেন—দায়ী বাঙালীর চরিত্র ও প্রতিভা, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘনিষ্ঠতর প্রভাব। রামমোহনের প্রভাব যে সীমাবদ্ধ, তাহার প্রমাণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেই পাওয়া যাইবে। রামমোহনকে এই সমাজ একরূপ জোর করিয়া নিজেদের গুরু বলিয়া প্রচার করেন। রামমোহনের আদর্শ বা অভিপ্রায় ইঁহারা অনুসরণ করেন নাই—কি সমাজ-ব্যবস্থায়, কি ধর্ম্ম-সাধনায়, কুত্রাপি তাঁহারা রামমোহনের উপদেশ গ্রাহ্য করেন নাই। খ্রীষ্টান ধর্ম্মতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের মহিমায় আত্মবিক্রীত সেকালের কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি রামমোহনের উপরেও তাঁহাদের যুক্তিমূলক স্বাতন্ত্র্যবাদকে স্থাপিত করিয়া যে নূতন সমাজ নির্ম্মাণ করিলেন, রামমোহন জীবিত থাকিলে তাহাতে যোগ দিতেন কি না সন্দেহ। এই তো গেল তথাকথিক রামমোহনপন্থীদের কথা। হিন্দুসমাজ, অর্থাৎ সেকালের বাঙালী জাতি, রামমোহনকে তো গ্রহণ করেনই নাই, বরং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার দ্বারা এই জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। বাঙালীর এই সত্যকার জাগরণ-চেষ্টার মূলে যে প্রেরণা কাজ করিয়াছিল, তাহা উপনিষদের নবতন ব্যাখ্যা নয়—জাতির আত্মার ঐতিহাসিক প্রকাশটিকে বুঝিয়া

লইয়া তাহারই আলোকে স্বধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কামনা। যুক্তিবিচারকেই সে একমাত্র পন্থা বলিয়া স্বীকার করে নাই—মস্তিষ্কের সাহায্যে হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত পরধর্ম্মের আলোক তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই; নিজ প্রাণের দীপশিখার সাহায্যে সেই দুর্গতির অন্ধকারে পথসন্ধান করিয়াছিল বলিয়াই সে আজ আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়ের ভূমিতে একটা বিশিষ্ট সাধনাসম্পন্ন জাতিরূপে উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। গত শতাব্দীর ইতিহাসে বাঙালী জাতির এই সাধনা ও সিদ্ধির মূল সত্যটিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শতাব্দীর শেষ ভাগে এই প্রকৃত জাতীয় জাগরণের ফলে, একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ আত্মঘাতী ও জাতিধর্ম্মবিরোধী আন্দোলন ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এমন করিয়া বাঙালী যদি আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিত, তবে আজ এই বিংশ শতাব্দীর দারুণতর সঙ্কটে জাতিহিসাবে টিঁকিয়া থাকিবার আশাও আর থাকিত না।

রামমোহনকে হিন্দুসমাজ কখনও ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, তাঁহার বাণী বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধও করে নাই; তাঁহার নাম ও তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি প্রবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ততোধিক হাস্যকর কথা এই যে, তথাপি গত যুগের জাতীয় জাগরণের মূলে রামমোহনের সেই বাণীর প্রভাব স্বীকার করাইতে তাঁহার ভক্তগণ বদ্ধপরিকর। রামমোহনের মহত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে সকল কাহিনী বা কিম্বদন্তী, অসম্পূর্ণ তথ্য ও অর্দ্ধ-সত্য বার বার উত্থাপিত হইয়া থাকে, সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি অতঃপর তাহারই কয়েকটির প্রতি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

রামমোহনের প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব তিনি এ জাতির ধর্ম্ম সংস্কার করিয়াছিলেন। সংস্কার কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে, তিনি হিন্দুর ধর্ম্মমন্ত্রকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করিয়াছিলেন, তবে তাহা সত্য নহে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করিব না, সে অবকাশ নাই। আমি কেবল কয়েকটি প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিব মাত্র। প্রথমত, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে একেশ্বরবাদ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার বৈদান্তিক ব্যাখ্যা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত; হিন্দুর ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে সেই সেমিটিক ঈশতত্ত্ব কুত্রাপি নাই—উপনিষদেও নাই। ব্রহ্মবাদ একেশ্বরবাদ নহে—অদ্বৈততত্ত্ব Monotheism নহে। শঙ্করের উপরে তিনি যে খোদকারী করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তর্কশক্তির পরিচয় আছে; কিন্তু তাহা 'সোনা ফেলিয়া আঁচলে গেরো দেওয়া'র মত। শঙ্করের অদ্বৈত-তত্ত্বের উপরে তিনি যে ধরনের ব্রহ্মতত্ত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা জীববিশেষের স্কন্ধের উপরে অপর জীবের মুণ্ড স্থাপনের মত। এই নব বেদান্ত-ব্যাখ্যা হিন্দুদর্শন বা ধর্ম্মতত্ত্বের সংস্কার বা সংশোধন নহে; ইহার মূলে ছিল হিন্দুর বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে নিম্নতর ঈশবাদের দ্বারা আবৃত করিবার চেষ্টা। রামমোহন নিম্নাধিকারীর জন্য যে ধরনের ব্রহ্মজ্ঞান ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা হিন্দুমতে নিম্নাধিকারও নয়, একেবারে ভিন্ন পন্থা; কারণ তাহা স্বীকার করিলে উচ্চতর অধিকারে আর পৌছিতে পারাই যায় না। দ্বিতীয়ত, তিনি পৌত্তলিকতার যে ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিজাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক। আধুনিক হিন্দুর পূজাপদ্ধতি যদি অনাচারদুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহার সংশোধন কোনরূপ অহিন্দু ধারণা হইতে করা যাইবে না। যে

পৌত্তলিকতা হিন্দুর ধর্ম্মসাধনায় নানারূপে, নানাভাবে ও ভঙ্গিতে স্ফুটতর হইয়া হিন্দুর হিন্দুত্বের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে; যাহার তত্ত্ব, চিন্তাশীল মনীষী, ভাবুক কবি, ত্যাগী মহাপুরুষ অথবা ধর্ম্মপরায়ণ সাধু কেহই মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই; যাহার পশ্চাতে শত শত বৎসরের জনকল্যাণ-চিন্তা সংহত হইয়া রহিয়াছে—তাহাকে একেবারে অস্বীকার করাও যা, আর হিন্দুকে তাহার স্ব-প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে বলাও তাই। সহস্র বৎসরের সাধনা ও তত্ত্বচিন্তার ফলে হিন্দু যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহার সাধন-মার্গ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তথাকথিত পৌত্তলিকতা হিন্দুর হিন্দুত্বের নিদান। প্রতিমা-পূজাই সে পৌত্তলিকতার সার সত্য নয়, তাহার তত্ত্ব আরও গূঢ়, আরও গভীর। প্রতীক-উপাসনা যদি অতি স্থূল ও আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত প্রতিমাপূজায় পরিণত হইয়া থাকে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে কোনও অহিন্দু উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলে, ধর্ম্মসংস্কার নয়—ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুর পৌত্তলিকতা কাঠ-পাথরের পূজা নয়, হিন্দুর সাকারতত্ত্ব পাশ্চাত্য Paganism নয়। ব্রহ্মস্বরূপের যে ধারণা হিন্দু-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, কেবল মানস-বিলাসের উপকরণ হিসাবে নয়—সাধনার ক্ষেত্রে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে সোপান-পরম্পরার প্রয়োজন; নতুবা সে তত্ত্ব তত্ত্বই থাকিয়া যায়, সাধনীয় হইতে পারে না। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' তাহাকেই—অর্থাৎ, একেশ্বরবাদের অতিস্থূল ব্যক্তিজ্ঞানসাপেক্ষ উপলব্ধি নয়—সেই সর্ব্বসংস্কার-নিরপেক্ষ পরমতত্ত্বকে লাভ করিতে হইলে, তাহার দিকে মনকে শেষ পর্য্যন্ত মুক্ত রাখিতে হইবে; পৌত্তলিকতা সেই মুক্ত মনের ধর্ম্ম—সর্ব্বাশ্রয়ী ও সর্ব্বতোমুখী কল্পনার সহায়। সে

ক্ষেত্রে নিরাকার একেশ্বরবাদের শাসন অত্যাচারী রাজশাসনের মতই পীড়াদায়ক। অতএব কোনও বিজাতীয় আদর্শ, বিশেষত হিন্দুর অতিশয় বিপরীত যে সেমীয় প্রকৃতি, তাহারই উদ্ভাবিত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাবে যাঁহারা এই পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ করিতে চান, তাঁহারা সংস্কারকামী নহেন; তাঁহারা ব্যক্তিগত জ্ঞানাভিমানের বশে একটা জাতিকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিবার প্রয়াসী। রামমোহন ধর্ম্মবিষয়ে যে মতই প্রচার করুন, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই—হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই। তিনি নিজে কোনরূপ ধর্ম্মসাধনা করেন নাই—ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা করিয়া থাকিলেও এবং সেই চিন্তার একরূপ মানসিক উপভোগ-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও, তাঁহাকে পরম ভাগবৎ বলা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্রের মত তাঁহার কোন ধর্ম্ম-বাতিক ছিল বলিয়া আমরা জানি না। এ হেন ব্যক্তির পক্ষে কোনও জাতির আধ্যাত্মিক পিপাসা পরিতৃপ্তির পথ, বা ভগবৎ-সাধন-প্রণালী নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তাঁহার সে অধিকারই ছিল না, এবং মনে হয়, তাঁহার সে উদ্দেশ্যও ছিল না। ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা তিনি না করিলেই ভাল করিতেন। তিনি তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অস্ত্রখানি সর্ব্বত্র চালনা করিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিয়া যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন, তাহাতেই আমরাও মুগ্ধ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে এ জাতির ধর্ম্ম-সংস্কারক, তাঁহার সময় হইতে অনাগত যুগ ধরিয়া তিনিই যে এ জাতির ধর্ম্মগুরু, এমন হাস্যকর উক্তির প্রতিবাদ করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

রামমোহনের দ্বিতীয় কৃতিত্ব—সমাজ-সংস্কার। এ ধরনের একটি কাজই তাঁহার নামের সঙ্গে বিশেষ করিয়া যুক্ত হইয়া আছে—সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ। অস্পৃশ্যতা বা জাতিভেদের উচ্ছেদ, বাল্য-বিবাহ

নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রভৃতির মত সমাজ-সংস্কার ইহা নহে; আমরা আরও জানি, রামমোহন এ ধরনের সমাজ-সংস্কারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে সমাজের ভিতর হইতে তাহা করিতে হয়; আইন প্রণয়নের দ্বারা যে ধরনের সংস্কারকার্য্য হয়—তাহা পীড়িত সমাজদেহের একটা বাহ্যিক উপসর্গ দূর করা মাত্র। ইহার দ্বারা ব্যাধির মূলে হস্তক্ষেপ করা হয় না, সমাজের বিবেক বা হিতবুদ্ধির উদ্রেক্‌সাধন হয় না। সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদসাধনে তাঁহার যে উদ্যম তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়; কিন্তু তাহা সমাজ-সংস্কারের চূড়ান্ত নহে। সতীদাহ নিবারণ সত্ত্বেও সামাজিক সমস্যার সমাধান আজিও হয় নাই। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে উদ্যম, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে, সে যুগে সমাজ-সংস্কারক হিসাবে রামমোহন তাঁহার পার্শ্বে বসিবার উপযুক্ত নহেন। সামাজিক সমস্যার দিক দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা অনেক বেশি মূল্যবান; তাহার প্রমাণ সতীদাহ অতীতের ইতিহাসগত হইয়া আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ এখনও গুরুতর সমস্যারূপে বিদ্যমান। বিলম্বে সতীদাহ-প্রথা বোধ হয় আপনিই উঠিয়া যাইত, যেমন বহুবিবাহ-প্রথা গিয়াছে; তৎসত্ত্বেও স্বীকার করি, এরূপ গর্হিত অনুষ্ঠান একদিনও সহ্য করা উচিত ছিল না—আইনের সাহায্যগ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে আইনের সাহায্যগ্রহণ উৎকৃষ্ট উপায় নয়—কোনও দেশহিতব্রতীই সেই পন্থার সমর্থন করিবেন না। এই জন্যই সতীদাহ-প্রথার নিবারণ যেমন ঠিক সমাজ-সংস্কার নয়—তেমনই তাহার উপায়টিও সমাজ-সংস্কারের উপযুক্ত পন্থা নয়। আজিও এ জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত জননায়ক মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিপুল

আন্দোলনে রামমোহনের পন্থা অবলম্বন করেন নাই। অতএব সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও রামমোহন জাতির পথপ্রদর্শক বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারেন না।

রামমোহনের পক্ষ হইতে আর এক দাবি এই যে, তিনিই নাকি সর্ব্বপ্রথম জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। এই 'সর্ব্বপ্রথম' কথাটি যেন একটি যাদুমন্ত্রের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা এমন অনেক তথ্যের সন্ধান পাই, যাহাতে অতিশয় নূতন ও মৌলিক বলিয়া পরবর্ত্তী কালে যাহা খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তেমন কীর্ত্তিরও মৌলিকতা সন্দেহস্থল হইয়া পড়ে। হয়তো প্রভাবের কোনও সম্ভাবনা নাই—একটা দূর ও দৈব সাদৃশ্যমাত্র আছে, তথাপি, একটা আগে ও একটা পরে—কেবল এই যুক্তির অনুরোধে আমরা অনেক সময়ে অবিচার করিয়া বসি। যদি একই যুগে কোনও একটা বিশেষ সাধনা উত্তরোত্তর প্রকট হইয়া উঠে, তাহা হইলে কে আগে ও কে পরে সেই সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাই বড় কথা নয়; বরং কাহার প্রতিভা প্রথমে ওই সাধনাকে সুনির্দ্দিষ্ট ও সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন করিয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে। কালের একটা প্রভাব আছে—যুগ-প্রয়োজনের একটা তাগিদ আছে—যাহা শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক সকলকে সজাগ করিয়া তোলে। পুষ্পোদ্‌গমের কাল আসন্ন হইলে সকল গাছেই ফুল ফোটে; বাগানের সবচেয়ে বড় ফুল সে-ই নহে—যে সকলের আগে ফুটিয়াছে। উপমাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। ধরা যাক, কোনও পরিবারে একটি সন্তান সর্ব্বাগ্রে বর্ণ-পরিচয় শিখিয়াছে—সকলের আগে জন্মিয়াছে এবং কালক্ষয় করে নাই বলিয়া

বিদ্যাশিক্ষায় সে সকলের অগ্রণী ; কিন্তু তাই বলিয়া সেই অগ্রবর্ত্তিত্বই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। আবার, যদি বর্ণপরিচয় পর্য্যন্তই তাহার বিদ্যার দৌড় হয়, তবে তো কথাই নাই। যদি কেহ বলেন, এই বর্ণপরিচয় তাহারই উদ্ভাবিত—বিদ্যা সে কেবল আরম্ভই করে নাই, সে সেই বিদ্যার জন্মদান করিয়াছে, তবে তাহা কঠিনতর প্রমাণসাপেক্ষ ; কারণ আমরা জানি, সেকালের সকল বিদ্যাই আহৃত বিদ্যা—মৌলিক প্রতিভার ফল নহে। রামমোহনের এই রাজনীতিচর্চ্চা যদি তাহা নাও হয়, তবে ইহাও দেখিতে হইবে, পরবর্ত্তীগণের রাজনীতিচর্চ্চা সেই জাতীয় কি না। আজ যে জাতিসকল আকাশে উড়িবার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারা কি অতি প্রাচীন কবিগণের পুষ্পক রথ-কল্পনার নিকট ঋণী? ইহা কি বলা সঙ্গত হইবে যে, যেহেতু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিমান-বিদ্যার কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই হেতু আধুনিক বিমানচারীগণ তাঁহাদেরই শিষ্য? এ যুক্তিও যেমন, আধুনিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও তদ্‌সংক্রান্ত কীর্ত্তিপরম্পরা রামমোহনের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে বলাও তদ্রূপ। রামমোহনের রাষ্ট্রীয় চিন্তার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মুখ্যত এদেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করে নাই ; এবং সে আন্দোলন শেষে যে মন্ত্রে যে লক্ষ্যের পথে চলিয়াছে তাহা রামমোহনের কল্পনায় ছিল না। শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত ব্যবহারে যে নিরুপদ্রব পাটোয়ারী নীতির সমর্থন তিনি করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই এ দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যা কি আকার ধারণ করিবে, সে সম্বন্ধে ক্ষীণতম দূরদৃষ্টিও তাঁহার ছিল না। তথাপি যেহেতু এক ধরনের রাজনীতি চিন্তা তিনি করিয়াছিলেন, অমনি তিনি রাজনৈতিক দিব্যদ্রষ্টা হইয়া গেলেন!

যে সমস্যার সমাধানে কত মহা মহা চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর আজও কূল পাইতেছেন না—রামমোহন নাকি তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, এবং এজন্য রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তিনি এ জাতির আদি পথ-প্রদর্শক! কোনও মূল্য থাক বা না থাক—কাজে লাগুক বা নাই লাগুক, তিনি একটা যা-হয় চিন্তা করিয়াছিলেন, ইহাই যদি তাঁহার রাজনৈতিক গুরু হইবার কারণ হয়, তবে এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথ যে নূতন ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছেন, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের কেহ কেহ বহু পূর্ব্বেই তাহার মক্স করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারাই আধুনিক বাংলা কাব্য-সাধনার গুরু।

রামমোহনের আর একটি বড় কাজ—এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ ও সহায়তা। কথাটা সত্য বটে, কিন্তু এমন ভাবে ইহা ঘোষণা করা হইয়া থাকে, যেন রামমোহনই একা সমগ্র জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ অভিভাবকরূপে এই কার্য্য করিয়াছিলেন—যেন তাঁহার চেষ্টা ব্যতিরেকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইত না। সতীদাহ নিবারণের মত যেন এ কার্য্যেও তিনি বহু বাধা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া আত্মহিতবিমুখ সমাজকে এই মৃত-সঞ্জীবন ঔষধ পান করাইয়াছিলেন। যাঁহারা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, এ বিষয়ে রামমোহনের কৃতিত্ব আর কাহারও তুলনায় বেশি তো নহেই, বরং কম বলিলেও অন্যায় হইবে না। রাজা রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু প্রধানগণ এ বিষয়ে কম উদ্যোগী ছিলেন না। লর্ড আমহার্স্টকে একখানি পত্র লেখা ছাড়া, এ কর্ম্মে রামমোহনের কায়িক

বা আর্থিক কোনও প্রযত্নের প্রমাণ আমরা পাই না, অথচ সেকালের হিন্দুসমাজের অনেকে এতদপেক্ষা অনেক অধিক উদ্যম করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এমনও হইতে পারে যে, সেকালের হিন্দুসমাজ এ কার্য্যে রামমোহনের উৎসাহ সন্দেহের চক্ষে দেখিত বলিয়া রামমোহন বেশি কিছু করিতে পারেন নাই; সেই জন্যই হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা-কালে রামমোহন তাহার পরিচালক-সভায় সভ্য হইতেও সাহস করেন নাই। তখনকার হিন্দুসমাজ ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল না; তাহাদের আশঙ্কা ছিল, পাছে বিজাতীয় শিক্ষার ফলে সকলে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। এই জন্যই রামমোহনের মত ব্যক্তির উৎসাহ তাহারা ভাল মনে করিত না। কিন্তু ঘরের মানুষকে যাহারা এমন চক্ষে দেখিত, তাহারাই বিদেশী বন্ধু ডেভিড হেয়ারকে অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছিল। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে যেরূপ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় রামমোহন কি করিয়াছিলেন? নিজ সমাজের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ ছিল না বলিয়া তিনি স্বজাতির কোনও রূপ সাক্ষাৎ সেবা করিতে পারেন নাই,—সেবা করিবার মত ত্যাগী বা প্রেমিকও তিনি ছিলেন না। সকল কার্য্যেই কেবল লেখনী চালনা বা রাজপুরুষের সহায়তা যথেষ্ট নহে—ইংরেজী শিক্ষা-প্রচলন সতীদাহ-নিবারণের মত কেবল আইনের দ্বারাই সম্ভব ছিল না। ইহাতে যে দূরদর্শিতা বা জ্ঞানলাভস্পৃহার পরিচয় আছে, তাহার গৌরব সমগ্র বাঙালী জাতির প্রাপ্য—কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান সমাজ ইহা গ্রহণ করেন নাই—ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অতএব এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন যে রামমোহনেরই কীর্ত্তি এমন কথা বলিলে,

এ জাতির হিতৈষী বহু দেশীয় ও বিদেশীয় মহাত্মার প্রতি অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

রামমোহন সম্বন্ধে এইরূপ অর্দ্ধসত্য ও অত্যুক্তি চরমে উঠিয়াছে আর একটি কিম্বদন্তীর প্রচারে—রামমোহনই নাকি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা! ইহা কেবল অত্যুক্তি নয়, ইহা তথ্যঘটিত মিথ্যা। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ আরও কিম্বদন্তী আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস না থাকায়, এবং সাহিত্যবিশারদ মহাপণ্ডিতগণের সাহিত্যজ্ঞান অতিশয় পরিপক্ক হওয়ায়, এইরূপ কিম্বদন্তী শিক্ষিত সমাজেও নির্ব্বিঘ্নে টিঁকিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক অন্ধভক্তি মানুষকে কতখানি অভিভূত করিতে পারে—তা সে মানুষ যতই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হউক—তাহার প্রমাণও ইহার মধ্যে আছে। রামমোহন বাংলা গদ্যরীতিতে কয়েকখানি পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে সকল গ্রন্থের বিশেষ কোনও স্থান নাই, এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। রামমোহন যে গদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা বাংলা গদ্যের রীতি ও তাহার ক্রম-পরিণামের ধারার সহিত সম্পর্কহীন। কেরী ও মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম, প্রধানত এই চারিজন ব্যক্তির পরিশ্রম ও প্রতিভায় আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যিনি বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিবেন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন—কেমন করিয়া বাংলা গদ্যরীতি অতিশয় সরল রেখায় ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতির সূত্রটি কেমন করিয়া বিদ্যাসাগরের গদ্যে সঞ্চালিত হইয়াছে; এবং বিদ্যাসাগরের রচনারীতি কেমন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষার 'খেই' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই

রীতিবিকাশের ধারায় রামমোহনের গদ্য কুত্রাপি চিহ্নরূপেও বিদ্যমান নাই। মৃত্যুঞ্জয় উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই বাংলা গদ্যের চর্চ্চা করিতেছিলেন; কাল হিসাবেও তিনি রামমোহনের অগ্রবর্ত্তী। রামমোহনের বাংলা রচনা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' রচিত হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, এবং 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র তারিখ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় নানা গদ্যরীতির নমুনা আছে; তন্মধ্যে একটি রীতি বিদ্যাসাগরের অব্যবহিত-পূর্ব্ব বাংলা গদ্যের রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন, বাংলা গদ্যের প্রথম সুসম্পন্ন রূপ বিদ্যাসাগরের ভাষা। অতএব জিজ্ঞাস্য এই, বাংলা গদ্যরীতির গঠনে রামমোহনের স্থান কোথায়? আমি এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কারণ তথ্যের দিক দিয়া ইহা এতই অবিসংবাদিত যে, এ বিষয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নাই।

আরও প্রশ্ন এই—রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন কবে? যাঁহার মনে প্রাণে কোথায়ও সাহিত্যের অভিপ্রায় বা প্রেরণা ছিল না, তিনি সাহিত্য রচনা করিতে যাইবেন কেন? রামমোহন যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেগুলির বিষয়-বস্তু ও রচনা-ভঙ্গি—তাহাদের **content** ও **form**—যাহাকে সাহিত্য বলে, তাহার ত্রিসীমানার বাহিরে। তাঁহার সে উদ্দেশ্যও ছিল না। এই ভাষা তাঁহারই ভাষা হইয়া আছে—তাহা গত যুগের বাঙালী সাহিত্যিকগণের কোনও উপকারে লাগে নাই; তাঁহাদের কেহই সাহিত্যিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেগুলির বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, অন্তত তাহার কোনও প্রমাণ নাই। রামমোহনের গ্রন্থগুলি লোপ পাইলে গত যুগের বাংলার

ইতিহাস সংকলনে বিষয়বিশেষে ত্রুটি ঘটিতে পারে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনে কোনও বাধা ঘটিবে না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রামমোহনই সে যুগের প্রথম লেখক—যিনি বাংলা গদ্যকে গুরুতর বিষয়ের বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে, এত বড় প্রেরণা সত্ত্বেও রামমোহন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে শোচনীয়রূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিষয়ের গুরুত্বই ভাষা বা সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করে না ; যাঁহারা তাহা মনে করেন, তাঁহাদের সাহিত্যিক বোধশক্তি নিতান্তই অবজ্ঞার যোগ্য। সেকালের যে লেখক খেঁকশিয়ালীর গল্পও একটু ভাল করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন, তিনিও 'গোস্বামীর সহিত বিচার' অথবা 'বেদান্তসার' প্রভৃতির লেখকের সহিত তুলনায় সাহিত্যিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

এই কিম্বদন্তীর প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ এখানে না করিয়া পারিলাম না। সাম্প্রদায়িক মনোভাব অথবা ব্যক্তিগত অন্ধ শ্রদ্ধা যে আমাদের দেশে কত দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত —রামমোহনের এই সাহিত্যিক প্রতিভার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্কোচ অত্যুক্তি। রামমোহন তাঁহার পিতার ধর্ম্মগুরু, সেই কারণে 'রাজা' রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃতিসুলভ আভিজাত্যাভিমান যে তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিচারকপদে আসীন হইয়া সেই সাহিত্যের শিরোমণি রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিলেন কেমন করিয়া? পাঠকদের অবগতির জন্য আমি রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি তাঁহার এক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

জগতের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া যীশুখ্রীষ্টের সম্বন্ধে বোধ হয় মিশনারিগণ ইহার অধিক দাবি করেন না। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায়ই বাংলাদেশে গদ্য সাহিত্যের ভূমি পত্তন করিয়া দেন।...রামমোহন যেখানে ছিলেন সেখানে কিছুই প্রস্তুত ছিল না, গদ্য ছিল না, গদ্যবোধশক্তিও ছিল না। সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য কি উপহার প্রস্তুত করিতে-ছিলেন? বেদান্তসার ব্রহ্মসূত্র উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। ...কেবল পণ্ডিতের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করা রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জ্জন অত্যুচ্চ শিখর ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমগ্র মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলির কি অর্থ হয় দেখা যাক। 'রামমোহন রায় নব্য বঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা'—তাহা হইলে রামমোহনের পরে আরও সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা কি ব্রাহ্ম সমাজেরই পরবর্ত্তী নেতাগণ, না হিন্দু সমাজের নেতারাও সে গৌরবের অধিকারী? পৌত্তলিক কুসংস্কারপরায়ণ কোনও বাঙালী নব্যবঙ্গের নেতা নিশ্চয়ই নহেন। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র অথবা বিবেকানন্দ, রামমোহনের পর্য্যায়ে পড়েন না, তাঁহারা কেহই এই প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিমন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। অতএব এখানে নব্যবঙ্গ শব্দটির কোনও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে বলিয়াই মনে হয় এবং সে অর্থে রামমোহন নব্যবঙ্গের সৃষ্টিকর্ত্তাই বটে। তথাপি

"প্রথম স্থষ্টিকর্ত্তা" বাক্যটি কেমন একটু হেঁয়ালির মত শুনিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "সেখানে কিছুই প্রস্তুত ছিল না, গদ্য ছিল না, গদ্যবোধশক্তিও ছিল না।" কিন্তু আমরা জানি, রামমোহনের সমকালেই দাঁতভাঙা গদ্যের পাশেই প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ গদ্য ভাষা দেখা দিয়াছে—সে গদ্য রামমোহনী গদ্য অপেক্ষা জীবন্ত ও সরস। কিন্তু রামমোহন 'বেদান্তসার' প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, —তাহার এই অর্থ যে, বাংলা গদ্য রামমোহনের প্রতিভার কবচকুণ্ডলধারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু দেখা গেল যে, কবচকুণ্ডলের ভারে সে গদ্য খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া সহজভাবে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেছে না। ইহাতে বরং আরও প্রমাণ হয় যে, যে প্রতিভার বলে কোনও লেখক অতি দুর্ব্বল অপরিপুষ্ট ভাষাকেও যেন যাদুবলে সহসা বাল্য হইতে যৌবনে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, রামমোহনের পাণ্ডিত্য থাকিলেও সে প্রতিভা ছিল না। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিভার এমন যাদুশক্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমাদের সাহিত্যেই, গুপ্তকবির পর মাইকেল মধুস্থদন দত্তের মহাকাব্য—ভাষা ও ছন্দের অপ্রত্যাশিত সৌষ্ঠবে—প্রতিভার এই যাদুশক্তির নিদর্শন। মধুস্থদন দত্তের এই কাব্যখানি খাঁটি বাংলা ভাষা ও বাংলা কাব্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগেও বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; কিন্তু রামমোহন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে! রামমোহন যে সকল দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কি বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক হইয়া আছে? তাহা কি কোনও কালে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল? না, সেগুলি এযাবৎ কাল প্রত্নতাত্ত্বিকের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কোনও রূপে আত্মরক্ষা করিয়া আছে? রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

রামমোহন পাণ্ডিত্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য "জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা পরিবেশনে করিতে উদ্যত হইলেন।" এই সর্ব্বসাধারণ কাহারা? নিশ্চয় পণ্ডিতেরা নয়। তাহা হইলে বেদান্ত ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষৎ কি এত কাল পরে রামমোহনের সাহিত্যিক পাকপ্রণালীর গুণে এমনই সুস্বাদু ও সুপেয় হইল যে, সর্ব্বসাধারণ তাহা আকণ্ঠ পান করিতে লাগিল! রামমোহনের তপস্যার ফলে অপণ্ডিত জনসাধারণ বেদান্তবিদ্ হইয়া উঠিল? রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন—"খাস দরবার ও আম দরবার ব্যতীত সাহিত্যের রাজ-দরবার সরস্বতী মহারাণীর সমস্ত প্রজাসাধারণের উপযোগী হয় না। রামমোহন রায় আসিয়া সেই আম দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন।" দুঃখের বিষয়, প্রজাসাধারণের তো কথাই নাই—বাংলা সাহিত্যের জমিদারগণও কোনও পুরুষে সেই সিংহদ্বারের দিকে পদচালনা করেন নাই, এবং না করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। তথাপি রবীন্দ্রনাথ বলেন—"এইরূপে বাংলা দেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল"—and Rabindranath is an honourable man।

রামমোহন সম্বন্ধে প্রধান জনশ্রুতিগুলি আমি এক একে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম—তাহার কতটুকু সত্য তাহাও নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সকল হইতে রামমোহনের যে কৃতিত্ব উপলব্ধি করা যায় তাহা সংক্ষেপে এই যে, তিনি যে ক্ষেত্রে যেটুকু কাজই করিয়া থাকুন, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবে বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মনীষার একমাত্র গৌরব। রামমোহন সে যুগের বিশিষ্ট বাঙালীগণের অন্যতম। কিন্তু

রামমোহন ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্র, ইতিহাস-স্রষ্টা নহেন; তিনি যুগপ্রতিনিধি, যুগাবতার নহেন। যুগসন্ধি-সময়ের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহার মস্তিষ্কে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। মস্তিষ্ক বলিবার কারণ আছে; রামমোহনের জীবনে বা চরিত্রে নবযুগের আদর্শ প্রকাশ পায় নাই; ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন পূরা সেকালের বাঙালী। এই জন্য তাঁহার মতবাদের সঙ্গে তাঁহার জীবনকে মিলাইয়া দেখিলে আমরা একটি স্বতন্ত্র পুরুষের পরিচয় পাই। এইরূপ চরিত্র-নীতি মনোবিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়—মনীষা ও পাণ্ডিত্যের শক্তি এইরূপই হইয়া থাকে। আমি যদি অবৈধভাবে স্ত্রী গ্রহণ করি, অথবা মদ্যপান করি—তথাপি নিন্দুকের নিন্দা ক্ষান্ত করিবার জন্য শাস্ত্রবিধি ও যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা আমার আছে; নিজের নিকট কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই; বিরুদ্ধবাদীকে নিরস্ত করিতে পারিলেই হইল। আমি যদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনী হই, এমন কি নিজের পিতাকেও প্রবঞ্চনা করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকি, তাহাতে লজ্জিত বা অনুতপ্ত হইবার মত দুর্ব্বলতা আমার নাই—আইনের সাহায্যে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে না পারিলেই হইল। লোক-নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়াও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার শক্তি ও বুদ্ধি আমার আছে। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যত উপায় আছে, রামমোহন তাহার কোনটিতেই কম পারদর্শী ছিলেন না। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার নব প্রকাশিত 'জীবন চরিতের খসড়া'র একস্থানে মন্তব্য করিয়াছেন— "যেকালে রামমোহন বেদান্ত আলোচনা করিতেছেন, সেই কালেই তিনি একশত লাঠিয়াল লইয়া মফঃস্বলে আমবাগান ও ধানের জমী লুঠ করিতে চলিয়াছেন।" এক কথায় রামমোহন-চরিত্র আধুনিক আদর্শ-সম্মত নয়।

তিনি মহারাজা নন্দকুমারেরই নিকটবর্ত্তী ও সমধর্ম্মী, নন্দকুমার অপেক্ষাও তিনি বিচক্ষণ ও মেধাবী; কারণ নন্দকুমার পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে শোধন করিয়া লইয়া নিজের বিবেকবুদ্ধিকে আরও দৃঢ় করিতে পারেন নাই। এই যে রামমোহন, ইনি বাঙালী-চরিত্র ও বাঙালী-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি বটে, ইনি স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ; ইনি সেকালের বিমূঢ় সমাজের বহু উর্দ্ধে আপন মহিমায় বিরাজিত। সম্প্রতি রামমোহনকে চিনিবার পক্ষে একটি বড় উপায় হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহনের জীবন-বৃত্তের যে অংশ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা লুপ্তরত্নোদ্ধারের মতই একটি মূল্যবান কীর্ত্তি। মানুষটিকে না জানিলে কেবল তাঁহার মত-বাদের সাহায্যেই সে মানুষের শক্তি ও সাফল্যের ধারণা করা যায় না। এখন বুঝিতেছি, রামমোহন এত বড় পাণ্ডিত্য ও মনীষার অধিকারী হইয়াও জাতির জীবনে কেন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। জাতির জীবনকে প্রভাবিত করিতে হইলে নিজের জীবনের ভিতর দিয়া তাহার সহিত যোগযুক্ত হইতে হয়; রাম-মোহন নিজ জীবনে সে যোগরক্ষায় তৎপর হন নাই। তাঁহার সে হৃদয়ও ছিল না; তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, অতিশয় স্বতন্ত্র ও আত্মনিষ্ঠ। যুক্তির দ্বারা কোনও তত্ত্বকে ভাঙিবার বা গড়িবার শক্তি তাঁহার ছিল; কিন্তু জীবন তো কেবল তত্ত্ব নয়—তাহার রহস্য ভেদ করিতে হইলে—বিশেষত একটা জাতির জীবনকে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের নিয়তিসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেখিতে

হইলে, যে কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন তাঁহার তাহা ছিল না। তত্ত্বকে নিজ জীবনে তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতেও, তাঁহার যে লোকগুরু হইবার কামনা ছিল, এমন মনে হয় না। বৃথাই আমরা তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিতেছি।

রামমোহনের মৃত্যুর পর আজ এক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই কালের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবন নানা অবস্থার বশে, ও নানা ব্যক্তির সাধনার ফলে, একটা বিশেষ স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সমাজে রাষ্ট্রে ও নৈতিক জীবনে একটা অস্থিরতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কোনও একটা সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শে আমরা এখনও পৌছিতে পারি নাই। হয়তো অদূরভবিষ্যতে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সঙ্কট যে ভাবে নিবারণ হইবে, তাহা হইতেই একটা আদর্শ স্থির হইয়া যাইবে, সমাজ-জীবন সেই ভাবেই পুনর্গঠিত হইবে। তথাপি সে আদর্শ যে জাতীয়তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ অনুমান আজিকার দিনেও অসঙ্গত নয়। সমাজ যেমন আকারই ধারণ করুক, রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব যে ভাবেই পরিবর্ত্তিত হউক—জাতিকে তাহার স্বধর্ম্মের উপরেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এজন্য, কোনও বিশেষ ব্যক্তি-মন নয়—সমাজ-মন জাগ্রত হওয়া চাই; ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধি অথবা সার্ব্বভৌমিক যুক্তি-বাদও নয়—জাতির বিশিষ্ট ভাবপ্রকৃতিকে এ যুগের উপযোগী করিয়া উদ্বোধন করিতে হইবে। গত এক শত বৎসর ধরিয়া এ জাতির প্রজ্ঞা ও প্রতিভা সেই প্রয়োজনসাধনের প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছে; এ পর্য্যন্ত একের পর অন্যে যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের যিনি সেই গূঢ় চৈতন্যের মধ্যে যেটুকু প্রবেশ করিতে

পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। রামমোহনের কঠিন যুক্তিবাদের মর্ম্ম আমরা বুঝি, তাঁর জীবনের কথাও আজ আরও সুস্পষ্টরূপে জানিবার উপায় হইয়াছে—সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাম্প্রদায়িক স্বার্থহানির ভয়ে রামমোহনের জীবনের নবপ্রকাশিত তথ্যগুলি যাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন—সত্যের ভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারা অযথা কোপ প্রকাশ করিতেছেন—তাঁহাদের জন্য আমি দুঃখিত, তাঁহাদের হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু রামমোহনকে বুঝিবার জন্য তাঁহার সত্যকার জীবনকথা আমরা জানিতে চাই। ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয়ে যুক্তিসিদ্ধান্তের যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী আছে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এবং সুনিশ্চিত তথ্যের উপরে তাহা প্রয়োগ করিয়া, যদি কেহ রামমোহনের জীবনেতিহাস উদ্ধার করিতে পারেন এবং তাহা দ্বারা রামমোহনসংক্রান্ত একটা সমস্যার সমাধান হয়, তবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে এত চঞ্চল হইয়া উঠিবেন কেন? ইতিহাসভুক্ত কত কিম্বদন্তী নূতন তথ্যসন্ধান ও উৎকৃষ্টতর গবেষণার ফলে লোপ পাইতেছে—ইহাই অবশ্যম্ভাবী। রামমোহনের যে জীবনচরিত প্রচলিত আছে তাহা গ্রন্থসাহেবের মত পবিত্র নিশ্চয়ই নয়। যদি তাহাই হয়, তবে রামমোহনকে কেবল বিশ্বাসী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সাবধানে রক্ষা করাই সঙ্গত, জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া পূজা আদায়ের চেষ্টা কেন? যুক্তিবাদী রামমোহনকে এমন অযৌক্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা কি হাস্যজনক নহে? রামমোহনকে অন্ধ শ্রদ্ধা যাঁহারা করেন, তাঁহারা রামমোহনের প্রতিভার সম্মান কখনও করেন না—বোধ হয় তাঁহারা রামমোহনকে কখনও বুঝিতেও পারেন নাই।

রামমোহনের বাণী চিরদিন আমাদের দেশের যুক্তিবাদী পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। অসাম্প্রদায়িক শিক্ষিত বাঙালীও রামমোহনের যুক্তিবাদের গূঢ় মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী মহাশয় আমাদের কালের এইরূপ একজন ব্যক্তি। রামমোহনের বাণী তিনি যেরূপ শ্রদ্ধা ও পাণ্ডিত্য সহকারে আলোচনা করিয়াছেন, রামমোহনের তথাকথিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ—"বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী" যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, ঐ গ্রন্থে তিনি রামমোহনের মহত্ত্ব-প্রতিপাদনে কতখানি বিদ্যাবত্তা ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নামকরণে তিনি ভুল করিয়াছেন—বিবেকানন্দের প্রসঙ্গেও তিনি এক মুহূর্ত্তও রামমোহনকে ভুলিতে পারেন নাই। আজ আমি দেখিয়া বিস্মিত হই নাই যে, তিনিই ব্রজেন্দ্রবাবুর নবপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পড়িয়া রামমোহনের জীবনচরিতের নূতন খস্‌ড়া লিখিতে সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রামমোহনকে যিনি সাম্প্রদায়িক কারণে শ্রদ্ধা করেন না, একটা আন্তরিক সত্যের খাতিরে শ্রদ্ধা করেন—এ কাজ তাঁহারই উপযুক্ত। রামমোহনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সত্যকার জীবনচরিত আলোচনা করিতে ভয় পাইলে চলিবে না, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই জীবনচরিতের আলোকে রামমোহনের বাণী, বা বাণীর আলোকে জীবনচরিত—যে ভাবেই আলোচনা করি, এক্ষণে রামমোহনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার চরিত্র বা ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিতে হইবে। গিরিজাবাবুর নিকট হইতে সেই আলোচনা আমরা এখনও প্রত্যাশা করিতেছি। রামমোহনের জীবনকাহিনী এইরূপে

অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রামমোহন ধর্ম্মের জন্যই কোনও ধর্ম্মবিধির পক্ষপাতী ছিলেন না—প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই তাঁহার আদর্শ ছিল। সকল হৃদয়বৃত্তিই কুসংস্কারমূলক—পৌত্তলিকতা এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও বুদ্ধিমান্দ্যের আকর; সেই নীতিই উৎকৃষ্ট নীতি, যাহা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার অবাধ স্বাধীনতা দেয়, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক বন্ধন ও আধ্যাত্মিক আত্মনিগ্রহ হইতে মুক্তি দেয়; সমাজ বা ধর্ম্মের গণ্ডি হইতে বহির্গত হইয়া সার্ব্বভৌমিকতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিলেই মানুষের মনে আর কোনও বাধা থাকে না—একটা অতি উদার যুক্তি-বাদের আশ্বাসে, দেশ সমাজ ও স্বজনের প্রতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের কণ্টক-পীড়ন হইতে সে অব্যাহতি লাভ করে, আপনার জীবন আপনার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার অবকাশ পায়। রামমোহন তাঁহার জীবনে অতি অল্প বয়স হইতেই এই ব্যক্তি-ধর্ম্মের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন; প্রথমে নিজের পরিবারের সঙ্গে এবং পরে স্বজাতীয় সমাজের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার হইতে তাঁহার এই আদর্শ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। রামমোহন জীবনে কখনও কোনও ত্যাগ স্বীকার করেন নাই—ধর্ম্ম, দেশ বা সমাজের জন্য তিনি যতই চিন্তা করিয়া থাকুন, তজ্জন্য কোনও দিকে তাঁহাকে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। তিনি বুদ্ধিমানের মত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পান-ভোজন ও বিলাস-ব্যসনে তাঁহাকে কখনও অভাব ভোগ করিতে হয় নাই। এই যে রামমোহন—এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকামী, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত, শত্রুঞ্জয়, ভোগী, মেধাবী, আত্মোন্নতিসাধনে সিদ্ধপুরুষ—ইনি বিস্ময় উৎপাদন করিবার মত চরিত্র বটে। কিন্তু এ আদর্শ খুব বড় আদর্শ নয়। এইরূপ নীতিমার্গে বিচরণ

করিলে বুদ্ধিমানের বলবৃদ্ধি হইতে পারে, যে শক্তিমান তাহার জীবন জয়যুক্ত হইতে পারে; কিন্তু যেখানে দুর্ব্বলের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মিক স্বাস্থ্যলাভের উপায় করা প্রয়োজন, সেখানে এ আদর্শ অনুকরণ-যোগ্য নয়। কেহ কেহ রামমোহনকে একরূপ আধুনিকতা-ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া থাকেন—এক অর্থে ইহা সত্য। যে ব্যক্তি-ধর্ম্মের প্রাবল্য, যুক্তিবাদমূলক স্বার্থ-নীতি—এবং তাহারই সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের উদারতা, আজকাল এক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বাঙালী সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে—রামমোহনের ভক্ত শিষ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যে ধর্ম্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিতেছেন—তাহাই যদি এ জাতির সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম হয়, তবে রামমোহনই সেই আধুনিকতার গুরু। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই—এ জাতি এখনও যে পথে চলিতেছে, সে পথের অগ্রণীগণ যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাহা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নহে; রবীন্দ্রনাথও তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন। তাই মনে হয়, রামমোহনের দিন যেমন পূর্ব্বে কখনও আসে নাই, তেমনই আজিও তাহা অনাগত; ভারতের মহাজাতি এখনও রামমোহনের আদর্শ-অনুযায়ী আধুনিক হইতে পারে নাই; যদি কখনও পারে, তবে সেই দিন রামমোহন আধুনিক ভারতের জন্মদাতা বলিয়া পূজা পাইবেন; কিন্তু সে এখনও নহে।

মাঘ, ১৩৪০

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও বাংলার নবযুগ

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় আপনারা আমাকে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে আমি যেমন এক দিকে আমার প্রতি আপনাদের এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ, তেমনই আর এক দিকে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ কেশবচন্দ্রের মত একজন ধর্ম্মবীর মহাপুরুষের সম্বন্ধে আমার মত সাধনাহীন ব্যক্তির বলিবার কি-ই বা থাকিতে পারে? ধর্ম্ম-সাধন বা ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুশীলন আমি কখনও করি নাই। কেশব যে সাধনমন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ভক্তির উৎসাহকে অগ্নিহোত্রীর মত যাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—যাঁহারা কেবলমাত্র মত বা তত্ত্ব নহে, কেশবের জীবন-বেদের সেই অপৌরুষেয় আর্ষ দীপ্তিকে নিজ-জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমিই শিক্ষার্থী; কেশবের সেই নিগূঢ় ধর্ম্ম-তত্ত্বের সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই।

কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্রের জীবন আর এক দিক দিয়া আলোচনা করিবার যোগ্য। এই জাতির গত-যুগের ইতিহাসে যে সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল,—কেশবচন্দ্র তাহারই একটি স্ফুলিঙ্গ। জাতির সেই ইতিহাস বুঝিতে হইলে, কেশবচন্দ্রকেও বুঝিতে হইবে, স্মরণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির নিয়মে, সকল সমস্যাই মূলে একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কট-রূপেই দেখা দেয়, কেশবের মধ্যে ইহা বিশেষ করিয়া সেই আকারই ধারণ করিয়াছিল। যুগ ও জাতির প্রতিনিধিরূপে কেশব-জীবনের আদর্শ ও তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই আজ আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

এ যুগের ধর্ম্মান্দোলনের সঙ্গে যে সমস্যা বিশেষ করিয়া জড়িত ছিল, যাহার সমাধান একটা সজ্ঞান সুস্পষ্ট অভিপ্রায়রূপে সেই আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা মুখ্যত মোক্ষলাভ নয়—জাতির জীবনকে নূতন করিয়া একটা নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন-চিন্তাই তাহার মূল। সমাজরক্ষা বা লোকসংস্থিতির জন্য যে নীতি-মার্গ বা Law—তাহাই ছিল এ যুগের ধর্ম্মসমস্যা। এই ধর্ম্মকে নূতন করিয়া উদ্ধার করা—তাহাকে যুগোপযোগী রূপ দিয়া জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুগ-সঙ্কটে পরিত্রাণলাভের উপায় আবিষ্কার করাই—সেকালের বাঙালী মনীষিগণের একমাত্র ভাবনা ছিল। সকলের ধারণা এক ছিল না—আদর্শ পৃথক ছিল। কেশবচন্দ্র এই সমস্যার সমাধানে ভগবদ্‌ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা জাতির নৈতিক উন্নতিসাধনকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে ও কর্ম্মজীবনে এই অভিনব আদর্শের অনুপ্রেরণা আপাতদৃষ্টিতে বিজাতীয় ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলে, তাহার মধ্যে বাঙালীর ভাব-প্রকৃতি ও বাঙালী-প্রতিভারই এক নূতন অভিব্যক্তি দেখা যায়। সে যুগের সংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই বাঙালিয়ানাই আমাকে মুগ্ধ করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাঙালীর প্রতিভায় কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-নীতি একজন বাঙালীর হৃদয়ে কিরূপ সাড়া জাগায়, কেশবচন্দ্রের প্রতিভায় তাহারও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্র যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন—যুগের প্রভাব ও জাতির প্রতিভা দুই-ই তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া কেশবকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ধর্ম্ম-সাধন, এবং ধর্ম্ম-প্রচার এক নহে; উভয়ের প্রয়োজন স্বতন্ত্র। যে কারণে যে ধর্ম্ম প্রচারযোগ্য হয়, জগতের ইতিহাসে তাহার একাধিক বড় দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষেই সেইরূপ ধর্ম্ম ও তাহার প্রচার প্রথম প্রকটিত হয়। ধর্ম্ম যখন জাতি বা সমাজের কল্যাণকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের আধ্যাত্মিক সাধনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার সাধন-পন্থা 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' বলিয়া বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হয়, তখনই লোকস্থিতিমূলক ধর্ম্মের প্রণয়ন ও প্রচার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। শাক্যমুনি ঐতিহাসিক কালের প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহার ধর্ম্ম গুহ্য সাধনার ধর্ম্ম নয়—জ্ঞান-যুক্তিমূলক পুরুষকারের ধর্ম্ম। লোকধর্ম্মের আর এক আদর্শ আছে, প্রাচীন সেমীয় জাতির মধ্যেই তাহার সমধিক বিকাশ ঘটিয়াছিল। এ ধর্ম্মও সমাজশাসনমূলক, লোক-সংস্থিতিই ইহার মূলগত অভিপ্রায়। প্রাচীন ইহুদীয় ধর্ম্ম স্বজাতি বা গোষ্ঠীর জন্যই প্রণীত হইয়াছিল। রাজা বা পিতারূপে এক ঈশ্বরের ধারণা করিয়া প্রেরিতপুরুষগণ ঈশ্বরাদেশ প্রচার করিতেন; সেই আদেশপালনই ছিল সর্ব্বপ্রকার বিনাশ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এই একেশ্বরবাদ, রুক্ষ কঠিন শাসনবাদ হইতে ক্রমে ঈশ্বরবাদের ভক্তি-ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল, এবং স্বজাতি বা গোষ্ঠীর গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে গ্রহণ করিয়াছিল। এ দেশীয় প্রাচীন আর্য্যগণের সমাজেও এক ধরনের ব্রহ্মবাদ প্রচলিত ছিল; তাহাও কেবল আর্য্যগোষ্ঠীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য বিহিত হইয়াছিল, প্রচারযোগ্য ছিল না। কিন্তু এই অতি সহজ সরল—বায়ু ও আলোকের মত জীবনীয়—ব্রহ্মবাদ ভারতবর্ষের জল-মাটিতে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই,

অদ্বৈত-তত্ত্ব ও নানা তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি সেই আর্য্যধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মে রূপান্তরিত করিয়াছে। ব্রহ্মতন্ত্রের সহিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম মিলিত হইয়া নানা সম্প্রদায়ের—নানা তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের ছায়া সুদূরপ্রসারিত হইয়া, ধর্ম্মকে শেষ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন-সাধনেই বিশেষ করিয়া নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সমাজবিধি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সেকালের জনসমাজের কীদৃশ কল্যাণ কি ভাবে সাধন করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন—আজিকার আদর্শে তাহা নির্ণয় করাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই অধ্যাত্মসাধন ও সামাজিক হিতসাধনের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, এই বাংলা দেশেই, প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, যে নবধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতেও এ সমস্যার সম্যক মীমাংসা হয় নাই। নিয়ম-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মমূলক ভক্তিরসের প্লাবনে, জাতির প্রকৃতি আরও কোমল হইয়া পড়িয়াছিল, সমাজ আত্মস্থ না হইয়া কতকটা আত্মহারা হইয়াছিল। সমগ্র মুসলমান-অধিকারকালে, আত্মোন্নতি অপেক্ষা আত্মরক্ষার চেষ্টাই প্রবল হইতে দেখা যায়; সেকালে এই আত্মরক্ষার উপায় হইয়াছিল আত্মসঙ্কোচ। এই জন্যই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তি-ধর্ম্ম সামাজিক সংস্কার ও সংগঠন-কর্ম্মে দুঃসাহসী হইতে পারে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মের যে আর এক আদর্শ আছে, লোক-সংস্থিতিই যাহার মুখ্য অভিপ্রায়—যে ধর্ম্ম-নীতি ব্যবহারিক লোক-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহা আমাদের দেশে বহুদিন প্রচারিত

হয় নাই। আমরা ধর্ম্ম বলিতে ব্যক্তিগত মোক্ষসাধনার আদর্শই বুঝি; এই মোক্ষলাভের সাধনায় ব্যক্তির অধিকারভেদ মানি। প্রত্যেক জীবই কর্ম্ম অনুসারে অন্য হইতে স্বতন্ত্র, অতএব সাধন-মন্ত্র সকলের পক্ষে এক হইতে পারে না। মানুষমাত্রেই এক ধর্ম্ম-পরিবারভুক্ত বটে, কিন্তু তুল্যাধিকারসম্পন্ন নয়; একই গোষ্ঠীপতি ভগবানের সন্তান বলিয়া সকলেই একই সত্যের অধিকারী—এ ধারণা আমাদের নিকট নিতান্তই হাস্যকর। অধিকারভেদে একই সত্যের নানা রূপ—কোনটাই মিথ্যা নহে; মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিহিসাবে যাহার যতটুকু অধিকার তাহাই তাহার পরম সত্য। এই তত্ত্বের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম যতই গভীর হউক—এ আদর্শের মূলে যত গভীর সত্যই নিহিত থাক, ইহার ফলে যে সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সামাজিক নীতি-সত্যের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। যতদিন বাহিরের সঙ্গে সংঘাত গুরুতর হইয়া উঠে নাই—অহিন্দু সেমীয় সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ঘটে নাই, ততদিন এই বাস্তব-স্পর্দ্ধী অধ্যাত্ম-সাধনা কতকটা নির্ব্বিঘ্নেই চলিয়াছিল। কিন্তু পরে, বিধর্ম্মের প্রচণ্ড আঘাতে, বিজাতির প্রবলতর রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎপাতে, যখন এ জাতির দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল, তখন এই ধর্ম্ম বাহিরের জীবন ও সামাজিক নীতি-সত্যকে পাশ কাটাইয়া গুহ্য তান্ত্রিক সাধন-মার্গে আত্মগোপন করিল; যে ধর্ম্ম সমাজকে ধরিয়া রাখে তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া—আমরা জীবনে মিথ্যাচারী, এবং ধর্ম্মসাধনায় আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিলাম।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সকলেই জানেন। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই আমরা নিজেদের দুর্গতি সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হইয়া উঠিলাম—যে সঙ্কট সম্বন্ধে এতদিন আমাদের কোনও চৈতন্যই ছিল না,

তাহাই মর্ম্মান্তিক রূপে উপলব্ধি করিলাম। ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজ চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা সবচেয়ে বেশি করিয়া বুঝিলাম—আমাদের নৈতিক দীনতা, জাতীয় চরিত্রের শোচনীয় অবনতি, বৃহৎকে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রের প্রতি আসক্তির জন্য আত্মার জড়তা। ইংরেজী শিক্ষা রীতিমত আরম্ভ হইবারও পূর্ব্বে এ চেতনা বাঙালীকে অধিকার করিয়াছে, নিজেদের হীন অবস্থার জন্য লজ্জিত হইবার মত আত্মজ্ঞান তাহার হইয়াছে। পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদে, এবং নূতন বিদেশী শক্তির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, বাঙালী আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল—এই ভাবনাই তাহার সুপ্ত মনীষা জাগাইল। কারণ, বাঙালী চরিত্রবলে যতই হীন হউক, তাহার ভাবগ্রাহিতা-শক্তি অসাধারণ, যুগান্তরের ভাব-সত্যকে সে অবিলম্বে জ্ঞান-গোচর করিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেই বাঙালী বুঝিতে সুরু করিল, যুগ-প্রয়োজন কি। রাজা রামমোহন রায় বাঙালীর হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের যে অপর অর্থ আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের নিকটে উল্লেখ করিয়াছি, সেই অর্থে রামমোহন একটা ধর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে, জাতির মনোভূমি হইতে সকল অন্ধবিশ্বাস, এবং ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বপ্রকার তন্ত্রমন্ত্র বা অলৌকিক অনুভূতির চর্চ্চা দূর করিয়া, তিনি একটি যুক্তিসম্মত, নীতিমূলক ধর্ম্ম দেশবাসীর জন্য প্রণয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। রামমোহনের এই উদ্যম ও তাহার অন্তর্গত অভিপ্রায় আজিও কেহ বুঝিতে সক্ষম বা সম্মত হয় নাই। রামমোহন যে একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, পারলৌকিক কল্যাণচিন্তাই তাহার মুখ্য কারণ নয়; সাধু-সন্ত বা ভক্তভাগবতগণ যে শ্রেণীর ধার্ম্মিক, রামমোহন নিজে সেরূপ

ধার্ম্মিক ছিলেন না। রামমোহনের প্রতিভার প্রধান কৃতিত্বই এই যে, তিনি রাষ্ট্রে সমাজে ও শিক্ষায় একটা নূতন যুগোপযোগী আদর্শের সন্ধান করিয়াছিলেন—ভগবৎ-লাভের উৎকৃষ্টতর পন্থানির্দ্দেশ, নূতন করিয়া মোক্ষশাস্ত্র রচনা, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না; বলহীনকে পার্থিব জীবনে শক্তিমান করিয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মধ্যযুগের ধার্ম্মিকতার আদর্শকেই সংস্কার করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি চান নাই; জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, জাতিহিসাবে রাষ্ট্রে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে, প্রত্যক্ষকে স্বীকার কর, এবং তজ্জন্য সহজ মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির আরাধনা কর—ইহাই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম; পৌত্তলিক ধর্ম্মের ভাবসাধনায় যে বক্রকুটিল গহন-গূঢ় আরণ্য পথ মানুষকে সহজ সত্য ও সামাজিক শক্তিসাধনা হইতে দূরে লইয়া যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করে, তাহাকে বর্জ্জন কর। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অতি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ "বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী"র এক স্থানে রামমোহন-সম্পর্কিত আলোচনায় রামমোহনের একখানি ইংরেজী পত্রের যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অতিশয় অর্থপূর্ণ; আমিও এখানে তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। সে কয় ছত্র এইরূপ—

> I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest....It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.

উক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে রামমোহনের গ্রন্থ হইতে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত—

> Genuine Christianity is more conducive to the moral, social and political progress of a people than any other human creed.

এ সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রামমোহন কেন ধর্ম্মসংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান সাহিত্য ও খ্রীষ্টান চরিত্র এবং খ্রীষ্টান রাজশক্তির প্রভাব একালে বাঙালীর মনকে হঠাৎ একটা বড় ধাক্কা দিয়াছিল—তুলনায় নিজেদের হীনতাবোধ বড় বেশি করিয়া বাজিয়াছিল। বাঙালী নূতন করিয়া মানুষ হইতে চাহিল; এবং এক যুগের নিশান্তকালে, অরুণোদয়-প্রতীক্ষায়, পশ্চিমকেই পূর্ব্বদিক্‌প্রান্ত বলিয়া তাহার দিঙ্‌মোহ হইয়াছিল। তথাপি রামমোহন একটা ধর্ম্মমত সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র—ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন না; তিনি কোনও পৃথক সমাজস্থাপনের চেষ্টাও করেন নাই। রামমোহন চিন্তা করিয়াছিলেন, তর্ক করিয়াছিলেন, লেখালেখি করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, কোনও ভক্তি-বিশ্বাসের আবেগ তাঁহার ছিল না—তাঁহার ধর্ম্মও আবেগের ধর্ম্ম ছিল না। তাই তিনি নবযুগের একটা আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র, জাতির জীবনে বা তাহার হৃদয়ে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। রামমোহন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন—অপক্ষপাত সহকারে তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে তাঁহার যে ব্যক্তিস্বরূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, তিনি ভক্তমণ্ডলীর অনুকরণীয় আদর্শরূপে নিজ জীবন যাপন করেন নাই। সেখানেও, তিনি বুদ্ধিমান ও শক্তিমান

পুরুষের মত অটল অবিচলিতভাবে নিজের মনের মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দেখিতে পাই। এই বীরমূর্ত্তি কোন সাধু, দরবেশ বা ভক্ত সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি নহে। রামমোহনের যে অসাধারণ মনস্বিতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, তাহাও, নব্যন্যায়ের স্রষ্টা বাঙালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। এই যে রামমোহন, ইঁহার পরিচয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-কোলাহলে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। রামমোহন বাঙালীর বরণীয় বটেন, কিন্তু কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠার জন্য নয়—রামমোহনই এ যুগে সর্ব্বপ্রথম জাতির জড়বুদ্ধিকে সবলে আঘাত করিয়াছিলেন, স্বাধীন জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষেত্রে জনমনকে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, ইহাও সত্য। তাঁহার বাণীকে এ জাতি জীবনের মধ্যে পায় নাই। আজ রামমোহনকে লইয়া আমরা যে গৌরব করিতেছি, তাঁহার স্মৃতিপূজার যে সাড়ম্বর আয়োজনে মাতিয়াছি, তাহার আরও সঙ্গত কারণ থাকিলে ভাল হইত। তাঁহার জীবন বা তাঁহার আদর্শ কোথাও সাক্ষাৎ ভাবে জাতিকে প্রভাবিত করে নাই, শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে আমাদের হৃদয়ের বলবৃদ্ধি করে নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রামমোহনের নামে যে নূতন ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মন্ত্রও ঠিক রামমোহনের মন্ত্র নয়; সে সমাজ এক অভিজাত জ্ঞানী-সম্প্রদায়রূপে অচল হইয়া রহিল। কিন্তু নবযুগ বসিয়া ছিল না, বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার হলকর্ষণ বন্ধ হয় নাই; বরং আরও গভীরভাবে সেই খনন-কার্য্য চলিতে লাগিল। ইহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেশবচন্দ্র সেন নামে আর এক বাঙালীর অভ্যুদয় হইল। কেশবের ধর্ম্ম-জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ এ যুগের পক্ষে আকস্মিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেশবচন্দ্রের

মধ্যে বাঙালী-প্রতিভার আর এক দিক নবযুগের সমস্যায় সাড়া দিয়াছিল। কেশব যুক্তিবাদী নহেন, ভক্তিবাদী ;—কেশব যে শক্তিবলে যুগ-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে চাহিলেন, সে শক্তি আত্মিক বিশ্বাসের শক্তি, তাই কেশব রামমোহনের মত নীতিবাদী নহেন—নীতিধর্ম্মী ; তিনি ধর্ম্ম-প্রণেতা নহেন—ধর্ম্ম-প্রচারক। তথাপি কেশব ও রামমোহনের লক্ষ্য এক—জাতির নৈতিক জীবনের সংস্কার-সাধন। রামমোহন যাহা বুদ্ধির সাহায্যে করাইতে চাহিয়াছিলেন, কেশব তাহাই করাইতে চাহিয়াছিলেন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বলে। রামমোহন খ্রীষ্টান ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও, এবং সেমীয় একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য-সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—বেদান্ত উপনিষদের দোহাই না দিয়া পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার 'ভাবের ঘরে চুরি' ছিল ; তিনি ভিতরে যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাহিরে তাহা খোলা-খুলি স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না। এই আভিজাত্যাভিমানের বশেই—নিজধর্ম্মের পরিবর্ত্তে তিনি যে পরধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব স্বীকার না করিয়া, তিনি অতি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেশব এই আবরণটি উড়াইয়া দিলেন, নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অকপটে স্বীকার করিলেন। কেশব বিদ্রোহী নব্যবঙ্গের এক অভিনব মূর্ত্তি। কেশবের ধর্ম্ম-প্রতিভা ছিল, তাঁহার সমস্ত হৃদয়মন ভক্তির ভাবাবেশে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত—সে সময়ে তাঁহার মুখে দিব্যপ্রভা ও কণ্ঠে দিব্যভারতীর উদয় হইত। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ যেমন রামমোহনের প্রতিভাকে স্ফুরিত করিয়াছিল, পাশ্চাত্য ধর্ম্মও তেমনই কেশবকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। এই দুই অগ্নি-পরীক্ষাই বাঙালীকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে ; কেশবের প্রতিভা খাঁটি বাঙালীর প্রতিভা,

কেশবের জয় ও পরাজয় সে যুগের বাঙালীর ইতিহাসে এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

কেশবের প্রতিভায় তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—(১) তাঁহার অভারতীয় ধর্ম্মপ্রেরণা; (২) ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধি স্বীকার করিলেও কার্য্যত তিনি ভক্তিযোগী মিষ্টিক; (৩) কঠিন মত-নিষ্ঠা অপেক্ষা উদার ভাবগ্রাহিতা। এই তিনটি লক্ষণে আমরা তাঁহার সাধন-জীবনের যুগোপযোগিতা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কেশবের ধর্ম্মজীবনে আমরা পর-ধর্ম্মের প্রেরণা দেখিতে পাই। ইহুদীয় ধর্ম্মপ্রবক্তাগণ—ব্যাপ্‌টিস্ট জন (John the Baptist), সেণ্ট পল, ও যীশু—যে একজন ঈশ্বরপিপাসু হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মগুরু হইলেন, কেশবের ধর্ম্মজীবনে ইহা কি কেবল একটা দৈব ঘটনা? ইহার মূলে কি বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং যুগপ্রভাব ও যুগ-সমস্যার একটা ইঙ্গিত ছিল না? ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রভাব ইহার মূলে ছিল, সন্দেহ নাই—কিন্তু বাঙালীর ভাব-প্রকৃতি ইহার জন্য সমধিক দায়ী। সে যুগের ধর্ম্মহীন নীতিহীন সমাজের পরিণাম-চিন্তা কেশবকে যে ভাবে ব্যাকুল করিয়াছিল, তেমন আর কোনও ভাবুক বাঙালীকে করে নাই। অতিশয় স্পর্শকাতর চিত্ত ও অতিশয় কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ে যদি আধ্যাত্মিক সঙ্কট উপস্থিত হয়, যদি তাহার সঙ্গে আন্তরিকতা, আত্মপ্রত্যয় ও চরিত্রবল থাকে, তবে সে যুগের পক্ষে যেরূপ ধর্ম্মপ্রেরণা স্বাভাবিক, কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহারই বিকাশ হইয়াছিল। যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনীতির প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কেশবচন্দ্রকেও সেই ধর্ম্মনীতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহা হইতে সে যুগের বাঙালীর প্রতিভা কোন্ প্রধান সমস্যার সমাধান-চিন্তায়

উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র নয়, ইংরেজী সাহিত্যও নয়, ইংরেজের যে চরিত্রবল—বিজেতা জাতির যে পৌরুষময় প্রাণের স্ফূর্ত্তি সেকালে সমগ্র ভারতবাসীকে মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল—যাহার প্রভাবে ইংরেজ শুধুই রাজ্যজয় করে নাই, বহু শতাব্দীর অনাচারকলুষিত নৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল—সে যুগের বাঙালী মনীষী ও বাঙালী ভাবুক তাহাকেই বরণ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, জাতির জীবনে নব আদর্শরূপে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কেশব এদেশে ইংরেজ-অধিকারের ইতিহাস জানিতেন; তাহার কারণও যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনই তাহার সুফললাভের আশাও করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক বলিয়াই, ইহার মূলে মঙ্গলময় বিধাতার শুভ অভিপ্রায় আছে। যে ধর্ম্মনীতির প্রেরণায় ইংরেজ জাতি বড় হইয়াছে—ইংরেজের দৃষ্টান্তে ও সাহচর্য্যে তাহারই সারতত্ত্ব আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরিত্রাণ আশু ও সহজ হইবে। ইংরেজের ভারত-বিজয়ের ফলে জাতির একটা মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে—এমন ধারণা সেকালে সকল শিক্ষিত বাঙালীর ছিল, বাঙালী একটা বড় আশা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও এ আশা করিতেন। ইংরেজের প্রতি এই শ্রদ্ধা, বিজাতির প্রতি এই মনোভাব—ভাবনা ও কল্পনাশক্তির ফলে বাঙালীই সর্ব্বাগ্রে পোষণ করিয়াছিল; ইহারই ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালীই আধুনিক ভারতে যুগান্তর আনিয়াছে। কেশবের মধ্যে সেই বাঙালিয়ানারই বিকাশ হইয়াছিল ধর্ম্ম-প্রেরণার দিক দিয়া।

কেশবের ধর্ম্ম-প্রেরণার মূলে ছিল পাপ-বোধ। অতি অল্প বয়সেই

জাতির বহুকালসঞ্চিত পাপের পরিণাম-চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি প্রকৃতিতে বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে পাপ ও পাপমুক্তির তত্ত্ব গ্রাহ্য হইলেও, সে ধর্ম্মের সাধনায় আর সে সরলতা ছিল না, জটিল রসতত্ত্ব ও নানা তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কেশব বুঝিয়াছিলেন, মানুষকে মানুষহিসাবেই উন্নত হইতে হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যক্তি-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, সহজ স্বাভাবিক মানবীয় চেতনাকে অতিক্রম করিলে চলিবে না। সে সম্বন্ধ আপামরসাধারণের পক্ষে একই ভাবে ও একই কারণে সহজ হওয়া চাই। এই সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়—জ্ঞান নয়, ধ্যান নয়, গুরুদীক্ষাও নয়—প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই গুরু—ভগবান ও মানুষের মধ্যে সহজ যোগস্থাপনের একমাত্র সেতু। এই প্রার্থনার উপযোগী চিত্তের অবস্থা—পাপ-বোধ, দুর্ব্বল অসহায় মানুষের ভয়-ব্যাকুলতা। চিত্তের এই অবস্থা ও এই প্রার্থনা-তত্ত্ব কেশবের জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়াছিল, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনকে খ্রীষ্টীয় সাধন-পদ্ধতির অনুকূল করিয়াছিল। কেশবের নীতি-নিষ্ঠায় ভক্তের আত্মসমর্পণ ছিল, যুক্তিবাদীর অহঙ্কার ছিল না। প্রথম হইতেই এই নৈতিক চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাই খ্রীষ্টীয় সাধুর উক্তি—"Repent ye, for the Kingdom of Heaven is at hand"—তাঁহাকে এমন গভীর ভাবে বিচলিত করিয়াছিল।

কেশব রামমোহন-পন্থী ছিলেন না—ইহার পরেও তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কেশব সজ্ঞানে ভক্তি-সাধনা করিতেন বটে—প্রচারক কেশব তাঁহার নব ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিত্তিমূলে সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসাকে স্থান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে তিনি বিশ্বাসকেই

সর্ব্বোচ্চ পীঠমণ্ডপে আসন দিয়াছিলেন; তিনি সকল জিজ্ঞাসার উত্তর চাহিতেন ভাগবতী প্রেরণার সমীপে। বাঙালীর সন্তান, উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগে—নূতনতর জাতীয় সমস্যার সঙ্কটে, এবং এক অভিনব শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়ায়—যে নূতনতর ভক্তের বেশে আবির্ভূত হইতে পারে, কেশব ছিলেন তাহাই; নদীয়ার জলমাটিতে জুডিয়ার ধর্ম্মবীজ যে ফুল ফুটাইতে পারে, কেশবের ধর্ম্মজীবন সেই ফুল। কিন্তু নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অবিমিশ্র ভক্তিকেও মিশ্ররূপ ধারণ করিতে হয়; কেশবের জীবনে সে দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি সেই দ্বন্দ্বকে জ্ঞানত অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু যিনি তাঁহার সমগ্র চরিত আলোচনা করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন, সে যুগের ধর্ম্মান্দোলনের পূর্ব্বোত্তর ধারায় ইহাই কেশব-জীবনের বিশেষত্ব। এই জন্যই সে যুগের সংস্কারপন্থীদের মধ্যে একমাত্র কেশবের প্রতিভাকেই সত্যকার ধর্ম্ম-প্রতিভা বলা যাইতে পারে। কারণ, ধর্ম্ম কেবল নীতির শাসন নয়; অথবা ঈশ্বর নামক কোনও কল্পিত সত্তাকে যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরে নিজের বিবেক নামক অহংকারের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করার পন্থাও নয়। ইহারই বিরুদ্ধে কেশব তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাসকে ভক্তিরসধারায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বন্দ্ব ছিল; না থাকিলে তাঁহার জীবন এমন কর্ম্মময় হইত না; বুঝি বা, তিনি নব ধর্ম্মনির্ম্মাণে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হইতেন না। এই ভক্তি যেমন তাঁহাকে নিজ ধর্ম্মজীবনে জয়ী করিয়াছিল, তেমনই ধর্ম্মপ্রচারের স্ববিরোধী অধ্যবসায়ে তাঁহাকে ক্লান্ত শ্রান্ত ও বিফলমনোরথ করিয়াছে। কেশব জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় চাহিয়াছিলেন; প্রকৃতি জ্ঞানপ্রধান না

হইলে এমন সমন্বয় হয় না। কেশবের প্রকৃতি ছিল ভক্তিপ্রধান, তাই এইরূপ সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন হইলেও, তিনি তাহা সাধন করিতে পারেন নাই। বড় ভক্ত বড় বীরও বটেন; কেশবও বীর ছিলেন—তিনি ছিলেন উৎসাহ ও কর্ম্মবীর্য্যের অবতার। কিন্তু ধর্ম্মকে যে রূপে ও উপায়ে তিনি বহিঃসংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার জন্য অন্যবিধ প্রতিভার প্রয়োজন। যে আসলে বৈষ্ণব—তাহার শাক্ত অভিমান চলে না; কিন্তু যে শাক্ত তাহার পক্ষে বৈষ্ণব-রীতি দুরূহ নয়। কেশব যে জ্ঞানী শাক্ত ছিলেন না, আমি তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ভক্তিই ছিল তাঁহার প্রধান সম্বল, তাই দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই। 'Am I an Inspired Prophet ?'—নামক সুবিখ্যাত বক্তৃতায় এই অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট আভাস আছে। তিনি বলিতেছেন—

> Pantheism and mysticism are things of Asia, while positivism and all the sciences of the day belong to Europe. My Church is an Asiatic Church. I am in my very bones and blood, in the very constitution of my soul, essentially an Asiatic. As an Asiatic, I would encourage and vindicate devotion to the extent of mystic communion. But here you will probably say there is no harmonious development. It is all prayer and contemplation, and no work. I say there is harmony. If I am mystical, am I not practical too? I am practical as an Englishman. If I am Asiatic in devotion, I am a European in practical energy. My creed is not dreamy sentimentalism, not quietism, not imagination. Energy,

yes, energy—I have that in a great measure in my character and in my church.

কেশবের চরিত্রে এই শিশুর মত সারল্য ও আত্মপ্রত্যয় বড়ই উপভোগ্য। "Am I not practical too?"—সেদিন কেশবের এই উক্তি তাঁহার শ্রোতৃবর্গ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না; কিন্তু এতদিন পরে আজ আমরা দূর কণ্ঠের এই আকুল প্রশ্ন শুনিয়া বেদনা অনুভব করি। কেশব নিজের সম্বন্ধে যে কর্ম্মবীর্য্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা খুবই সত্য,—যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ও নৈতিক উৎসাহ তাঁহার কর্ম্মজীবনে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতেই তিনি আমাদের দেশের নবযুগকে একটি বিশেষ দিক দিয়া অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি 'মিষ্টিক'—উনবিংশ শতাব্দীতেও খ্রীষ্ট ও চৈতন্যের বংশধর। ইহাই তাঁহার আত্মার স্বধর্ম্ম; তিনি যদি নিজ জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তবে কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই; জাতির পরিত্রাণের জন্য যুগোচিত ধর্ম্মচিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল; ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব, এই জন্যই তিনি সে যুগের একজন স্মরণীয় পুরুষ। বর্ত্তমান যুগ ক্রমশই গণতন্ত্রের দিকে চলিয়াছে। একেশ্বরবাদ একদিন মানুষের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ঈশ্বরাদেশের কঠিন শাসন। ভক্ত কেশব এই শাসনকে স্বাধীন আত্মার সানন্দ স্বীকৃতির সহিত যুক্ত করিয়া লইলেও তিনি মানুষকে বড় করেন নাই, বরং সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে, মিষ্টিক যোগীর মত, আত্মলব্ধ ঈশ্বরাদেশকেই শিরোধার্য্য করিয়াছেন। ইহাই চিরযুগের ভক্ত সাধকগণের চরিত্র-নীতি। কিন্তু এ যুগের সাধনায় এই মধ্যযুগীয়

ধর্ম্মনীতি কতদূর সাফল্যলাভ করিতে পারে, কেশবের আজন্ম সাধনার পরিণাম লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের যে তৃতীয় লক্ষণটির কথা বলিয়াছি, তাহা এই যে, ধর্ম্মবিষয়ে কেশব মতবাদী না হইয়া ভাবগ্রাহী ছিলেন—নিজ হৃদয়ের বিকাশকামনায় তিনি সর্ব্বমত ও সর্ব্বতন্ত্র হইতে সুপথ্য সংগ্রহ করিতেন; ভাবুক ভাবপ্রবণ কেশব ধর্ম্মপ্রেরণার ক্ষেত্রে একরূপ কবি ছিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে নিরন্তর একটি ভাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহাতে তিনি কখনও কোথায়ও সাধনজীবনে স্থাণু হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার 'জীবন-বেদ' নামক গ্রন্থের এক প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

> হে আত্মন্! ধর্ম্মজীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়, অগ্নিমন্ত্রে। আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নিমন্ত্র কি? শীতলতা বুঝিতে হইলে উত্তাপ বুঝিতে হয়।
>
> কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। একদলের কাছে সেবা করিলাম, আর একটি দল কবে হইবে; দশটি দল প্রস্তুত করিলাম, আর দশটি দল কবে প্রস্তুত করিব; কতকগুলি লোকের সহিত আলাপ করিলাম, আর কতকগুলি লোকের সঙ্গে কিসে আলাপ করিতে পারিব; কতকগুলি শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া সত্য সংগ্রহ করিলাম, পাছে সেই সত্যগুলি লইয়া থাকিলে সেগুলি পুরাতন হইয়া পড়ে, এই জন্য অপর কতকগুলি পড়িয়া সত্য সংগ্রহ করিব, কেবল এই চেষ্টাই ছিল। ইহাই উত্তাপের অবস্থা।

এই যে উত্তাপের অবস্থা, ইহাই কেশব-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানবুভুক্ষা ও ভক্তিরসের নিয়ত উচ্ছ্বাস, একই জীবনে এই দুইয়ের

অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব—ইহাই নবযুগের বাঙালীর নবসৃষ্টি-কামনার অবস্থা ; ইহাই এ জাতির প্রতিভার নিদান। ইহা আর্য্যও নয়, সেমিটিকও নয়, ইহা বাঙালীর শোণিত ও বাংলার জলমাটির বিশিষ্ট গুণ। ইহারই বলে আমরা নবযুগের নূতন কাল্‌চার সৃষ্টি করিয়াছি—রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্যে, বিষম আদর্শের মিলন ঘটাইয়া, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছি। কেশবচন্দ্রে সেই সংস্কৃতিশীলতার এক অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষিত হয়। ভাবুকতাপ্রবণ বাঙালীর নিকটে কোনও ভাব-সত্যই বর্জ্জনীয় নহে। বাঙালীর নবজাগ্রত উচ্ছৃঙ্খল আবেগ কেশবের সত্যপিপাসা ও বলিষ্ঠ ধর্ম্মচেতনায় সংহত ও সংযত হইয়া জাতীয় জাগরণের একটা দিক নির্ণয় করিয়া দিল। আমার মনে হয়, কেশব-চরিত্রের এই দিকটি বাঙালী জাতির নবজাগৃতির ইতিহাসে বিশেষ করিয়া অনুধাবনযোগ্য।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি উপসংহারে আরও কয়েকটি কথা বলিব। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী আর কোনও চিন্তা করে নাই—নূতন যুগের নূতন অবস্থার সঙ্গে, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সামঞ্জস্য সাধনই, তাহার সকল কর্ম্ম-চিন্তা, সকল ভাবুকতার মূলে ছিল। জাতির অধঃপতনও যেমন গভীর, পরিত্রাণের আদর্শও তেমন উচ্চ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রামমোহনের মনীষা সেই সমস্যাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ইহাই রামমোহনের কৃতিত্ব। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির জড়তা প্রদর্শন, যুক্তি-বিচারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ছাড়া তিনি অধিক কিছু করিতে পারেন নাই। কেবল যুক্তিবিচারসিদ্ধ মতবাদের দ্বারাই একটা জাতির হৃদয় বা চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না—চাই প্রেম, চাই তপস্যা ; জীবনে

তাহারই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই আলোক মানুষের প্রাণে ও মনে বিকীর্ণ করা। কেশব দ্বিতীয় যুগের যুগন্ধর; তিনি নবজীবন সৃষ্টির কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন—তিনি সে যুগের প্রথম প্রেমিক। কিন্তু কেশবের প্রেমও জাতীয় জীবন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতির সিদ্ধিলাভ করিল না। ধর্ম্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্রের মন্ত্র জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কেশব নিজেও শেষে সকল বিধি, সকল বিধান উত্তীর্ণ হইয়া, নিজের প্রচার-ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রচারেরও বহু ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, জাতীয় জীবনযজ্ঞে প্রথম অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন কেশব। তাঁহার প্রচার-কর্ম্মের অপূর্ব্ব উন্মাদনা, নূতন ভাবচিন্তাকে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে রূপ দিবার আশ্চর্য্য সৃজনীশক্তি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব—কেশববিরোধী সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে; তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি কত কর্ম্মীকে পথ দেখাইয়াছে। সে যুগের যে বাঙালী কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমার মনে হয় তিনিও কেশবীয় ভাবের ভাবুক। "এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান"—এই মহাবাক্য প্রচারকল্পে, যিনি নূতন করিয়া, বাঙালীর জন্য মহাকাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সেই কবি নবীনচন্দ্রও কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয়, কেশবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে যে আর এক মহাপুরুষ এই জাতির জীবন-যজ্ঞে শেষ আহুতি দিয়াছিলেন, সেই বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও, তাঁহার প্রচারপ্রণালী ও কর্ম্মপদ্ধতিতে কেশবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা কেশব তাঁহার 'জীবন-বেদে' উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবের সেই উৎসাহ, কর্ম্মোন্মাদনার সেই উত্তাপ বিবেকানন্দের জীবনেও অপরিমিত।

বিবেকানন্দ কেশবের পরবর্ত্তী হইলেও অনুবর্ত্তী নহেন, তাঁহার গুরুমন্ত্র ও তাঁহার বাণী স্বতন্ত্র; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের আদর্শে কেশবের ছায়া কতকটা সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে।

ফাল্গুন, ১৩৪০

[ঢাকা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে কেশব-স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

প্রথম প্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণ

১

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানবত্বের কথা—তাঁহার মানব-প্রেমের কথা ভাবিতেছিলাম। এই প্রেম জগতে অনেকবার শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু এবার তাহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। বুদ্ধ জগতের প্রথম প্রেমিক; জীবদুঃখে কাতর হইয়া তিনি এই দুঃখের নিদান ও তাহার আত্যন্তিক উচ্ছেদের যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই জন্ম-জরা-মৃত্যুর সংসারকে অসার বুঝিয়া আত্মারও উচ্ছেদসাধন পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; তাঁহার মতে সৃষ্টি শুধু যে 'মিথ্যাভূতা' তাহা নয়, তাহা 'সনাতনী'ও নয়—দ্বৈত অদ্বৈতের কোনটাই তত্ত্ব নয়; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য সকল সংস্কারের নির্ব্বাণ-সাধনাই একমাত্র পন্থা। বুদ্ধ যত বড় প্রেমিক, তত বড় সন্ন্যাসী। এই বাণী মানুষের অহঙ্কার-নাশে সহায়তা করিয়াছিল, এবং ইহারই প্রেরণায় জীবনের মহত্তর আদর্শ, মনুষ্যত্বের বৃহত্তর আশ্বাস, একদা ভারতীয় সমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু আত্মা মরে নাই, বরং এই উন্মাদনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে আত্মা ও অনাত্মার দেহতত্ত্বকে আরও কঠিনভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অনাত্মার উপরে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর ভারতের বাহিরে জগতের দ্বিতীয় প্রেমিক খ্রীষ্ট, এবং ভারতের ভিতরে কোনও মহাপুরুষ, ভাগবত প্রেম-ধর্ম্মের

মহিমা ঘোষণা করিলেন। শঙ্করের অদ্বৈত-আত্মতত্ত্বের আস্তিকতা বৌদ্ধ শূন্যবাদ নিরসন করিলেও, মানুষের প্রাণ সেই উত্তুঙ্গ তুষারশিখর-বিচ্ছুরিত শীতল জ্যোতির আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারে নাই। এই ভাগবত ধর্ম্মেরই নানা মন্ত্র মানুষের দুঃখনিবৃত্তির সাধনোপায় হইয়াছিল। তথাপি এক দিকে জ্ঞান ও অপর দিকে প্রেম, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব চিরকাল মানুষের অধ্যাত্মচেতনায় জাগিয়া রহিল। মাত্র একবার ভারতীয় হিন্দু-প্রতিভার উৎকৃষ্ট-নিদর্শন-স্বরূপ গীতোক্ত কর্ম্মসন্ন্যাসবাদে এই দ্বন্দ্ব সমাধানের এক অপূর্ব্ব পন্থা উঁকি দিয়াছিল—বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মনীতির এক নূতন অর্থবাদ হইতেই এই কর্ম্মসন্ন্যাস-মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু তথাপি সমস্যার মূল যেন দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গেল। খ্রীষ্টের ভক্তি-ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের জ্ঞানভক্তিবাদ—দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত—কিছুতেই মানুষের মনুষ্যত্ব-বোধ পরিতৃপ্ত হয় নাই; যুগবিশেষের যুগধর্ম্মরূপে এই সকল উপদেশ যতই কার্য্যকরী হউক, যুগান্তরের ক্রমবর্দ্ধমান মানবীয় চৈতন্যে যে আধ্যাত্মিক সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, মানুষের দেহমন যে তীব্রতর চেতনায় অশান্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে খ্রীষ্টের—"Render unto Caesar what is Caeser's due"—এই নীতি অনুযায়ী সংসারের সঙ্গে তেমন সহজ বোঝাপড়া আর সম্ভব নহে। আধ্যাত্মিক সঙ্কট অপেক্ষা আধিভৌতিক সঙ্কটই এখন মানুষকে এমন কোণঠেসা করিয়াছে যে, ইহকালই তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে; অথচ তাহাতেও বাঁচিবার আশা নাই। আজ যে ভগবৎ-মুখী হইয়া বসিয়া থাকে, সে হয় ক্লীব, নয় অন্ধ। মধ্যযুগের আদর্শ আজ অচল। অথচ ধর্ম্মহীন হইলে মানুষ বাঁচিবে না। তবে উপায়?

উপায় সর্ব্বযুগে যাহা ছিল এই যুগেও তাহাই,—মানুষকে বাঁচিতে হইলে জীবনেরই আরাধনা করিতে হইবে,—বৃহত্তর জীবনের। এক কথায়, প্রেমই সেই সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী। যুগে যুগে ইহাই মানুষকে বাঁচাইয়াছে; আত্মোৎসর্গ না করিয়া আত্মলাভ নাই। কিন্তু এ যুগে সে প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? প্রেমের নূতনতর ভিত্তিভূমি কি হইবে? ভগবানে আত্মসমর্পণ যে প্রেমের আদর্শ, সে প্রেমে আজ কেহ সাড়া দিবে না—আজিকার মানুষ অহৈতুকী প্রেমেরও হেতু জিজ্ঞাসা করে। খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব—কোন theology-তেই সে বিশ্বাস করে না; কোন তত্ত্ববাদ তাহাকে প্রেমিক করিয়া তুলিবে না। অথচ তাহাকে বাঁচিতে হইবে—মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম যে প্রেম, তাহার দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীময় মানবের নবজাগরণ হইয়াছিল—প্রাচীন সংস্কার জীর্ণ-নির্ম্মোকের মত মানুষের মন হইতে খসিয়া পড়িতেছিল। এক নূতন বুভুক্ষা এই নব জাগ্রত মানবসমাজকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। এ বুভুক্ষার মূলে ছিল মানুষের অতি তীব্র মনুষ্যত্ব-চেতনা। এই বুভুক্ষা-প্রশমনকল্পে কত মনীষীর মনীষা ব্যর্থ হইল—কত পথ্যের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু পাকপ্রণালী আবিষ্কৃত হইল না। সমাজে ও রাষ্ট্রে কত ভাঙা-গড়া, সমাজনীতি ও রাজনীতির কত নিত্য নূতন মতবাদ, শাস্ত্র ও গুরুবাদের পরিবর্ত্তে বিবেক বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বজা, নবধর্ম্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই ক্ষুধার কত লক্ষণই কত দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল; মানুষ যেন কস্তুরী-মৃগের মত নিজ নাভিগন্ধে দিশাহারা হইয়াছিল। যে ধর্ম্ম এতকাল সমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর যথেষ্ট নয়—তাহার উপর যে জোড়াতালি চলিতেছিল

তাহাতে এই ক্ষুধা আরও বিকৃত হইয়া পড়িতেছিল ; মনুষ্যত্বের নামে ব্যক্তির আত্মপরায়ণতা প্রশ্রয় পাইয়া মহাবিনাশের পথ প্রস্তুত করিতেছিল।

এমনই কালে এই বাংলা দেশের জল মাটিতেই প্রেমের এক নূতন তত্ত্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা—যে শ্রদ্ধা অতি অধমকেও আত্মবিশ্বাসী করিয়া তোলে—তাহাই হইল এই নব-মানব-প্রেমের আদি প্রেরণা।

বুদ্ধ যাহাকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে নির্ব্বাণমুক্তির অভয়লাভ করিতে বলিয়াছেন, খ্রীষ্ট তাহাকেই সঞ্জীবিত করিয়া ক্ষমা ও তিতিক্ষার অনুশীলনে পাপমুক্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। চৈতন্য অহৈতুকী শুদ্ধা প্রীতির সাধনা করিতে বলিয়াছিলেন—কামকেই ইন্দ্রিয়লোক হইতে অতীন্দ্রিয়লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমের সন্ন্যাস প্রচার করিয়াছিলেন। কেহই মানুষকে বড় করেন নাই, মানুষের মনুষ্যত্বের দায়কে সাক্ষাৎভাবে তুচ্ছ করিতে শিখাইয়াছিলেন। উভয়েরই শিক্ষায় পাপবোধ ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন বড় হইয়া আছে ; মানুষ কেবলমাত্র মানুষহিসাবে অসৎ—সেই এক পরম সৎকে বিশ্বাস বা তাহার প্রতি অহৈতুকী প্রেমের দ্বারা শুচি হইতে পারিলে, তবে সে ভবভয় হইতে মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু এবার প্রেমের নূতন অর্থ হইল—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবের মধ্যেই শিবের সাক্ষাৎকার। মুক্তির সবচেয়ে বড় আদর্শ হইল জীবন্মুক্তি —এই মানুষের সংসারে, জীবরূপেই যে শিবত্বের উপলব্ধি করিয়াছে —মুক্তিকেও যে তুচ্ছ করিয়াছে, সেই প্রকৃত মুক্ত।

শ্রীচৈতন্য 'জীবে দয়া, নামে রুচি' উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি পৃথক 'নামে রুচি'র

আবশ্যকতা রাখেন নাই,—কারণ সেই নাম বস্তু হইতে পৃথক নয়, ভগবান ঐ জীবের মধ্যেই আছেন। এই 'জীবে দয়া'র কথা বলিতে বলিতে একবার তিনি সমাধিস্থ হইয়া পরে সমাধিভঙ্গে মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন—"জীবে দয়া?—দয়া?—বলিতে লজ্জা হয় না? তুমি কীটাণু-কীট! তুমি দয়া করিবার কে? না! না! দয়া অসম্ভব। জীবকে দয়া নয়—শিবরূপে সেবা কর।"

আমার মনে হয়, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারিত নব ধর্ম্মের সার-সত্য। মানুষকেই নব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা,—পাপবোধ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার ভিতরে যে পরম বস্তু রহিয়াছে তাহারই সহিত পরিচয়সাধন করাইয়া, ক্ষুদ্র 'আমি'কে ব্যষ্টিদেহ হইতে উদ্ধার করিয়া বিরাট সমষ্টিদেহে স্পন্দিত করিয়া তোলা—ইহাই এই নব অবতারের অবতারত্বের হেতু। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-তত্ত্ব এমন করিয়া আর কেহ প্রচার করেন নাই। পরমহংসদেবের 'কালী' এই জীব হইতে শিবে, এবং শিব হইতে জীবে গতায়তির সেতু। জ্ঞানের অদ্বৈত-সিদ্ধির শেষে, সচ্চিদানন্দকে আত্মসাৎ করিবারও পরে, যে-প্রেম মহাপুরুষেরই মোহরূপে মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়ান—বৈষ্ণব নয়, পূরা অদ্বৈতীর পক্ষেই সৃষ্টির যে রসরূপ আস্বাদন করা সম্ভব—কালী তাহারই প্রতীক। যে প্রেম অদ্বৈতকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই, বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি, বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি, শিবরূপে জীবের পূজা সম্ভব করিয়া তোলে—এ সেই প্রেম। জগতের আর কোনও প্রেমিক এমন প্রেম প্রচার করেন নাই।

২

শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে যে কয়টি কথা আমার মনে হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমি আর একটি কথা বলিব। আমাদের পঞ্জিকায় মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের যে পর্ব্বদিবস ও তাহার পালন-বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আমার মনে হয় ভক্তের পক্ষে তাহা অপেক্ষা সুন্দর বিধি আর কিছু হইতে পারে না। তথাপি সেই নিত্য বর্ষকৃত্য ছাড়াও এমন একটা নৈমিত্তিক উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া মহোৎসবের অনুষ্ঠান নানা দিক দিয়া প্রয়োজনীয় বোধ হইতে পারে। মহাপুরুষের মহিমাকীর্ত্তন ও নাম-প্রচারের সুযোগ যতই পাওয়া যায় ততই ভাল, এবং এইরূপ বৃহত্তর অনুষ্ঠানে উৎসাহ সঞ্চার অধিক মাত্রায় হওয়াই স্বাভাবিক—সেই অবকাশে কিছু ভাল কাজ করিয়া লওয়াও সম্ভব।

এ যুক্তি মানি। তথাপি আর এক কারণে মন সায় দেয় না। ইহার মধ্যে যেন একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়-বুদ্ধি, হাট-বাজারের বিজ্ঞাপন-নীতি, আধুনিক মনের শ্রদ্ধাহীনতা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কালের শতাব্দী-গণনায় কেবল ইতিহাসগত হইয়া থাকিবার মত যে নয়, মহামন্বন্তরের তরঙ্গচূড়ায় যাহার আবির্ভাব—যুগ-চিহ্নিত কালের উপরে যে চরণ রাখিয়াছে মাত্র, কাল যাহার বাণী-বিগ্রহ গর্ভে ধারণ করিয়াছে, এখনও প্রসব করে নাই—বুদ্ধকে প্রসব করিতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল, খ্রীষ্টকেও ততোধিক—সেই মহাপুরুষের শতবার্ষিকীর অর্থ কি? আমাদের সংস্কার অনুসারে তিনি আসিয়াছিলেন, তিনি ভূতকালের অধিবাসী; তাঁহার আসা যে এখনও শেষ হয় নাই, কেবল আরম্ভ

হইয়াছে মাত্র, ইহা আমরা বুঝি না; তাই অপরাপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠানের মত তাঁহারও স্মৃতি-তর্পণ আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে শ্রেণীর মহাপুরুষ—অবতারবাদে বিশ্বাস থাক বা না থাক—তাঁহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। সমস্ত পৃথিবীকে দেশ, এবং সহস্র বৎসরকে কাল ধরিলে—এমন মহাপুরুষ সবকালে একটিও মেলে কিনা সন্দেহ। অন্ধ-ভক্তির কথা নয়, অন্ধ সাম্প্রদায়িক অশ্রদ্ধার কথাও নয়, সর্ব্বপ্রকার অভিমান ও স্বার্থসংস্কার মুক্ত হইয়া যিনিই এই মহাপুরুষের সমীপবর্ত্তী হইবেন তাঁহারই প্রতীতি হইবে যে, এই নরদেহধারী 'ব্যক্তি' আর সকল ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র; এ যেন এক মহাশক্তি ও মহাসত্যের প্রকাশ; বিশ্বরহস্যের অন্তস্তল হইতে উৎসৃষ্ট—কাল ও মহাকালের সংঘর্ষে উৎক্ষিপ্ত—একটি জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমগ্র কালধারায় ইহাকে প্রসারিত করিয়া দেখিতে না পারিলে, ইহার আয়তন সম্যক দৃষ্টিগোচর হয় না। এই আবির্ভাব যাহারই হউক, যে বাণী এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা যে কালাতীত এবং অপৌরুষেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার কালাতীতকে কালের মধ্যে প্রকাশ হইতে দেখি, ইহাও সত্য; ইহার কারণ কি?

অবতারবাদী হিন্দু বলিবে—'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ'; অবতারে বিশ্বাসী না হইলেও সেই বাক্যের এই অংশটুকু যে সত্য, তাহা বর্ত্তমান কালে প্রমাণ করিতে হইবে না। মানবেতিহাসের নানা যুগে বহু যুগন্ধর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে—সেই সকল আবির্ভাব, 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ' নয়, কালধারার সুস্থগতির ফলেই হইয়া থাকে—তাহা কালাতীতের আবির্ভাব নয়। কিন্তু 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ' যাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ একালে যেমন

প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক এই অবস্থা আর কখনও হয়তো হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা মানুষের স্মরণাতীত, সে মন্বন্তর প্রাগৈতিহাসিক। ইহা সাধারণ কালধর্ম্ম নয়—ইহা অকাল; মহাকালরূপী মহোরগ যেন নিজ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিজের পুচ্ছ দংশন করিতেছে! মানুষের মনুষ্যত্ব এমন ভাবে আর কখনও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। ইহাকে সংশোধন করিবার জন্য, যাহা কালাতীত শাশ্বত তাহাকেই প্রয়োজন। "তদাত্মানং সৃজাম্যহং"—অবতার বলিতে হয় বল, না বলিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যাহার প্রকাশ তাহা সেই 'আত্মা'—কালের মধ্যে কালাতীতের আবির্ভাব। ইহা ব্যক্তি নয়—বাণী, ঘটনা নয়—প্রকাশ। ইহার প্রচার আছে—সন-তারিখ নাই। শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠান যাহাদের জন্য হইয়া থাকে এবং হওয়া প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের পুণ্যতিথি যদি পালন করিতে হয়, তবে বর্ষ-পঞ্জিকা আছে, তাহাই যথেষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনও নূতন কথা বলিবার অধিকার বা যোগ্যতা আমার নাই—আমি তাঁহার সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা হইতেই দুই একটি কথা বলিব। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বা তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এত ভক্ত, ভাবুক ও মনীষী কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, সে সম্বন্ধে কোনরূপ ক্ষোভের কারণ আর নাই। আমি বর্ত্তমান প্রসঙ্গে, সেই বহুপ্রচারিত ও সুপরিজ্ঞাত তথ্যরাশি হইতে যে কয়েকটির প্রতি বিশেষ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, তাহার জন্য ভগিনী নিবেদিতার অপূর্ব্ব গ্রন্থ ***The Master as I saw Him,*** এবং মঃ রোমঁ্যা রোলাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও মনীষার অভিনব নিদর্শন—তাঁহার দুইখানি

উপাদেয় গ্রন্থের শরণাপন্ন হইব। ইহার কারণ, এই দুইজনেরই রচনার একটি পৃথক বিশিষ্ট মূল্য আছে। নিবেদিতার গ্রন্থ প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ আমার নিত্যসঙ্গী—এখনও পুরাতন হয় নাই। তাহার মধ্যে যে প্রাণ ও মন সর্ব্বত্র স্পন্দিত হইতেছে, তাহা জ্যোৎস্না-নিশীথের তারাখচিত আকাশের মত—তেমনই বিরাট গম্ভীর ও জ্যোতির্ম্ময়; সে আকাশের দিকে যখনই চাহিয়াছি, তখনই নিজ জীবনের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া চন্দ্রতারকার সভাতলে আসন পাতিয়াছি। গুরু-বিবেকানন্দের লোকোত্তর চরিত্র বুঝিবার ও বুঝাইবার সে কি আন্তরিক প্রয়াস—সেই মহনীয় পুরুষের দিব্যমূর্ত্তি আপনার চিত্তফলকে প্রতিবিম্বিত করিবার জন্য জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের সকল শক্তি একযোগে প্রয়োগ করার সে কি নিরন্তর সাধনা! নিবেদিতার রচনায় যেমন স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরীর গম্ভীর-মনোহর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনই মঃ রোলাঁর গ্রন্থ দুইখানিতে প্রভাতকিরণোজ্জ্বল নির্ম্মলনীল মানস-আকাশের—সদাজাগ্রত, আত্মসচেতন, অথচ ভাবগ্রাহী হৃদয়ের সুভঙ্গিম প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার আলোচনার পক্ষে এই দুইজনের উক্তিই যথেষ্ট। স্বামিজী বা পরমহংসদেবের সম্বন্ধে প্রবন্ধ-রচনা কিংবা বক্তৃতা করা যে কত সহজ, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

একালের ও সেকালের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সাধারণত যে ধারণার আভাস পাই, তাহারই বিষয়ে কিছু বলিব। শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা বিবেকানন্দের মূর্ত্তিই সাধারণের চক্ষে বৃহত্তর হইয়া বিরাজ করে; ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু স্বামিজীর প্রবল ব্যক্তিত্বই যে সাধারণকে অধিক আকৃষ্ট করে, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তি মন্দিরের অন্ধকারে দেববিগ্রহের মত কতকটা রহস্যাবৃত হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করা

যায় না। যে শক্তি বজ্রকেও স্থিরমুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে, অথচ দেখিলে মনে হয় সে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ নয়, সে যে কত বড় শক্তি, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। আমরা জানি, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য—তাঁহারই বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তবু দুইজনে কি প্রভেদ! একজন—পুরুষ-সিংহ, জগতের মহত্তম মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত; তাঁহার চক্ষে জলদর্চ্চি, কণ্ঠে পাঞ্চজন্য। আর একজন শান্ত, আনন্দময়; নেত্র ভাবস্তিমিত, অর্দ্ধনিমীলিত—অধরে করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতি; মৃদুকণ্ঠ, স্খলিতবাক্! উভয়ের প্রকৃতির এই পার্থক্যের কথা মঃ রোলাঁ বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে—

> The great disciple was both physically and morally his (Ramakrishna's) direct antithesis....The Paramahamsa—the Indian Swan—rested his great white wings on the sapphire lake of eternity, beyond the veil of tumultuous days....Vivekananda could only attain his heights by sudden flights amid tempests.... Even in moments of rest upon its bosom the sails of his ship were filled with every wind that blew. Earthly cries, the sufferings of the ages, fluttered around him like a flight of famished gulls.—*The Life of Vivakananda.* P. 4.

এখানে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতিগত যে বৈষম্যের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা যথার্থ হইলেও, এই উক্তির মধ্যে আর একটি অর্থ রহিয়াছে, এবং তাহা সুস্পষ্ট। মঃ রোলাঁ পরমহংসদেবকে এই মর্ত্ত্যজীবনের অবিশ্বাসম্ভূত ঝড়ঝঞ্ঝার বহু ঊর্দ্ধে, নীলকান্ত অমৃতহ্রদের উপরে, তাঁহার বৃহৎ শুভ্রপক্ষ বিস্তার করিয়া ভূমানন্দে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছেন; অপর পক্ষে, শিষ্য

বিবেকানন্দ পৃথিবীর ঝড়ঝঞ্ঝা বুকে করিয়া আর্ত্তত্রাণ-ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার গুরুর 'direct antithesis' বা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণও এ কথায় সায় দিবে। একজন সম্বন্ধে মঃ রোঁলা বলিতেছেন—"his life had been spent in the serene fulness of the cosmic joy"; আর একজন জীবনে বিশ্রাম চান নাই—"He was energy personified and action was his message to man"। এই দুই চরিত্রের কোন্‌টি আধুনিক মানুষের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অধিক অর্জ্জন করিবে, তাহা অনুমান করা দুরূহ নয়। কিন্তু গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে শিষ্যপ্রচারিত গুরুর সেই বাণীও অর্থহীন হইয়া পড়ে। অতএব এই উক্তি, বা সাধারণের এই ধারণা কি অর্থে কতখানি সত্য, তাহারই আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাহিনী যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, এমনই একটি শিষ্য লাভ করিবার জন্য একদা শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ আকুল হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রকেই—এই antithesis-কেই—তাঁহার প্রয়োজন ছিল, এবং তাহাকে লাভ করা সহজ হয় নাই। ঘোরতর জ্ঞানপিপাসা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রকৃতিতে ছিল দুর্জ্জয় স্বাতন্ত্র্য-কামনা। এ প্রকৃতি আমাদের দেশে বড় ভয়ের কারণ, ইহারাই অবশেষে সর্ব্বত্যাগ করিয়া দুর্গম পথে অন্তর্দ্ধান করে; ইহারাই স্নেহ প্রেম মমতার সকল মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া সেইখানে প্রয়াণ করিতে চায়, যেখানে আছে, মঃ রোলাঁর ভাষায়—"the sapphire lake of eternity beyond the veil of tumultuous days"। তরুণ নরেন্দ্রকে

দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার ললাটের সেই শৈব-দীপ্তি তাঁহাকে আশান্বিত করিয়াছিল—সেই তেজকে তিনি নিজ করপুটে ধারণ করিয়া জগতের হিতার্থে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাস্কর যেমন তাহার স্বপ্নকে রূপ দিবার জন্য সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় পাষাণ-ফলক খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং মনোগত মূর্ত্তির সহিত অবয়ব ও আয়তন মিলিলে, আনন্দের সীমা থাকে না—শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে পাইয়া তেমনই আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কঠিন প্রস্তর যেমন ছেদনীকে প্রতি পদে প্রতিহত করিয়া লাবণ্যের কোমলতা অর্জ্জন করে—বিবেকানন্দও গুরুর হাতে তেমনই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সহজে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আত্মসমর্পণ করেন নাই। মঃ রেঁালা তাঁহার যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন—সে ঝড় তুলিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; সে ঝড় ধারণ করিবার উপযুক্ত মহাসাগর তিনি এই শিষ্যের মধ্যে চাক্ষুষ করিয়াছিলেন।

গুরুশিষ্যের মধ্যে সেই সংগ্রামের কথা এবং সেই সংগ্রামে শিষ্যের পরাজয়, আত্মদান ও আত্মাহুতির মর্ম্ম যে না বুঝিয়াছে, সে এই মহানাটকের অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছে। নরেন্দ্র প্রথমে আর কোনও কথা শুনিবে না, কেবল জানিতে চায়—তিনি সেই 'বস্তু' দেখিয়াছেন ও দেখাইতে পারেন কি না! যখন আর সংশয় রহিল না যে, এই নিরক্ষর অর্দ্ধোন্মাদ ব্রাহ্মণ সত্যই সেই মহাধনে ধনী, তখন আরও বিস্ময়ের কারণ হইল এই যে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যে পৌছিয়াছে সে আবার কিসের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে কি খুঁজিয়া বেড়ায়? পরব্যোমে স্থিত চিদ্‌ঘন আনন্দ-সত্তার আস্বাদন লাভ করিয়াও সে আবার কথা কয়!—তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া মানুষের সঙ্গ চায়! এত বড়

ত্যাগ ত্যাগাভিমানী নরেন্দ্রও কল্পনা করে নাই; ভারতের অতীত মহাপুরুষগণের মধ্যে, কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্যের মধ্যেও, ত্যাগের এ আদর্শ তাহার চোখে পড়ে নাই। আত্মযোগ-সাধনায় যে সিদ্ধ, যে জ্ঞানমার্গী, অদ্বৈতের উপাসক, তাহার একি মতিবিভ্রম!—সে এই বহুকে, এই সৃষ্টিকে, এই মায়া-স্বপ্নের ছায়াবুদ্বুদ-রাশিকে এমন করিয়া আগুলিয়া রাখিতে চায় কেন? নরেন্দ্র বুঝিতে পারে না, কেবল দেখে। এই বিস্ময় হইতেই তাহার প্রাণে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল, তাহারই পরিণামে নরেন্দ্রের বিবেকানন্দরূপে জন্মান্তর ঘটিল। ক্রমে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুর্ব্বলতাকে সে আর এক চক্ষে দেখিতে লাগিল, এবং পরিশেষে, যে প্রেম জ্ঞানেরই পরম পরিণাম, যে প্রেম একই কালে আত্মোৎসর্গ ও আত্মোপলব্ধির পরাকাষ্ঠা—যাহার বিহনে জ্ঞানের 'সচ্চিদ্' অসম্পূর্ণ, নীরস—'আনন্দ' একটা তত্ত্বগত শূন্যবাদ মাত্র—সেই মহাপ্রেমের পদতলে শিষ্য আপনাকে লুটাইয়া দিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্টদেবতা 'কালী'কে তিনি প্রথমে বুঝিতে চাহেন নাই; বৈষ্ণবের সাধন-বিগ্রহ রাধার মত, শ্রীরামকৃষ্ণের নব ব্রহ্ম-সাধনার সেই সাধন-বিগ্রহ—যাহাকে তিনি স্বীয় উপলব্ধির অতল হইতে উদ্ধার করিয়া নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—সেই 'কালী'কে তিনি আদৌ স্বীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি বলিয়াছিলেন—

> How I used to hate Kali and all her ways! That was the ground of my six years' fight—that I would not accept Her. But I had to accept Her at last!

—এ পরাজয় ঘটিল কেমন করিয়া? তিনি নিজেই তাহা বলিতেছেন।—

> Ramakrishna Paramahamsa dedicated me to Her. ...I loved him, you see, and that was what held me.

I saw his marvellous purity...I felt his wonderful love....His greatness had not dawned on me then. *The Master as I saw Him*. P. 214.

—'I felt his wonderful love'—ইহাই আসল কথা। গুরুর নিকটে ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান দীক্ষালাভ।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—বিবেকানন্দ

১

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ভাবপ্রবণ বাঙালীর চিত্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান উগ্র মদিরার মত সঞ্চারিত হইতেছিল, এবং ক্রমশ উহার বিষক্রিয়াই প্রবল হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, শতাব্দীর শেষে, যখন সেই বিষের প্রভাব প্রায় চরমে উঠিয়াছে, তখন এক বাঙালী সন্তানের অপরিমেয় প্রাণশক্তি ও সর্ব্বগ্রাসী মনীষা তাহাকে হজম করিয়া, সেই বিধর্ম্মের বিষকে স্বধর্ম্মের রসায়নে শোধন করিয়া সঞ্জীবনী সুধারসে পরিণত করিল—বিবেকানন্দের জীবনে সেই শক্তির স্ফুরণ হইল কেমন করিয়া তাহাই আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বুদ্ধিমান বিজেতা জাতির বিষয়-জ্ঞান ও কূটনীতির সাফল্যদর্শনে যে পরধর্ম্মপ্রীতি, ও তৎসহ নবলব্ধ বিদ্যার যে অভিমান, তাহাই বাঙালীকে আত্মভ্রষ্ট করিতেছিল, এবং স্বাধীন যুক্তিবাদ বা বিবেকের ছদ্মবেশে যে অতিশয় স্বার্থপর অথচ সুকল্পিত ব্যক্তি-ধর্ম্ম সমাজে এক ভয়াবহ আদর্শকে উদ্ধত করিয়া তুলিতেছিল—বিবেকানন্দও প্রথম বয়সে সেই আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাও বিশ্বাস করি যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনিও বিজয়কৃষ্ণের মত এই ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে

দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেন—সেই অতুলনীয় হৃদয়-বল ও কর্ম্মশক্তি শিলাময় শিবত্বে নির্ব্বাণ লাভ করিত, ইস্পাত আবার খনিগর্ভে লুকাইত। কিন্তু ইস্পাত আগুনের মুখে পড়িল—তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু মিশিয়া গেল যাহাতে জগতের লৌহশৃঙ্খল ছেদন করিবার মত একখানি সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইল। সে যুগের সেই তথাকথিত উচ্চ-আদর্শে-লুব্ধ অথচ নিরতিশয় অতৃপ্ত, শতাব্দীব্যাপী মন্থনের শেষে মন্থনোদ্ভূত বিষপানে কাতর—নবযুগের এই নচিকেতা—মৃত্যুর মুখে অমৃতের বাণী শুনিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মৃত্যুপুরে—সংসারের বাহিরে—তাহাকে যাইতে হয় নাই; জীবনের পথেই সে তাহাকে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কেমন করিয়া তাহার সেই উদ্ধত প্রশ্ন স্তম্ভিত হইয়াছিল, উত্তরকালে তাহাই স্মরণ করিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন—"I felt his wonderful love"। মঃ রোলাঁ যে বলিয়াছেন—

> The sails of his ship were filled with every wind that blew, earthly cries, the sufferings of the ages, fluttered round him like a flight of famished gulls.

—ইহা যে কি কারণে ঘটিয়াছিল, তাহা স্বামিজী নিজে যেমন জানিতেন আর কেহ তেমন জানিবে না।

যাঁহারা বিবেকানন্দের জীবন-কাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহারা একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন—সে জীবনে সর্ব্বদাই যেন একটা বন্ধন-বেদনা ছিল। সত্য বটে—মঃ রোলাঁর ভাষায়—

> His super-powerful body and too vast brain were the predestined battle-field for all the shocks of his storm-tossed soul. The present and the past, the East and the West, dream and action struggled for

> supremacy....And his days were numbered. Sixteen years passed between Ramakrishna's death and that of his great disciple—years of conflagration. He was less than forty years of age when the athlete lay stretched upon the pyre.

—কিন্তু যে ঝড় ও আগুন তাঁহার জীবনের এক মুহূর্ত্তকে বিশ্রাম দেয় নাই—কর্ম্মের সেই অসীম উন্মাদনার মধ্যেই কত ব্যক্তি তাঁহার ভাবভঙ্গিতে একটা অন্তর্গূঢ় অনাসক্তি ও বাস্তব-বিস্মৃতির প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াছেন। কাজ যেন আর কাহার—তাঁহার নয়! প্রাণ কেবলই ছুটি চাহিতেছে, আত্মার অন্তস্তলে "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি"র কামনাই জাগিতেছে। কিন্তু উপায় নাই; যেন কাহার প্রেমে তিনি বাঁধা পড়িয়াছেন, নিজ জীবনের পরমপুরুষার্থ তাঁহারই পদে নিবেদন করিয়াছেন। শিব ছিলেন তাঁহার ইষ্টদেবতা, সন্ন্যাস ছিল তাঁহার আজন্মের আদর্শ, নির্ব্বিকল্প সমাধির অমৃতরস ছিল তাঁহার একমাত্র লোভের বস্তু; কিন্তু এ সকলই তুচ্ছ করিয়া তিনি সেই উন্মাদ ব্রাহ্মণের প্রেমে আপনাকে বিকাইয়াছিলেন। সে যে কত বড় শক্তি—যে শক্তি এই পুরুষকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হয়তো তিনিই জানিতেন, আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। স্বামিজীর সেই কথা—"No, the thing that made me do it is a secret that will die with me"—এইখানে স্মরণযোগ্য। ইহার মধ্যে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার অর্থ আরও স্পষ্ট হয় যখন তাঁহারই মুখে শুনি—"And Ramakrishna made me over to her (Kali). Strange! He lived only two years after doing that and most of the time he was suffering." (*The Master*

as I saw Him. P. 215)—যেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সমস্ত শক্তি শিষ্যের ভিতরে ঢালিয়া দিয়াছিলেন—এ যেন একরূপ 'পরকায়-প্রবেশ'! শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যু-সময়ে আমরা এইরূপ একটি ঘটনার কথা শুনিয়া থাকি—"আমি আমার সব তোমাকে দিলাম, আমি নিঃস্ব হইলাম" বলিয়া মহাপুরুষ কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে, তাঁহার সেই উদ্দাম অগ্নিবেগের অন্তরালে যে একটি বন্ধন-পীড়ার আভাস বারবার পাওয়া যায় ভগিনী নিবেদিতাও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—

> It seemed almost as it were by some antagonistic power, that he was 'bowled along from place to place being broken the while', to use his own graphic phrase. "Oh, I know I have wandered over the whole earth", he cried once, "but in India I have looked for nothing, save the cave in which to meditate!

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ"-কাহিনীর এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিবেকানন্দের প্রকৃতি যে তাঁহার গুরু হইতে ভিন্ন তাহা সত্য, কিন্তু আরও সত্য এই যে, এই ভেদ সত্ত্বেও, তিনি গুরুরই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন—তিনি যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা গুরুরই আদেশে, এবং শেষ পর্য্যন্ত গুরুই যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নরেন্দ্র দত্তের যাহা কিছু তাহা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াই জগতের সমক্ষে বিবেকানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কারণ বিবেকানন্দ নামক যে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা জগৎবাসী পাইয়াছি, তাহাতে পরমহংসদেব হইতে বিশিষ্ট একটি

প্রকৃতির লক্ষণ থাকিলেও, সেই দ্বন্দ্বকে অর্থাৎ নিজের বিরুদ্ধ আদর্শকে স্বামিজী যেন সর্ব্বদা সাবধানে দমন করিয়াছিলেন; বরং, সেই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান ছিলেন বলিয়াই গুরুর আদর্শকেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিজ দেহ-মন-প্রাণের সকল শক্তি এমন করিয়া তাহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এই দ্বন্দ্বই যেন তাঁহার শক্তি-স্ফুরণের সহায়তা করিয়াছিল। মঃ রোলাঁ তাঁহার গ্রন্থে স্বামিজীর একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—একবার অতিশয় ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায়, সকল কর্ম্মের অবসান, পূর্ণ নির্ব্বাণ কামনা করিয়া স্বামিজী লিখিয়াছিলেন—

> Pray for me that my work stops for ever and my whole soul be absorbed in the Mother....The battles are lost and won! I have bundled my things and am waiting for the great Deliverer. Shiva, O Shiva, carry my boat to the other shore!...That is my true nature! Works and activities, doing good and so forth are all superimpositions....Bonds are breaking, love dying, work becoming tasteless; the glamour is off life....The old man is gone for ever. The guide, the Guru, the leader has passed away.

দেখা যাইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল প্রভাবও তাঁহার সেই স্বকীয় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে নাই। গুরুর মৃত্যুর পরেও, তাঁহার দেহের সেই অলৌকিক তড়িৎ-স্পর্শ লাভের পরেও, স্বামিজী পওহারী বাবার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মঃ রোলাঁ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

> The latter (Pavhari Baba) would have satisfied his passion for the Divine gulf, wherein the individual

soul renounces itself and is entirely absorbed without any thought of return....Naren was for twenty-one days within an ace of yielding. But for twenty-one nights the vision of Ramakrishna came to draw him back. Finally after an inner struggle of the utmost intensity, whose viscissitudes he always consistently refused to reveal, he made his choice for ever. He chose the service of God in man.

সেই গুরুতর আধ্যাত্মিক সঙ্কটে শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি আত্মসাধনা করিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামী হইবেন, না, জগতের সেবা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ হইবেন—সে প্রশ্নের মীমাংসা কাহার দ্বারা হইয়াছিল, এই ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ক্রমাগত একুশ রাত্রি ধরিয়া স্বপ্নে গুরুর সেই করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অবশেষে সেই মহাপ্রেমিকের পদতলে জন্মের মত আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র কেমন করিয়া বিবেকানন্দ হইলেন সে আলোচনা সংক্ষেপে করিলাম। মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দকে তাঁহার গুরুর 'direct antithesis' বলিয়াছেন তাহা সত্য; তাঁহার পূর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতাও এই ধরনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সেই ভেদের মধ্যেই অভেদ-তত্ত্বের—'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'রূপ যুগ্মসত্তার—কথঞ্চিৎ উপলব্ধি না হইলে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। বিবেকানন্দের সেই বিপরীত প্রকৃতিকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া অবতারকল্প মহাপুরুষ 'আত্মানং সৃজাম্যহং'—সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ধ্যানী মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রেমের যে উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল তাহার উপযুক্ত দেহ-মন তিনি পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দে। আবার যুগধর্ম্মের প্রবল প্রভাব যাহার

প্রকৃতিগত জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিলেও, 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং'কে লাভ করিবার জন্যই যে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, সেও সেই মহাপুরুষের মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সেবায় নিজের সকল শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার উল্লেখ ভগিনী নিবেদিতা ও মঃ রোলাঁ উভয়েই একটু বিশেষভাবে করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন—

> Sri Ramkrishna had been, as the Swami himself said once of him, "like a flower" living apart in the garden of a temple, simple, half naked, orthodox, the ideal of the old time in India, suddenly burst into bloom, in a world that had thought to dismiss its very memory. It was at once the greatness and the tragedy of my own master's life that he was not of this type. His was the modern mind in its completeness. In his consciousness, the ancient light of the mood in which man comes face to face with God might shine, but it shone on all those questions and all those puzzles which are present to the thinkers and workers of the modern world.—*The Master as I saw Him.* Pp. 124-25.

অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই চিন্তাব্যাধিগ্রস্ত, শঙ্কাসংশয়ক্লিষ্ট আধুনিক সমাজে নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত আনন্দের উৎসস্বরূপ ছিলেন—একটি ফুলের মত তিনি এই কণ্টকারণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি ছিলেন আত্মানন্দী পুরুষ, বাহিরের অন্ধকার তাঁহার অন্তর্গহনের জ্যোতিঃশিখা ম্লান করিতে পারে নাই। সেই আলোকে বিবেকানন্দও চক্ষু

মেলিয়াছিলেন—কিন্তু কেবল চক্ষে আলো নয়, এযুগের অনলকুণ্ড তাঁহার বক্ষে অহরহ জ্বলিয়াছিল—তাঁহার চক্ষের সে আলোক জগতের সকল সমস্যা ও সংশয়সঙ্কটের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। মঃ রোলাঁর কথাগুলি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। উভয়েই গুরুশিষ্যের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, গুরুশিষ্যে এখানে প্রভেদ নাই। একজন জীবনের ভিতর দিয়া, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাবনা-বেদনা দিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন—আর একজন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে উপলব্ধি আরও গূঢ়, আরও গভীর; এবং গভীর ও সীমাহীন বলিয়াই তাহা কোন কর্ম্মবিধিকে আশ্রয় করিতে পারে নাই; সেই জন্যই একটি নদীপ্রবাহে নিজের সেই তটহীন প্রেমকে প্রবাহিত করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের উদ্ধত জ্ঞানাভিমান ও প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনার কথাটি তাহাকে বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"নরেন যেদিন, জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিবে সেইদিন উহার সব অভিমান চূর্ণ হইবে, সারা প্রাণ অসীম করুণায় গলিয়া যাইবে।" ইহারই উল্লেখ করিয়া মঃ রোলাঁ বলিতেছেন—

> This meeting with suffering and human misery... was to be the flint upon the steel, whence a spark would fly to set the whole soul on fire. And with this as its foundation-stone, pride, ambition and love, faith, science and action, all his powers and all his desires were thrown into the mission of human service

and united into one single flame.—*The Life of Vivekananda.* Pp. 10-11.

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরে তাহার এই সার্থকতা কি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, বিবেকানন্দের জীবনে গুরুর অভিপ্রায়ই পূর্ণ হইয়াছিল? অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার মুখে যখন শুনি—

That sudden revelation of the misery and struggle of humanity as a whole, which has been the first result of the limelight irradiation of facts by the organisation of knowldge, had been made to him also, as to the European mind. We know the verdict that Europe has passed on it all. Our art, our science, our poetry, for the last sixty years or more, are filled with the voices of our despair. A world summed up into the growing satisfaction and vulgarity of privilege, and the growing sadness and pain of the dispossessed; and a will of man too noble and high to condone the evil, yet too feeble to avert or arrest it, this is the spectacle of which our greatest minds are aware. Reluctant, wringing her hands, it is true, yet seeing no other way, the culture of the West can but stand and cry, "To him that hath shall be given, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Vae Victis! Woe to the vanquished!"

Is this also the verdict of the eastern wisdom? If so, what hope is there for humanity? I find in my master's life an answer to this question.—*The Master as I saw Him.* Pp. 125-26.

—তখন বিশ্বাস না হইয়া পারে না যে, বিবেকানন্দ-রূপ অশ্বত্থবৃক্ষের বীজ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা-গহনেই নিহিত ছিল। ভাবনা চিন্তা, আবেগ ও কল্পনা, ভূয়োদর্শন ও মনীষা, এই সকলের সাহায্যে একজনের জীবনে যে বাণীকে আমরা বীরবীর্য্য ও কর্ম্মশক্তিতে মূর্ত্ত হইতে দেখি, সেই বাণীর এক অলৌকিক অপৌরুষেয় অভিব্যক্তি আর একজনের মধ্যে পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বিবেকানন্দের পৌরুষ, প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই, তাহার মূল উৎস যিনি, তিনি পাণ্ডিত্য, প্রতিভা বা মনীষার কোন পরিচয় দেন নাই; অথবা, আমরা যাহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান বলি তাহাও করেন নাই। তাই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানিবেই। কিন্তু সেই ভেদ রক্ষা করা সম্ভব কি না, আমি এ প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' একটি অখণ্ড অভিন্ন তত্ত্ব হইয়া আছে। মানুষের দৃষ্টি—সে যত বড় মানুষই হউক—পূর্ণ নহে; জ্ঞান বা ভক্তি দুইয়ের কোনটাই শেষ পর্য্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত নহে। তাই ভগিনী নিবেদিতার মত মহীয়সী মহিলাও তাঁহার নিজের গুরুর জন্য একটু পৃথক্ গৌরব দাবি করিয়াছেন—

> I see in him the heir to the spiritual discoveries and religious struggles of innumerable teachers and saints in the past of India and the world, and at the same time the pioneer and prophet of a new and future order of development.

কে বলিবে এ গৌরব তাঁহার গুরু বিবেকানন্দের প্রাপ্য নয়? কিন্তু

বিবেকানন্দ কি শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র? তবে তাঁহাকে আড়ালে রাখিলেন কেন? বুঝি তাঁহারও দোষ নাই; গুরুশিষ্যের এই সম্বন্ধ সত্যই রহস্যময়, আরও রহস্য এই যে, সে সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেও বারবার ভুল হয়—বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এত প্রবল যে, মানুষ আমরা এইরূপ প্রকট ব্যক্তিত্বের মহিমায় অভিভূত না হইয়া পারি না।

২

সে সম্বন্ধের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একবার এক অপরূপ স্বপ্ন-ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। মিষ্টিসিজ্‌ম কাহাকে বলে জানি, কিন্তু মিষ্টিকের অনুভূতি কেমন তাহা জানি না। তথাপি এই কথাগুলিতে যে তত্ত্ব যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই যদি মিষ্টিকের রীতি হয়, তবে বলিব, অপরোক্ষ অনুভূতির যে সত্য তাহা প্রকাশ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট রীতি। এ রীতি দার্শনিক বা সাহিত্যিক রীতি নয়—এমন কি, ভাবকে রূপ দিবার যে বিশিষ্ট বাক্‌-পদ্ধতিকে আমরা কাব্য বলিয়া থাকি ইহা সেই কবিকর্ম্মও নহে। কবির ভাষায় ইহারই নাম—'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে', অথচ সে কথা 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ' নয়—অব্যক্তকে বাক্যগোচর করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আমি এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিই তাহার শেষ কথা, তাই ইহা দ্বারাই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এখানেও আমি অনুবাদের অনুবাদ দিলাম; দেখা যাইবে যে, শত অনুবাদেও এই দিব্য বারতার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয় নাই। নরেন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

একদিন সমাধির অবস্থায় আমার মন একটি আলোকময় পথ ধরিয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর লোকে উঠিতে লাগিল। নক্ষত্রলোক পার হইয়া, সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানলোক পার হইয়া আমি উঠিতে লাগিলাম, পথের দুই পার্শ্বে যত দেবদেবীর মানস-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে এমন দূরতম স্থানে পৌছিলাম যেখানে একটি জ্যোতির রেখা দ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈতের সীমা চিহ্নিত রহিয়াছে। সে সীমাও পার হইয়া আমি অখণ্ডের ঘরে পৌছিলাম, দেবতারাও সেখানে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করেন না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম সেই জ্যোতির্লোকে সাত জন ঋষি সমাধিস্থ হইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে ও শুচিতায় তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া আমি তাঁহাদের মাহাত্ম্যের কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, সেই নিস্তরঙ্গ প্রভারাশির এক অংশ জমাট হইয়া একটি দেবশিশুর আকার ধারণ করিল। অতঃপর সেই শিশু সপ্তঋষির একজনের গলায় তাহার সুন্দর বাহু দুইটি জড়াইয়া অমৃত-নিস্যন্দী কলকণ্ঠে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে চাহিল; তাহার মোহন স্পর্শে ঋষির নিস্পন্দভাব ঘুচিল, তিনি অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে সেই শিশুর অপূর্ব্ব মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষির সেই ভাববিভোর দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল, ঐ শিশুই যেন তাঁহার বক্ষের মণি। তখন শিশুও পরম আহ্লাদে তাঁহাকে বলিল—"আমি যাইতেছি, তুমিও আইস।" ঋষি বাক্যস্ফূর্ত্তি করিলেন না, কিন্তু তাঁহার সস্নেহদৃষ্টি সম্মতিজ্ঞাপন করিল, এবং শিশুর পানে চাহিয়া থাকিতেই তিনি পুনঃ সমাধিমগ্ন হইলেন। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম তাঁহার অঙ্গ হইতে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া আলোকশিখারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। নরেনকে দেখিবামাত্র আমি তাহাকে সেই ঋষি বলিয়া চিনিয়াছিলাম।

এই অপরূপ কাহিনীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-তত্ত্বের পরম-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা অসম্ভব—অর্থে নয়, ভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। কিন্তু ইহা হইতেই অনেকের মনে হইয়াছে, এই গাঢ় নিদ্রার গূঢ় স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যেন শিষ্যকেই তাঁহার গুরু বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। এমন ভুল আর হইতে পারে না। বিবেকানন্দ যদি সেই ঋষি হন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণকেই সেই শিশু বলিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলে এই স্বপ্ননাট্যের নায়ক যে সেই শিশু তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখা যাইতেছে, সেই ঋষি মহাজ্ঞানী, আর সেই শিশু প্রেমের অমৃত-পুত্তলি,—জ্ঞানকে প্রেম স্পর্শ করিতেছে এবং সেই স্পর্শে নিস্পন্দ সাগর রসতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, যাহা চিদ্‌ঘন তাহাই আনন্দে বিগলিত হইতেছে। ইহার মধ্যে কে বড়, কে ছোট, অথবা কাহাকে বাদ দিয়া কে স্বয়ম্পূর্ণ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জ্ঞান সেই প্রেমকে তাহার অন্তরের ধন বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহাতেই যেন গভীরতর আত্মোপলব্ধির আবেশে পুনরায় সমাধি-মগ্ন হয়। এই সমাধি-স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে আপনি দেখিতেছেন, অথচ সে দেখার মধ্যে অহংজ্ঞান নাই। এমন আত্মহারা আত্মপরিচয়-দান মানুষের কাহিনীতে দুর্লভ। আপনারই গৌরব অপরে সমর্পিত হইতেছে—প্রেম শিশুরূপে জ্ঞানের কণ্ঠলগ্ন হইতেছে; তাহাতে যেমন আত্মাভিমান নাই, তেমনি আত্মসঙ্কোচও নাই। 'আমি যাইতেছি তুমিও আইস'—ইহা মিনতি না আদেশ? মানুষের ভাষায় তাহা বুঝানো যায় না।

সেই উর্দ্ধলোকের দৃশ্য নিম্নে পৃথ্বীতলেও অভিনীত হইয়াছিল। নরেন্দ্র এখানেও সেই শিশুর প্রতি তেমনই মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিলেন।

সেই মুখ তিনি জীবনে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, এবং বারংবার বলিয়াছিলেন—'I felt his wonderful love.'

সেই শিশুর স্পর্শেই ক্ষণকালের জন্য ঋষির সমাধি-ভঙ্গ হইয়াছিল; তারপর আবার সেই সমাধি!—কতকালের জন্য, কে জানে?

মাঘ, ১৩৪২

শরৎ-পরিচয়

১

তখন বোধ হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ—শরৎচন্দ্রের নাম তখন আমাদের তরুণ সাহিত্যিক-সমাজে অজ্ঞাত, যদিও ইতিমধ্যে তাঁহার কয়েকটি গল্প একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পর তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক, আর দুই-চারিজন যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যে কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর আমার তেমন শ্রদ্ধা বা আশাভরসা ছিল না—আমার সাহিত্যিক আদর্শ বরাবরই কিছু স্পর্দ্ধাপূর্ণ। এমন অবস্থায় তখনকার একখানি ক্ষুদ্র মাসিক-পত্রিকা 'যমুনা'য় যে কোন সত্যকার বড় প্রতিভার আবির্ভাব হইতে পারে, সে বিশ্বাসের কারণ ছিল না। অতএব 'যমুনা'-সম্পাদক সাহিত্যিক-বন্ধু স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল যখন দেখা হইলেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক কোন এক সম্পূর্ণ অখ্যাতনামা লেখকের গল্প তাঁহার 'যমুনা' পত্রিকায় পড়িবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন, তখন নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে তাহাতে সম্মতি জানাইতাম, কিন্তু দুই তিন মাসেও তাহা পড়িবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি হইত না। লেখকের নাম যেমন অপরিচিত, গল্পের নামও তেমনই সুসভ্য বা সুশ্রী নয়—'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'—শুনিলে কিছুমাত্র ভক্তির উদ্রেক হয় না। অতএব 'যমুনা'-সম্পাদকের এই প্রশংসার মূলে যে তাঁহার সম্পাদকীয় আত্মপ্রসাদ ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু একদিন পুনর্ব্বার সাক্ষাতে সেই একই প্রসঙ্গে ফণীবাবু যখন বলিলেন—একবার 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র গল্পগুলির মধ্যে

'মন্দির' নামে যে গল্পটি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল, তাহার লেখক এই শরৎচন্দ্রই, তখন আর উপায় রহিল না। ঐ গল্পটি আমি ভুলি নাই ; যাঁহার নামে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল, এত দিনে তাঁহার প্রতিভার আর কোন প্রমাণ না পাইয়া একটু আশ্চর্য্যই হইয়াছিলাম। ফণীবাবুর এই একটি কথায় তদ্দণ্ডেই আমার মনোভাব বদলাইয়া গেল—'যমুনা'র গল্পগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। ঘরে আসিয়া প্রথমেই হাতে পড়িল—'যমুনা' নয়, একখণ্ড 'ভারতবর্ষ' ; বেশ মনে আছে, সেখানি সেই বৎসরের মাঘ-সংখ্যা, তাহাতে সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামধারী অখ্যাতনামা লেখকেরই 'বিরাজ বৌ' নামে একটি গল্প শেষ হইয়াছে—পৌষ-সংখ্যায় তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাহা পড়ি নাই ; বাজে গল্প তো কতই বাহির হয়, বাংলা মাসিকের তাহাই প্রধান উপজীব্য। ভাগ্যে গল্পটি সমাপ্ত হইয়াছিল, তাই 'ভারতবর্ষে'র সেই গল্পটিই পড়িতে বসিলাম। পড়িবার কালে ও পড়া শেষ হইলে, আমার মনের অবস্থা যাহা হইয়াছিল, তাহা আপনারা কোনমতেই কল্পনা করিতে পারিবেন না ; কারণ আপনাদের সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় এমন অবস্থায় এভাবে হয় নাই। তথাপি আপনারা ভাবিয়া দেখুন, এত বড় সুগভীর অনুভূতিসম্পন্ন একজন লেখক—তাঁহার সেই অনবদ্য লিপিকৌশল লইয়া অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্যের সেই প্রায় গতানুগতিকতা-ক্লিষ্ট সমতল পথে সহসা আবির্ভূত হইলেন! —ইহার পূর্ব্বে সেই আবির্ভাবের কিছুমাত্র সূচনা বা প্রত্যাশা ছিল না ; এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। এই কারণ ছাড়া বিস্ময়ের অন্য কারণও ছিল। 'বিরাজ বৌ' পড়িয়া সেই প্রথম উপলব্ধি করিলাম যে, কাব্যের উৎকর্ষের জন্য বাস্তবকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করিতে

হয় না—বুঝিলাম যে, হৃদয়বৃত্তির সহিত যদি কবি-শক্তির মিলন হয়, তবে উৎকৃষ্ট কাব্যরস আস্বাদনের জন্য এই মানব-মানবীর সংসার হইতে দূরে কোনও ভাব-বৃন্দাবন গড়িয়া লইতে হয় না। কিন্তু কেবল সাহিত্যিক তত্ত্বই নয়, আরও একটা সত্য তখন আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম; আমাদের সংসারে, বাঙালীর ঘরে, নারীর যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা একই কালে অপূর্ব্ব ও অতি-পরিচিত বলিয়া মনে হইল। আজন্ম যাহাদিগের সহিত নানা সম্পর্কে, নানা ব্যবহারে নিত্য-পরিচয়ের একটা অভ্যস্ত সংস্কারমাত্র গড়িয়া উঠিয়াছে; নারীর যে প্রকৃতি সম্বন্ধে কাব্যে উপন্যাসে ছাড়া আর কোথাও চিত্তচমৎকারের প্রশ্রয় দিই নাই, আজ তাহার সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন হইয়া উঠিলাম। রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্যে কতকটা অলৌকিক ও অতিমানুষ পরিবেশের মধ্যে, যে দুই চারিটি নারী-চরিত্রের বিস্ময়জনক চিত্র, অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে ভারতীয় নারী-প্রকৃতির ক্ষণস্ফূর্ত্ত মহিমার যে প্রকাশ ক্বচিৎ চিত্তগোচর হইয়াছে, তাহাই বাংলার পল্লী-গৃহে, সমাজে ও পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে যে এমন শক্তির আধার হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা এমন করিয়া দেখানো এবং বিশ্বাস করানো ইতিপূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে ঘটে নাই। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' পড়িয়াই শরৎপ্রতিভার সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাই শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে 'বিরাজ বৌ' আমার মনে একটু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙালীর দাম্পত্য-প্রেমকে,—আমাদের সেই হিন্দু আচার ও সংস্কার-বন্ধনের মধ্যেই ব্যক্তি-চেতনার এক অতি প্রবল গভীর উন্মেষকে, মানব-ভাগ্যের এমন মহনীয় ট্র্যাজেডির দ্বারা মণ্ডিত করা—বাঙালী-প্রাণের বৃন্দাবনী গাথায় এমন আকাশভাঙা

বজ্রঝঞ্ঝাধ্বনি মিলাইয়া দেওয়া, আমার নিজস্ব রসবোধ ও কাব্য-সংস্কারকে চরিতার্থ করিয়াছিল।

ইহার পর 'যমুনা'য় প্রকাশিত গল্পগুলি পড়িলাম—পরিচয় আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিল; এবং লেখার মধ্যে লেখকের যে আন্তরিকতা সংক্রামক হইয়া পাঠককে আচ্ছন্ন করে, শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির সেই ব্যক্তিগত আকর্ষণ আমাকে লেখকের ব্যক্তি-পরিচয় পাইবার জন্য অধীর করিয়া তুলিল। আমি শরৎচন্দ্রের জীবনেতিহাস জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

এই সময়ে সেকালের একজন পুণ্যচরিত সাধকপ্রকৃতি সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়—তাঁহার নাম কুমুদনাথ লাহিড়ী। তিনি বলিলেন, রেঙ্গুনে অবস্থানকালে তিনি শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু শরৎচন্দ্রের সে পরিচয় আমার স্বপ্ন সফল করিবে না, হয়তো আমাকে আঘাত করিবে, আমার সাহিত্যিক আবেগ ও উৎসাহ তাহাতে বাধা পাইতে পারে; কারণ, আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা অল্প—মানুষকে ঠিক-মত বিচার করিবার বুদ্ধি তখনও আমার না হইবারই কথা। তথাপি নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া তিনি যেটুকু সংবাদ দিলেন, তাহাতে ইহাই বুঝিলাম যে, এ মানুষ যদি শক্তিমান হয়, তবে সাধারণ চরিত্র-নীতি বা সমাজ-নীতির মানদণ্ডে ইহাকে মাপিয়া লওয়া যাইবে না। সংস্কারে আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু বিশ্বাস হারাইলাম না, মনে একটা বিস্ময়-বোধ রহিয়া গেল।

ইহার পর সরকারী চাকুরি উপলক্ষ্যে আমি কিছুকাল কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম—সাহিত্যিক-সমাজ ও তাহার নিত্যকার সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। তথাপি শরৎচন্দ্রই সে সময়ে

আমার সাহিত্যিক মনের অনেকখানি অধিকার করিয়া রহিলেন। অতঃপর রেঙ্গুন-প্রবাসী আমার এক বন্ধুকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে যাহা পাইলাম, তাহা এই।—রেঙ্গুনের বাঙালী-সমাজে শরৎচন্দ্র অপরিচিত নহেন, কিন্তু সাহিত্যিক বলিয়া কোন খ্যাতি তাঁহার নাই। আমার বন্ধুর এক দাদা সেখানে ডাক্তারি করেন, শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে; সেই পরিচয়সূত্রে আমার বন্ধু এইটুকু মাত্র জানেন যে, শরৎচন্দ্র একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, সাধারণ গৃহস্থ লোক নহেন—পশু পক্ষী লইয়াই তাঁহার সংসার। আমার 'হিরো'র সম্বন্ধে একটা খবর এই যে, একদা তাঁহার একটি পোষা পাখি যখন মরিয়া যায়, তখন তাঁহার এমনই শোক হইয়াছিল যে, তাহার পায়ে যে সোনার শিকলি ছিল, অন্ত্যেষ্টিকালে তাহা তিনি খুলিয়া লইতে পারেন নাই।

ইহার পর শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' পড়িলাম, এবং পাঠকালে এমন এক রসিক সহপাঠী পাইয়াছিলাম যে, পাঠের আনন্দ ও রসাস্বাদনে উভয়ের সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজও ভুলি নাই। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের কাছারি-সংশ্লিষ্ট ডাক্তারখানার ডাক্তার। বাঙালী অনেক ডাক্তার শুধু সাহিত্যরসিক নয়, সাহিত্যরসের স্রষ্টা হিসাবেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের যে বিশেষ রস, যাহার জন্য সাহিত্যজ্ঞান অপেক্ষা গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন, তাহা এই ব্যক্তির মধ্যে যেমন আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহা হয়তো অনেকেরই আছে, কিন্তু সাহিত্যিক-সমাজে সকলের তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না; আমি অন্তত সে বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলাম। ভদ্রলোক বাংলা কবিতার উৎকৃষ্ট পংক্তি যেমন আবৃত্তি করিতে পারিতেন, তেমনই

গল্প-উপন্যাসের রসবোধও তাঁহার অভ্রান্ত ছিল। তিনিও শরৎচন্দ্রের নাম শুনেন নাই, আমার প্রশংসা অতিরিক্ত মনে করিয়া তাহা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য 'পল্লীসমাজ' পড়িতে বসিলেন। রাত্রে দুইজনে এক ঘরে শুইয়াছি—বাহিরে অনতিদূরে বাতাসে পদ্মার জলোচ্ছ্বাস শোনা যাইতেছে। আমি বইখানি আগেই পড়িয়াছিলাম। পাশের খাটে শিয়রে বাতি জ্বালাইয়া তিনি নীরবে পাতা উল্টাইতেছেন, আমি তাঁহার ভাবখানা লক্ষ্য করিতেছি—যেন জেদ করিয়া একটা অবজ্ঞার ভাব রক্ষা করিতে হইবে, দুই একটা মন্তব্যও হইতেছে, কিন্তু শেষে একেবারে মগ্নভাব—বাক্যস্ফূর্ত্তির আর অবকাশ নাই। আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম। এক সময় গভীর রাত্রে তিনি আমার শয্যাপার্শ্বে কি একটা খুঁজিবার অছিলায় আমার ঘুম ভাঙাইয়া দিলেন। দেখিলাম, বই বন্ধ করিয়াছেন—অন্তরের ভাবাবেগ একটু প্রকাশ না করিয়া আর যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিলেন না, কিছুক্ষণ পরে আবার পড়িতে লাগিলেন। সকালে উঠিয়া শুনিলাম, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বইখানি শেষ করিয়াছেন; তারপর আমার সঙ্গে সে কি আলোচনা! এমন করিয়া সাহিত্যরস ভাগ করিয়া ভোগ, আমি জীবনে আর কখনও করি নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে বিশেষ রস আছে, তাহা কত অরসিককেও রসিক করিয়া তুলিয়াছে—রসিকের তো কথাই নাই। সাহিত্যরসের আস্বাদনে সেই যে সমপ্রাণতার আনন্দ পাইয়াছিলাম, এবং সাহিত্যিক অভিমানবর্জ্জিত একজন সহজ-রসিকের নিকটে সেদিন মনে মনে যে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহী যে সাহিত্য তাহার বিচারে কেবল মার্জ্জিত মনোবৃত্তি বা আর্টের জ্ঞানই যথেষ্ট

নয়—সহজ ও স্বাভাবিক রস-সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে। ইহাকেই আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে 'প্রাক্তন সংস্কার' বা 'বাসনা' নাম দেওয়া হইয়াছে।

২

ইহার কিছুদিন পরে একবার ছুটিতে কলিকাতায় অবস্থানকালে হঠাৎ শরৎচন্দ্রকে দেখিলাম। সেই প্রথম সাক্ষাতের সব কথাই মনে আছে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের একটা দোকানঘরের উপরে তখন 'যমুনা'-আফিস, একখানি ঘর ও তাহার কোলেই একটু ছাদ—উপরতলার এই ক্ষুদ্র অংশমাত্র 'যমুনা'র অধিকারে ছিল; ঘরে আফিস, ও বাহিরে ছাদে ফরাশ পাতিয়া বৈঠক বসিত। সেদিন বেলা দুই-তিনটার সময়েই শরৎচন্দ্র আসিয়াছিলেন, আমিও সংবাদ পাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র একখানি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছেন, একটু রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি—খাঁটি দেশী চেহারা। কিছু পরে রাস্তার ওপারের দোকান হইতে চা ও চপ আসিল। দেখিলাম, একটি কুকুর শরৎচন্দ্রের হাঁটুর উপরে দুই পা রাখিয়া তাঁহার হাতের ডিশ হইতে চা খাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে চপের টুকরাও সাগ্রহে ভোজন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 'ভারতী'-সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়াছেন—তিনি কুকুরকে এরূপ ঘৃতপক্ক আহার্য্য দেওয়ার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার কুকুরের এই কুপথ্য-প্রীতির অপরাধ গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন না। সস্নেহে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও বড় একা বোধ করে, ওর জন্যে একটি ভাল সঙ্গিনী

খুঁজিতেছি—একটা পাওয়া যায় না?” বেলা পড়িয়া আসিলে বাহিরের ছাদে ফরাশ পাতিয়া বৈঠক বসিল, আরও দুই-চারিজন আসিলেন। একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শরৎচন্দ্র গল্প করিতে লাগিলেন। সাহিত্যের আলোচনা চলিল। ‘সবুজ পত্রে’ সদ্যপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প—‘শেষের রাত্রি’ সম্বন্ধে মণিলালবাবুর সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হইল, তিনি ওই গল্পের নায়িকার চরিত্র কিছুতেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিলেন না; বাঙালীর মেয়ে ঐ বয়সেও এরূপ হৃদয়হীনা হইতে পারে না, ইহা তিনি জোর করিয়া বলিলেন—উহাতে বিশুদ্ধ ভাব-কল্পনার আর্ট যতই থাকুক, জীবনের সত্য নাই। আমি এই মন্তব্যের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণার বৈশিষ্ট্য অতিশয় কৌতূহল সহকারে লক্ষ্য করিলাম। গল্প চলিতেছে, এমন সময় একটা মহাবিভ্রাট ঘটিয়া গেল। বাড়ির ভিতরকার উঠান হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ঐ ছাদে আসিবার পথটি বড়ই সঙ্কীর্ণ; সরু বারান্দা, তাহাতে রেলিং নাই—সাবধানে চলিতে হয়; তখন একটু অন্ধকার হইয়াছে, সেই অন্ধকারে সেইখান হইতে একটা আতঙ্কের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। এক ব্যক্তি সেই পথ দিয়া আসিবার কালে অস্পষ্ট আলোকে হঠাৎ একটি জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রায় নীচে পড়িয়া যাইতে যাইতে কোনক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে। জন্তুটি আর কেহ নয়, শরৎচন্দ্রের সেই কুকুর—সে সহসা সেই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথে আবির্ভূত হইয়া, দুই পায়ের উপরে দাঁড়াইয়া, আগন্তুককে অপর দুই পায়ের দ্বারা আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিল—তাহাতেই এই বিভ্রাট। শরৎচন্দ্র ক্রোধভরে (ক্রোধটা নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির উপরে) কুকুরকে একটি চপেটাঘাত করিলেন, সে দূরে এক কোণে ম্লানমুখে বসিয়া রহিল। শরৎচন্দ্রও তারপর একেবারে

মৌন অবলম্বন করিলেন। গল্প আর জমিল না; শেষে হাওয়াটা একটু হালকা হইল মাত্র। কিছুক্ষণ পরে অভিমানী কুকুরকে ডাকিয়া তাহার গালে পিঠে হাত বুলাইয়া বড়ই দুঃখভরে শরৎচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "কেন অমন করিস বল্ দেখি? রীতের দোষেই তো মার খাস!" সে কোলের কাছে আরও ঘেঁষিয়া আসিল, শরৎচন্দ্র যেন কিছু সুস্থ বোধ করিলেন।

ইহার পর অনেকবার তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে—পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। 'ভারতী'র বৈঠকে তিনি প্রায় আসিতেন। সেইখানে তাঁহার কথা শুনিবার ও নানা বিষয়ে তাঁহার মতামত ও মনোভাব জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। তাঁহার কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা যে জিনিসটি বিশেষ করিয়া মনকে স্পর্শ করিত, তাহা পাণ্ডিত্য বা সূক্ষ্ম বিচারশক্তি নয়—জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার ফলে একটা অতিশয় সহজ ও সুদৃঢ় প্রত্যয়; তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার নির্য্যাস নয়, প্রত্যক্ষদর্শনের নিঃসংশয় ধারণা। তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন মৃদু অথচ দৃঢ় ছিল, এবং কথার ভাষা এমন পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুট ও প্রাণময় ছিল যে, তাহা আর কোন ভাষায় উদ্ধৃত করা যায় না। তাঁহার উপন্যাসের ভাষায় যে যত্নকৃত পারিপাট্য—ভাবের অব্যর্থ প্রকাশের দিকে যে সতর্ক দৃষ্টি আছে, যাহার জন্য তাঁহার রচনা এত হৃদয়গ্রাহী, তাহা হইতেও স্বতন্ত্র একটি গুণ তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনায়, গল্প বলিবার ভঙ্গিতে বিদ্যমান ছিল। যেন লেখার মধ্যে আর্টের সূক্ষ্ম আবরণে মানুষটির একটা পরিচয় পাই; কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপের উপযুক্ত অবসরে, কোনও গুরুতর প্রসঙ্গের অবতারণায়, তাঁহার অন্তরের পরিচয় আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠে; এবং সেই কারণে, তাঁহার রচনাবলীর ভাষ্যরূপে

তাহা যেন শ্রোতার পক্ষে আরও মূল্যবান। সেই সকল আলাপের যতটুকু শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল—সে ভাষা ও ভঙ্গি অনুসরণ করা দুঃসাধ্য হইলেও—আমি আজ তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'ভারতী'র বৈঠকে শরৎচন্দ্রের আলাপ শুনিয়াছি; আবার পৃথক একা অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ একাধিকবার ঘটিয়াছে। বৈঠকী আলাপে বাহিরের মানুষটিকে একরূপ দেখিবার ও চিনিবার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ভিতরের মানুষকে খুব অন্তরঙ্গভাবে জানিবার সুযোগ হয় না। তথাপি, 'ভারতী'র বন্ধুসভায় একবার তাঁহার মুখে যে কয়েকটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা শরৎচন্দ্রের রচনাগুলির একটি প্রধান প্রেরণা সম্বন্ধে খুবই মূল্যবান। কথা হইতেছিল মেয়েদের লইয়া। এক সময় মণিলাল সেই আলোচনায় যোগ দিয়া নারীদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও কোমলতা সম্বন্ধে একটা কি মন্তব্য করিলেন। শরৎচন্দ্র এতক্ষণ একখানি শোয়া-চেয়ারে অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে পড়িয়া ছিলেন—হঠাৎ সকলকে চমকাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বললে মণিলাল? মেয়েরা বড় দুর্ব্বল? তোমরা তো মেয়েদের আসল মূর্ত্তি দেখ নি, শহরের বাবু-মেয়েই দেখেছ। একটা মেয়েমানুষ যে পরিমাণ মার খেয়ে হজম করতে পারে, পুরুষমানুষ তার সিকিও হজম করতে পারে না।" তারপর তিনি মেয়েদের সঙ্গে অন্য অনেক বিষয়ে পাল্লা দিয়া হারিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন, তাহার সব ভদ্রসমাজে বলিবার মত সাহস আমার নাই। শেষে যাহা বলিলেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেকালের বাঙালীর মেয়ে যে বয়সে শ্বশুরঘর করিতে যাইত, এবং সেখানে সেই অপরিচিত পরিবারের মধ্যে, অনেক সময়ে স্নেহলেশহীন ব্যবহার সহ্য করিয়া, তাহাকে যে ভাবে সেই সংসারে নিজের

স্থান করিয়া লইতে হইত, তাহা ভাবিতেও সেই বয়সের কোনও বালকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। আজিও যাঁহারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে বহুসন্তানবতী জননী, তাঁহারা দিনে বিশ্রাম ও রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া—সারা বৎসর ঘরের নিত্যকর্ম্ম, শিশুপালন ও রোগীর সেবা ভগ্নদেহে অর্দ্ধাহারে করিয়া চলিতে থাকেন ; একদিন ছুটি নাই, একটা রবিবারও নাই। মোটের উপর, মেয়েদের সম্বন্ধে একটা অতিশয় সত্য কথা—নিত্য অভিজ্ঞতার বাহিরে ও ভিতরে—দুই রূপেই, তিনি এমন করিয়া আমাদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন, যাহা আমরা উচ্চ সাহিত্যিক-ভাবমার্গে বিচরণ করিয়া সর্ব্বদা বিস্মৃত হইয়া থাকি। আমার মনে আছে—এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে আমার একটি পুঁথি-পড়া বাক্য মনে পড়িয়াছিল। আমি সেই সভায় তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। কথাটি এই—"Woman pays the debt of life not by what she does but by what she suffers"। সেদিন শরৎচন্দ্রের মধ্যে 'বিরাজ বৌ'-এর লেখককে দেখিয়াছিলাম।

সেই দিন, কি আর একদিন, মনে নাই, শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ বচনভঙ্গি সহকারে একটা সামান্য কথার উপলক্ষ্যে এমন একটি সত্যের ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে তাঁহার নিজের সমগ্র জীবনের আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মণিলাল নিতান্ত লঘুভাবে বলিতেছিলেন যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি খাঁটি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে পারিলেন না ; অর্থাৎ সমাজ ও পরিবারের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জীবনকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া তুলিতে পারিলেন না। শরৎচন্দ্র তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি মনে কর, সেটা

এতই সহজ, মণিলাল! তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে—যা চারিদিকে ঘটছে, যা হবার জন্যে কোন চেষ্টাই করতে হয় না, বরং যার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই মানুষকে কত শাসন মেনে চলতে হয়—তুমি তাই চেষ্টা ক'রেও হতে পার নি, তাই বড় আশ্চর্য্য হয়েছ? কিন্তু একটি কথা জেনে রেখো, সত্যিকার ব'খে যেতে পারা যার-তার সাধ্য নয়—সে শক্তি খুব কম লোকেরই আছে, সে বড় ভাগ্যের কথা।"

সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা সুরক্ষিত, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য-মর্য্যাদার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত অতিশয় ভদ্র ও সভ্য যে জীবন, তাহার তুলনায় তাহারই বিপরীত এই যে আর এক জীবন, যাহার সম্বন্ধে ভাবিতেও আমরা শিহরিয়া উঠি—আমাদের আজন্ম বা জন্মান্তরীণ সংস্কার বিদ্রোহ করে, তাহারই আদর্শকে শরৎচন্দ্র কোন্ অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার বলে এত উচ্চে তুলিয়া ধরিলেন? সেও যেন একটা সাধনা, তাহাতেও সিদ্ধিলাভ একটা বড় পুরুষার্থ। এ যেন আমাদের দেশের তান্ত্রিক সাধকের কথা। সেদিন সেই ক্ষুদ্র আলোচনার অবকাশে আমি চকিতে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যিক সাধনার মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম—বুঝিয়াছিলাম, এই প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছে এক প্রকার তান্ত্রিক চিত্তবৃত্তির বশে; শরৎ-সাহিত্যে যে খাঁটি বাঙালী প্রতিভার একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে বাঙালী জাতির হৃদয়যন্ত্রের একটা বড় তার বাজিয়া উঠিয়াছে, সে প্রতিভার মূল অতি গভীর; তাহা বাঙালীর একটা রক্তগত সংস্কারের ফল। জাতীয় সাধনার সে ইতিহাস আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই শরৎ-সাহিত্যের বিচারে অতি-আধুনিক বিদেশী সমাজতন্ত্রের অতিশয় অগভীর দুই একটা তত্ত্বের আশ্রয় লইয়া থাকি। কিন্তু এ কথা পরে।

ইহার পর একবার শিবপুরের বাসাবাড়িতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার কথা মনে আছে। তখন সাহিত্যের আদর্শ লইয়া সাময়িক-সাহিত্যে একটা বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল; রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ নব্যদলের দলপতিগণের ভাল লাগে নাই। শরৎচন্দ্রও ইহাতে যোগ দিয়েছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত হইতে না পারা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, তিনি বিচারশক্তি অপেক্ষা ভাবানুভূতির উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। এই বাদপ্রতিবাদ হইতে দূরে থাকিলেও, আমি এই সময়ে তখনকার এক প্রধান সাপ্তাহিক-পত্রিকায় কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্রের সহিত আলাপে আমি তাঁহার লিখিত প্রতিবাদ সম্বন্ধে খোলাখুলি আমার মত প্রকাশ করিয়াছিলাম; এবং ইহাও বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সমালোচনা-শক্তির অনুকূল নয়; অনুভূতির দিক দিয়া তিনি সাহিত্যের বিষয় ও প্রেরণা সম্বন্ধে খুব সত্য ও গভীর কথা—সূক্ষ্ম যুক্তি-বিচার না মানিয়াও বলিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা কবিরই মত, সমালোচকের মত নয়; এজন্য কোনরূপ রীতিমত বিতর্কে পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমি এ কথা তাঁহাকে নিঃসংকোচে বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কোন প্রতিবাদ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। আমার বেশ মনে আছে, ঐ আলোচনার প্রসঙ্গেই তিনি এমন দুই-একজন লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁহার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—এমন কি একজনকে তাঁহার অপেক্ষা বড় লেখক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। আপনাকে আপনি দেখিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না; তাঁহার সৃষ্ট মানব-মানবী সম্বন্ধে তাঁহার যেমন কোন

সংশয় ছিল না, তেমনই, তাহাদের স্রষ্টার সম্বন্ধে তাঁহার কোন সুদৃঢ় ধারণা ছিল না, নিজের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি আত্মসচেতন ছিলেন না; তাই নানা ভক্তের দল তাঁহাকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারিত। তিনি জীবনকে যেমন বুঝিতেন, আর্টকে তেমন বুঝিতেন না—নিজে বড় আর্টিস্ট ছিলেন, নিজের রচনাকার্য্য সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলেন—কিন্তু ক্রিটিক ছিলেন না; আপনার দেখা বস্তুকে রূপ দিতে পারিতেন, কিন্তু পরের দেখা বস্তুর রূপ অর্থাৎ পরের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সজাগ ছিল না। তাঁহার সাহিত্যিক প্রকৃতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক বটে, তথাপি চিত্তের গঠনে এই ত্রুটি থাকায় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনে কিছু ক্ষতিও হইয়াছিল।

৩

ইহার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎকালে তাঁহার মুখে প্রসঙ্গক্রমে যে একটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অনেকের পক্ষে চমকপ্রদ মনে হইবে—তৎকালে আমারও হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, নারীজাতির প্রতি তাঁহার কি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল—তাঁহার উপন্যাসে এই নারীই বাঙালীর চক্ষে এক নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেদিন, স্ত্রী-পুরুষঘটিত ব্যভিচারের একটি কাহিনী শুনিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নয়। পূর্ব্বে নারীর শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা সেই পূর্ব্বের উক্তির বিরোধী বলিয়াই সহসা মনে হইবে; অথবা, তাহাকে সেই উক্তির

পরিপূরক বলিয়াই বুঝিয়া লওয়া উচিত। সেই কাহিনী শুনিয়া তিনি অতিশয় অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ও জাত সব পারে, উহার পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব কিছুই নাই!"—বলিয়া তাঁহার নিজের দেখা একটা ঘটনা বিবৃত করিলেন, একবার কোন একটি ভদ্রবংশের বয়স্ক মহিলা অতিশয় নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়পারবশ্যের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই সবিস্তারে বলিলেন—সেই গল্পটি প্রকাশ করায় বাধা আছে বলিয়াই করিতে পারিলাম না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহা সাধারণ দুশ্চরিত্রতার কথা নয়—যে অবস্থায় ও যে ভাবে এই স্ত্রীলোক অতিশয় প্রকাশ্যে আপনার সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহার জাতি কুল নারীত্ব ও মাতৃত্ব—সকল সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে এই প্রশ্নই জাগে যে, জীবপ্রসূতি সর্ব্বংসহা যে নারী, তাহার পক্ষে ইহাও সম্ভব হয় কি করিয়া? যেন সৃষ্টির একটা অতি দুর্ব্বোধ্য ও ভীতিপ্রদ নিয়মের লীলা, এইরূপ নারী-চরিত্রে ক্বচিৎ কখনও উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। এই গল্প বলিবার সময়ে শরৎচন্দ্রকে অতিশয় নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইয়াছিল; তিনি যেন অকম্পিত হৃদয়ে দৃঢ় দৃষ্টিতে একটা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—তাঁহার কোন ভয় নাই, দুঃখ নাই। আবার তাঁহার মধ্যে সেই শবসাধক তান্ত্রিকের বংশধরকে দেখিলাম। সেদিন যাহা ভাল করিয়া বুঝি নাই, আজ তাহা বুঝিতে পারি। এই মানুষ আমাদের এই সমাজ ও জীবনের গণ্ডিতেই সর্ব্বসংস্কারমুক্তির সাধনা করিয়াছিলেন—এ সমাজের সংস্কারবন্ধন বড় দৃঢ় বলিয়াই সেই সাধনায় শক্তিবিকাশের সুবিধা হইয়াছিল। তান্ত্রিক শক্তিকে উপলব্ধি করিতে চায় ভীষণের মধ্যে, দলিত মথিত হৃৎপিণ্ডের উপরেই শক্তির পদ্মাসন গড়িয়া তোলে। আমাদের এই হীনবীর্য্য পুরুষের সমাজে

নারীই শক্তির আধার হইতে বাধ্য। ক্ষীণ বলিয়াই নিষ্করুণ যে নর, তাহার অত্যাচারে আমাদের দেশের মেয়েদের দেহে মনে ও প্রাণে এমন একটা সংযম-সহিষ্ণুতার বিকাশ হয়, যাহা অবস্থাবিশেষে অমানুষী শক্তির আকার ধারণ করে। নারীর মধ্যে এই শক্তির নানা রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন—সাহিত্যে তাহার সব প্রকাশযোগ্য নয়; জীবনের সত্য ও আর্টের সঙ্গতি—এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিবেই। এই অস্বাভাবিক অবস্থার পীড়নে নারী ক্রমাগত আত্মসঙ্কোচ করে—সেই আত্মসঙ্কোচের দ্বারাই তাহার সকল বৃত্তি একমুখী হইয়া যে বজ্রগর্ভ তাড়িৎ উৎপন্ন করে, তাহার আঘাতে মৃত্যু, ও আলোকে অমৃত লাভ হয়। এক দিকে সেই শক্তিই যেমন সৃষ্টিকে রক্ষা করে—তাহাকে পূর্ণ করিয়া তোলে, তেমনই, অপর দিকে তাহাকে শূন্য করিয়া দেয়। নারীর সেই শক্তি যেন একটা অবোধ প্রাণশক্তি—তাহার সেই চরম স্ফূর্তির অবস্থায়—ত্যাগে ও ভোগে, প্রেমে ও অপ্রেমে—মনের কোন হিসাব-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। সে যেন একটা elemental, বা অন্ধ জড়শক্তির লীলা; তাই বুদ্ধিজীবী পুরুষ তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। কিন্তু সেই শক্তির এক দিক—আত্মত্যাগের দিক—সৃষ্টির সহায়তা করে বলিয়া, সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর বলিয়া, পুরুষচিত্ত মুগ্ধ হয়; তাহার জীবনের সেই ট্র্যাজেডি আমাদের মনে এক অপরূপ মহিমাবোধ উদ্রিক্ত করে। শরৎচন্দ্রের হৃদয় স্বভাবত এই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। তথাপি অতি গভীর সহানুভূতি ও অপরিসীম সাহসের বলে তিনি নারী-চরিত্রে এই শক্তির মূল লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহা এক দিকে অমানুষী কাম, ও অপর দিকে অমানুষী প্রেমরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা যে মূলে একই—

যে প্রেম বিনা চিন্তায় আত্মবিসর্জ্জন করে, এবং যে কাম ঘৃণা লজ্জা ভয় স্নেহ মমতা প্রভৃতি সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত—সেই উভয়ের মূলে যে একই তত্ত্ব আছে, তান্ত্রিক সাধক তাহাকে উপলব্ধি করিয়া অভয় হইতে চায়। শরৎচন্দ্রও যে পথে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই তত্ত্বের আভাস তিনিও পাইয়াছিলেন—তাই নারী-চরিত্রের অন্তস্তলে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু তান্ত্রিকের শক্তিসাধনার যে আদর্শ, তাঁহার অতি কোমল স্পর্শকাতর হৃদয় তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল—সেই তত্ত্বকে স্বীকার করিলেও এবং তদ্দ্বারা নারী-চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ হইলেও, সেই জ্ঞান তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

তাই যখন সেই নারীজাতির সম্বন্ধে তাঁহার মুখে শুনিলাম, "ও জাতের কথা ব'ল না, ওরা পারে না এমন কাজ জগতে নেই!" তখন তাঁহার মত নারী-মহিমার উপাসক এই কথায় নারীকে গালি দিতেছিলেন, না, শক্তিসাধক তাহার ইষ্টদেবতার স্বরূপ দর্শন করিয়া দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যে আর্ত্ত চীৎকার করে, শরৎচন্দ্রও এখানে তাহাই করিতেছিলেন? সেদিন তাঁহার মুখে যে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, আজ তাহার গভীরতর কারণ সন্ধান করিয়া সেই বিরোধের সমাধান করিতে চাই। মনে হয়, তিনি মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে যে দিক দিয়া অনুধাবন করিয়াছিলেন, এবং আমাদের সমাজে তাহার যে চূড়ান্ত লীলা দেখিয়াছিলেন নারীর জীবনে—তাহার পরে আর অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই। তাঁহার সাধনায় তান্ত্রিকের মনোভাব থাকিলেও তাহা প্রেমের সাধনা, জ্ঞানের নয়। এই দুইকে যদি তিনি সাহিত্যসাধনায় মিলাইতে পারিতেন—আর কিছু না হউক, যদি তাঁহার সেই আশ্চর্য্য

ভাবকল্পনা ও অনুভূতিশক্তির উপরে জ্ঞানের কঠোর শাসন কিছু থাকিত, তবে বাংলা সাহিত্যে খুব বড় ও পূর্ণতর বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু তাহা ছিল না বলিয়া আমরা আর্টিস্ট শরৎচন্দ্র অপেক্ষা মানুষ শরৎচন্দ্রের দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হই, এবং তাঁহার রচিত সাহিত্যের রসসৌন্দর্য্যের মূলে একটা মানুষের জাগ্রত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি শুনিয়া আশ্বস্ত ও পুলকিত হই। এই জ্ঞানের দিক—তান্ত্রিক সাধনার সেই তত্ত্বদৃষ্টি—তাঁহার বুদ্ধিকে যে এড়ায় নাই, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; বরং ইহাই যে শেষে তাঁহার উপরে কতক পরিমাণে আধিপত্য করিয়াছিল—তাঁহার ভাবজীবন বা কবিজীবনকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার 'শেষ প্রশ্ন' নামক উপন্যাসে স্পষ্ট পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেখানে ভাবদৃষ্টি ও জ্ঞানদৃষ্টির সমন্বয় হয় নাই—সাহিত্যসৃষ্টিতে তাহা সার্থক হইয়া উঠে নাই।

শরৎচন্দ্রের হৃদয় যে কত কোমল—তাঁহার অনুভূতিশক্তি যে কত অসাধারণ ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনাগুলিতে সর্ব্বত্র উজ্জ্বল হইয়া আছে। শরৎচন্দ্র চিন্তা করিতেন হৃদয় দিয়া—মস্তিষ্ক দিয়া নহে; যাহাকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলা যায়, তাহাই ছিল তাঁহার কল্পনা ও জ্ঞানবৃত্তির সহায়। সেই প্রবল সেন্টিমেণ্টযুক্ত সহানুভূতিই যেমন এক দিকে তাঁহার প্রতিভার শক্তি, তেমনই অপর দিকে তাঁহার অশক্তির কারণও তাহাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আসিয়াছিল যে মানবতার প্রেরণায়—তাহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস হইতেই মানুষের জীবনকে এক নূতন আদর্শবাদের দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছিল। সেই আদর্শবাদ ভাবকল্পনার রসেই পুষ্ট হইয়াছিল, তাহা বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সত্যকেই ধরিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ভাব

বা আইডিয়া হইতে নামিয়া মানুষের বুকে কান রাখিয়া তাহার বাস্তব হৃদয়স্পন্দন শুনিবার কৌতূহল সেযুগে কাহারও হয় নাই—মানবতার সেই একান্ত স্নায়ুশিরাশোণিতময় অনুভূতি কাহারও সাধনার বস্তু হয় নাই। মানুষকে—কোন তত্ত্ব, ধর্ম্ম, বা নীতিসংস্কারের দ্বারা নয়—কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার প্রাণের আকুতিকেই আর সকল সত্য অপেক্ষা বড় বলিয়া ঘোষণা করার যে মানবতা, বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। এই মানবতার সাধনা তাঁহার জীবনেই হইয়াছিল—ভাব বা কল্পনাযোগে নয়; সেইজন্যই তাঁহার সাধনাকে তান্ত্রিক সাধনা বলিয়াছি। রক্ত-মাংস-শিরা-শোণিতের মধ্য দিয়া যে উপলব্ধি, তাহাই তান্ত্রিক সাধনা—অপর সাধনার নাম যোগ-সাধনা, তাহা অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয়; অতি সূক্ষ্ম মানস-সাধনাও তাহাই। এইজন্য যোগী ও তান্ত্রিকের মধ্যে এত বিরোধ। এই যে দেহ দিয়া, বাস্তব হৃদয়বেদনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি, ইহার জন্য দেহের শক্তি চাই—স্নায়ুশিরার অসহ্য পীড়ন সহ্য করা চাই। শরৎচন্দ্রের এই অবস্থা একবার দেখিয়াছিলাম এবং তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, সাহিত্যে তিনি যাহা রচনা করিতেছেন, তাঁহার জীবনে তাহার উপলব্ধি হয় কোন্ প্রণালীতে। সে বার কোন এক প্রয়োজনে তাঁহার সামতাবেড়ের বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। শরৎচন্দ্রের সেই বাসস্থান দেখিলে মনে হইবে, তিনি এতদিনে মনের মত জীবন যাপন করিতেছেন। ভিতরের দিকে গৃহসংলগ্ন উদ্যানে অসংখ্য গোলাপ ফুটিতেছে, বাহিরে বাঁধের অনতিদূরে রূপনারায়ণের অকূল বিস্তার। অতিশয় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটীরূপে সাজানো ঘরখানিতে গৃহস্বামীকে দেখিয়া সানন্দে অভিবাদন করিলাম। অনেক কথা হইল,

কিন্তু কিছুর মধ্যেই যেন আগ্রহ নাই—সকলের মধ্যেই একটা গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্যের ভাব। শেষে কারণ বুঝিলাম। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়াছে—নিজেই বলিলেন, না বলিয়া পারিলেন না। কিন্তু সে ব্যথা যে ভাষায়, যে স্বরে প্রকাশ করিলেন, তাহাতে মানুষের যন্ত্রণাকে যেন চাক্ষুষ করিলাম। তাঁহার এই ভাই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ কম হইত। কিন্তু এইবার তিনি যেন মৃত্যু আসন্ন জানিয়াই শরৎচন্দ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে তাহার প্রয়োজন হয় নাই ; শেষে মরিবার জন্য আমার কোলে ফিরিয়া আসিল। তাহার সেই মৃত্যুযন্ত্রণা আমি ভুলিতে পারিব না। দুই হাতে তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া দিন ও রাত কাটাইয়াছি—আমার বুকে মাথা রাখিয়া তাহার সে কি কান্না! সে যাতনার কিছুমাত্র উপশম করিতে পারি নাই ; কেবল নিরুপায়ভাবে তাহাকে বুকে ধরিয়া বসিয়া ছিলাম, সেই একই অবস্থায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল!" ঠিক সেই কথা ও সেই কণ্ঠস্বর উদ্ধৃত করা অসম্ভব, আমি আমারই ভাষায় তাহার ভাবার্থ জ্ঞাপন করিলাম মাত্র। সেদিন সেই কয়টি কথার মধ্যে, এবং সেই শোককাতর মূর্ত্তিতে, মানুষের দেহ-প্রাণের নিয়তি-নির্য্যাতন—মনুষ্য-জন্মের অপরিহার্য্য দুঃখের স্বরূপকে যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলাম, শরৎ-সাহিত্যের মানবতার মূল উৎসের সন্ধান পাইলাম। এই মানুষের জীবন-সাধনায় তান্ত্রিকের আচার লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু যাহার হৃদয় এত দুর্ব্বল, যে জীবনকে জয় করিবার জন্য—যূপবদ্ধ পশু বা মানুষের যন্ত্রণা নির্ব্বিকারভাবে দেখা দূরে থাক—সেই যূপকাষ্ঠে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণার পরিধি নির্ণয় করে, সে তান্ত্রিক হইলেও মানবতার তান্ত্রিক,

সে শ্মশানকে গৃহপ্রাঙ্গণে আনিয়া মৃত্যুর আলোকে জীবনকেই ভাস্বর করিয়া তোলে।

৪

শরৎচন্দ্রকে শেষ দেখি ঢাকায়, ১৩৪৩ সালে। অনেক দিন পরে দেখা—ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের স্রোতোধারায় কত আবিলতা, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখা দিয়াছে—শরৎচন্দ্রকেও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই। শরৎচন্দ্রের নূতনতর রচনা, ও নূতন নূতন ভক্ত-সম্প্রদায়ের জয়ধ্বনি তাঁহার ব্যক্তি-পরিচয় ও সাহিত্যিক প্রতিভাকে আমার চক্ষে একটু ভিন্নরূপ করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের মন ও প্রাণ তাহার প্রভাবে কতখানি প্রভাবিত হইয়াছে, তাহাও জানি না; কেবল এইমাত্র জানি যে, আমাকে তিনি ভুলিয়া যান নাই—না ভুলিবার কারণও ছিল। তাই তাঁহার আহ্বানের অপেক্ষা না রাখিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় অতিথি—তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দান ব্যাপার শেষ হইয়াছে; শরীর অসুস্থ বলিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন—ঢাকা ত্যাগ করিবার তারিখ একটু পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে একটু একা পাওয়া অসম্ভব, ভিড় কিছুতেই কমে না। যেদিন কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক তাহার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কথাবার্ত্তার কোন অবকাশই পাইলাম না—কেবল দেখিলাম, নানা জন যাইতেছে ও আসিতেছে, সামাজিকতার দাবি মিটাইতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গলার বেদনা ও জ্বর তখনও আছে—পাশের টেবিলে নানা আকারের শিশি ও

যন্ত্রাদি সাজানো রহিয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, প্রকাশিতপ্রায় আমার একখানি বই প্রথম তাঁহার হাতেই উপহার দিই, কিন্তু তাহা দপ্তরীর ঘর হইতে বাহির হইতে তখনও একটু বিলম্ব আছে। আমি তাড়াতাড়ি এক খণ্ড মাত্র বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছিলাম—পরদিন প্রাতঃকালে তাহা পাইবার কথা। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, পরদিন কোন্ সময় আসিলে তাঁহার অসুবিধা হইবে না। তিনি অতিশয় আগ্রহ করিয়া আমাকে যে-কোন সময়ে আসিতে বলিলেন—যাত্রা-কালের পূর্ব্বে হইলেই চলিবে। পরদিন বেলা ৮৷৮॥ টার সময়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার ঘরখানি জনবিরল; চারুবাবু সকল দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—সকলেই বিদায় লইয়া গিয়াছে। আমি বইখানি হাতে দিয়া বসিতেই আলাপ সুরু হইল।

প্রথমেই তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা তুলিলাম। সে কথায় অতিশয় ক্লান্ত, এবং মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "মোহিত, আমি মৃত্যু কামনা করি, আমার আর এতটুকু বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।" কথাটা যেন কেমন বোধ হইল, আমি প্রতিবাদ করিলাম—মনে করিয়াছিলাম, জীবন কোন কারণে অসহ্য হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছেন; তাই বলিলাম, নিজের মৃত্যু কামনা করা ও আত্মহত্যা করা একই কাজ—তাঁহার মত লোকের মুখে এমন কথা বাহির হওয়া উচিত নয়। শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, "না, তোমার বয়সে তুমি ইহা বুঝিবে না; মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সুখ-দুঃখ সকল চেতনাই মন হইতে খসিয়া যায়, এবং জীবনকে আর তিলার্দ্ধ সহ্য করিতে পারে না। আমার তাহাই হইয়াছে। আমি দুঃখ বা সুখের কথা ভাবিতেছি না—আমি জীবন হইতে অব্যাহতি চাই মাত্র।

তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? আমি অন্যেরও এমন অবস্থা হইতে দেখিয়াছি। ছেলেবেলায় আমি আমার এক দিদির কাছে থাকিতাম। তাঁহার বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী তখন বাঁচিয়া ছিলেন; তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; শেষে কিছুকাল রোগভোগ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় রোগমুক্তি অথবা শীঘ্র মৃত্যুর আশায় হিন্দু যাহা করে, গ্রামের সকলে তাহাই করিতে পরামর্শ দিল, বলিল, 'প্রাচিত্তিরটা করিয়ে দাও, এমন ভাবে রাখা ঠিক নয়।' প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৃদ্ধার কি আনন্দ! যেন কত আশা! প্রায়শ্চিত্তের পরে কবিরাজ একদিন তাঁহার নাড়ী দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—তাঁহার জ্বর আর নাই, তিনি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। শুনিয়া বৃদ্ধার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, একটি কথা কহিলেন না। সেদিন রাত্রে একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল—আমি বাহিরের ঘরে শুইতাম, ভিতরে উঠানের দিকে বার বার একটা কিসের শব্দ হইতেছে। দরজা খুলিয়া উঠানে নামিয়া শব্দের নিকটে আসিয়া দেখি—উঠানের মাঝখানে যে ঠাকুরঘর আছে, তাহারই দুয়ারের পৈঠায় সেই বৃদ্ধা পাগলের মত আপনার মাথা ঠুকিতেছে আর বলিতেছে, 'তুমি আমাকে নেবে না—এত ক'রে ডাকছি, তবু তোমার দয়া নেই!' স্থানটা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, রাত্রে সকলে ঘুমাইলে পর সেই চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধা আপনার দেহটাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে—বড় আশায় হতাশ হইয়া তাঁহার দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়া তিনি এই কাজ করিয়াছেন। সকলকে ডাকিয়া তাঁহাকে ধুইয়া মুছিয়া ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। ইহার পর তিনি আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। সেদিন যাহা বুঝি নাই, আজ তাহা বুঝি। আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে।"

ইহার পর, দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আমার বইখানির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন—যেখানে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছি, সেইখানে চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "দেখ, লোকে বলে আমি বঙ্কিমের অনুরাগী নই—আমার যেন বঙ্কিমের প্রতি একটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে।" আমি বলিলাম, আপনার নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই—সমালোচক-হিসাবে আপনার মতামতের মূল্য যেমনই হউক, আপনাকে বুঝিবার জন্যই আপনার সরল অকপট উক্তির একটা পৃথক মূল্য অছে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণাই আমরা জানিতে চাই—সাহিত্যিক সমালোচনা হিসাবে নয়। আমি জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কবিকল্পনার যে ধর্ম্মভ্রষ্টতা আছে, তাহার একটা বড় দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী-চরিত্রের পরিণাম বঙ্কিমচন্দ্র যেমন চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই কথা বলিবামাত্র তিনি যেন পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিলেন—আমাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন, "দেখ, জীবনের সত্যকে, যত বড় কবিই হউক, লঙ্ঘন করিতে পারেন না; নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের সমাজে সংস্কারের মত বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা যে কত মিথ্যা, তাহা আমি জানি বলিয়াই কোন কবি, বিশেষ করিয়া যিনি খুব বড় কবি বলিয়াই সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহার লেখায় দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার আমি সহ্য করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে—নারীর জীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, তাহাকেই একটা কুৎসিত কলঙ্করূপে প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাতে কবিপ্রাণের মহত্ত্ব বা

কবি-কল্পনার গৌরব কোথায়? আমাদের সমাজে যে নিদারুণ অবিচার প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, সাহিত্যে যদি তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখি, তবে মানুষহিসাবে মানুষের মূল্য স্বীকার করা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর দুর্গতির কথা যখন ভাবি, তখন আমার নিরুদিদির কথা মনে হয়। সে গল্প তোমাকে বলি। নিরুদিদি ছিলেন ব্রাহ্মণের মেয়ে, বালবিধবা। বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। গ্রামে এমন সুশীলা, ধর্ম্মমতি, পরোপকারিণী, শ্রমশীলা ও কর্ম্মিষ্ঠা আর কেহ ছিল না; রোগে সেবা, দুঃখে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য, এমন কি অসময়ে দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা, তাঁহার নিকটে পায় নাই এমন পরিবার বোধ হয় সে গ্রামে একটিও ছিল না। আমার বয়স তখন অল্প, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া আমার একটা বড় উপকার হইয়াছিল—আমি একটা বড় হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এতকাল পরে, সেই বত্রিশ বৎসর বয়সে নিরুদিদির পদস্খলন হইল। গ্রামের স্টেশনের এক বিদেশী রেল-বাবু সেই আজন্ম ব্রহ্মচারিণীর কুমারীহৃদয় যে কি মন্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা সেই পাষণ্ডই জানে—যে শেষে তাঁহাকে কলঙ্কের প্রকাশ্য অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। সে অবস্থায় সচরাচর যে একমাত্র উপায়, নিরুদিদিকেও তাহাই করিতে হইল। ইহার পরে, এমন যে স্বাস্থ্য তাহা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। অবশেষে তিনি মরণাপন্ন হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, মুখে একটু জল দেওয়া তো পরের কথা, কেহ তাঁহার দুয়ার মাড়াইত না। যে সকলের সেবা করিয়াছে, যাহার যত্নে শুশ্রূষায় কত লোক মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়াছে, সে আজ একটা গৃহপালিত পশুর অধিকারেও বঞ্চিত হইল। আমাদের বাড়িতেও কড়া হুকুম ছিল,

তাঁহার কাছে কাহারও যাইবার জো ছিল না। আমি লুকাইয়া যাইতাম—মাথায় পায়ে একটু হাত বুলাইয়া দেওয়া, দুই একটা ফল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া আসা,—আমার নিজের অসুখ হইলে, রোগীর পথ্যরূপে যাহা পাইতাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তাঁহার জন্য লইয়া যাওয়া—ইহাই ছিল আমার যথাসাধ্য সেবা। কিন্তু সেই অবস্থাতেও, মানুষের হাতে এই পৈশাচিক শাস্তি পাইয়াও, তাঁহার মুখে কোনও অভিযোগ অনুযোগ শুনি নাই; তাঁহার নিজেরই লজ্জা ও সঙ্কোচের অবধি ছিল না,—যেন তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহার কোনও শাস্তিই অতিরিক্ত হইতে পারে না। সেদিন তাহাই দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, পরে বুঝিয়াছি, আপনার অপরাধের শাস্তি তিনি আপনিই আপনাকে দিয়াছেন—পর যেন উপলক্ষ্য মাত্র; মানুষকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন, আপনাকে ক্ষমা করেন নাই। ইহাতেও তাঁহার শাস্তির শেষ হয় নাই—তিনি যখন মরিয়া গেলেন, তখন তাঁহার শবদেহ কেহ স্পর্শ করিল না, ডোমের সাহায্যে তাহা নদীতীরের এক জঙ্গলে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল, শিয়াল কুকুরে তাহা ছিঁড়িয়া খাইল।" শরৎচন্দ্র চুপ করিলেন, ইহার পরে কয়েক মিনিট তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে, আমরা এমন করিয়াই তাহার অপমান করি। রোহিণীর কলঙ্ক ও তাহার শাস্তিও এই পর্য্যায়ের, এমন একটা নারীচরিত্রের কি দুর্গতিই বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন!"

৫

গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম—শুধু গল্প নয়—গল্প বলিবার আশ্চর্য্য ভঙ্গিতেও। সকল কবি কবিতা আবৃত্তি করিতে পারেন না—

তাঁহাদের যে রচনা নিজে পড়িয়া ভাল লাগে, তাহাই তাঁহাদের মুখে অনেক সময় ভাল শোনায় না। শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরনের—তাহাতে ভাবের সংক্রামকতা আরও অব্যর্থ। কিন্তু রোহিণীর কথার পুনরুল্লেখে আমি নিজেকে সামলাইয়া লইলাম—একটু শক্ত হইয়াই বলিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার মত একটু স্বতন্ত্র, তাহা বোধ হয় আপনিও জানেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের বা রচনাকৌশলের ত্রুটি আছে—অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঠিক থাকিলেও সৃষ্টিতে তাহা পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। রোহিণীর চরিত্রের বিকাশে যে অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। পাঠকের বিচার ও কল্পনাশক্তি যদি লেখকের সহিত সহানুভূতিযুক্ত হয়, তবে এই অসঙ্গতির সঙ্গতি হইতে পারে। আপনার 'বিরাজ বৌ'য়ের আচরণেও অসঙ্গতি আছে বলিয়া পাঠকসাধারণ আপত্তি করিয়া থাকে—সে অসঙ্গতিও তাহাদের সংস্কারে অল্প আঘাত করে না। অতএব কোনও নাটকীয় কল্পনার কাব্যে বা উপন্যাসে যদি প্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণ থাকে, তবে সেই কল্পনার কোন ত্রুটির বিচার করিতে হইলে, ব্যক্তিগত মনোভাব বাদ দিয়া, কেবল সৃষ্ট-চরিত্রের পরিচয়টি ও বাহির-অন্তরের সকল অবস্থার হিসাব ভাল করিয়া লইতে হইবে। রোহিণী-চরিত্রের পরিণাম চিত্রিত করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে দোষ হইয়াছে—তিনি সেই পরিণামকে বড় আকস্মিক করিয়া দেখাইয়াছেন। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে কবিকল্পনার যে ভার-কেন্দ্র ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা স্থানচ্যুত হইয়াছে—রোহিণী-চরিত্রের প্রতি লেখকের আর সে মনোযোগই নাই—কল্পনার ধারাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; দ্বিতীয়

খণ্ডে ভ্রমরই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে—রোহিণীর মূর্ত্তি যেন চিত্রশালার এক অন্ধকার কোণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আর্টিস্টের পক্ষে এ ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া রোহিণীর পরিণাম যে এইরূপ হইতে পারে না, তাহা যে মানবচরিত্র-জ্ঞানের বিরোধী, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। কোন সংস্কারের বা সেন্টিমেণ্টের কথা নয়—কোন সামাজিক ন্যায়-অন্যায়-বিচারের কথা নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক কল্পনাও যে কবিদৃষ্টির গুণে এমন অসাধারণ সৃষ্টিশক্তির সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে আর দুই চারিটি দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হইলে রোহিণীর জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসই অতিশয় যথার্থভাবে ফুটিয়া উঠিত। রোহিণীর প্রতি আপনার যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি, তাহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে সাধারণ নারীরূপে কল্পনা করেন নাই—আপনার নিরুদিদির মতই সে চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এইটুকু মহিমা বঙ্কিমচন্দ্রই তাহাকে দিয়াছেন, না দিলে আপনিও তাহার জন্য এত ক্ষুব্ধ হইতেন না। অতএব এজন্য প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রোহিণীর সেই বুদ্ধি ও চরিত্রশক্তি এবং তৎসহ তাহার প্রাণের সেই নির্দ্দোষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকি, তবেই রোহিণীর পরিণাম সত্যকার ট্র্যাজেডির উপযোগী হইতে পারে। হইয়াছেও তাহাই, কেবল একটু অনবধানতার জন্য সেই ট্র্যাজেডি কতকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে—তাহা করুণ না হইয়া বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

রোহিণী-চরিত্রের মূল ভিত্তি একটু পরীক্ষা করা দরকার। যে হরলালকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহার যেমন হউক

একটা ধর্ম্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাবোধ ছিল। গোবিন্দলালকে সে হৃদয়বান ও শক্তিমান আদর্শ পুরুষরূপেই আশ্রয় করিয়াছিল। ভ্রমরের প্রতি তাহার যে ঈর্ষা, অথবা ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব, তাহা নিশ্চয়ই কুন্দ বা সূর্য্যমুখীর প্রতি হীরার ঈর্ষার মত নয়। ইংরেজীতে যাহাকে 'grand passion' বলে, সেই grand passion বা আত্মধ্বংসকারী প্রেম তাহাকে কতকটা নীতিভ্রষ্ট করিয়াছে সত্য—তথাপি তাহার চরিত্রের জন্মগত আত্মমর্য্যাদাবোধ তো মুছিয়া যাইবার নয়। তাহার প্রেমের মূলে সেই বিশ্বাস আছে—যে বিশ্বাসের বলে সে এতবড় সামাজিক সংস্কারকে লঙ্ঘন করিয়াছে। সেই grand passion ও মনের এই বিশ্বাস, এই দুইয়ের বলে সে অকূলে ভাসিয়াছে, মোহের মধ্যেও সে অন্তরের সত্যকে হারাইতে রাজি নয়। কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে, "Her honour rooted in dishonour stood"। গোবিন্দলালের উপর তাহার বিশ্বাস এমনই যে, তাহাতে সে যদি ভুল করিয়া থাকে, তবে তাহার আর কোন আশ্রয় থাকিবে না; সে বিশ্বাস নষ্ট হইলে, তাহার জগৎ একেবারে অন্ধকার হইয়া যাইবে—দর্পণের পারাটুকু মুছিয়া যাইবে, সে দর্পণে কোন ছায়া আর পড়িবে না; ঘোরতর আস্তিক নাস্তিক হইলে যাহা হয়, তাহাই হইবে। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, রোহিণী মানুষ-হিসাবে ও নারী-হিসাবে জীবনে তাহার যে অধিকার চাহিয়াছিল—সে অধিকার সম্বন্ধে তাহার মনের জোর যতই থাকুক, হিন্দুর ঘরের ব্রাহ্মণের মেয়ের পক্ষে বৈধব্য-আদর্শের রক্তগত সংস্কার দমন করিতেই পারা যায়—উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। যদি কোন কারণে সেই বিশ্বাসের শক্তি আর না থাকে, গোবিন্দলালের মত পুরুষের দুর্ব্বলতায় তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায়—

তবে সেই রক্তগত সংস্কারই একটা প্রবল পাপবোধের সৃষ্টি করিয়া এ চরিত্রের শেষ গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। এই সংস্কার আপনার নিরুদিদির ছিল, কিন্তু সেখানে পুরুষের প্রতি বিশ্বাসের এমন কারণ না থাকায় এবং নিরুদিদির প্রকৃতিই সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া, এই পাপবোধ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এবং তিনি অতি সহজভাবেই তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—সেখানে এমন ট্র্যাজেডির অবকাশ ঘটে নাই। রোহিণীর স্বপ্ন ভাঙিতে বিলম্ব হয় নাই—কিন্তু সে কি স্বপ্নভঙ্গ! যাহার ভরসায় সে নিজের ভাগ্যবিধাতাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সমাজের অন্যায়কে নিজ হৃদয়ের ন্যায়সঙ্গত প্রবৃত্তির বলে সংশোধন করিতে চাহিয়াছিল—তাহার অতিদুর্ব্বল লালসাহত প্রাণের বীভৎস মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। সে দেখিল, গোবিন্দলাল তাহাকে ভোগের সহচরী করিয়া তাহার নারীত্বকে অপমান করিয়াছে, সে যেন তাহার নিকটে মদ্যপের পানপাত্র—তাহার দহনজ্বালা যেমন অসহ্য, তাহাকে ত্যাগ করাও তেমনই দুষ্কর। গোবিন্দলাল দিবারাত্রি তাহারই সহবাসে ভ্রমরের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে, যেন নরকে নিমগ্ন থাকিয়া নষ্টস্বর্গের অনুশোচনায় অধীর হইয়াছে। রোহিণী কি ইহারই জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিল? রোহিণী-চরিত্রের যে পরিচয় আমরা এই উপন্যাসের প্রথম অর্দ্ধে পাই, তাহা মনে রাখিলে, সে চরিত্রের পক্ষে এইরূপ মোহভঙ্গ যে কত বড় সর্ব্বনাশ, তাহা বুঝিতে পারি। সে নিজের দুর্দ্দমনীয় নিষ্ফল বাসনা হইতে মুক্তিলাভের জন্য, নিজ আত্মার মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য—একবার আত্মহত্যা করিয়াছিল; এই গোবিন্দলালই তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। আজ সেই গোবিন্দলালই তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার দেহকে

বাঁচাইয়া আত্মাকে বিনাশ করিয়াছে—তাহার হৃদয়ের মূলগ্রন্থি ছিঁড়িয়া দিয়াছে; তাই আজ আর ধর্ম্ম অধর্ম্ম, মান অপমান, প্রেম অপ্রেম—কোন সংস্কারই তাহার নাই; যাহাকে তাহার ত্রিভুবনের এক দেবতা বলিয়া সে বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহার মধ্যেও নারীমাংসলোলুপ অতিশয় সাধারণ দুশ্চরিত্র লম্পটকেই সে দেখিয়াছে। তাই বারুণী পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া গভীর জলতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যে রোহিণী একদিন জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকে শীতল মনে করিয়াছিল—আজ যে সেই রোহিণী কুক্কুরীর মত হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে চায়, ইহাতেই বুঝিতে পারি, গোবিন্দলাল কত বড় পাপ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর সেই দগ্ধ অঙ্গার-মূর্ত্তিই দেখাইয়াছেন—দহ্যমান অবস্থা দেখান নাই; শেষে তাহারই এক মুষ্টি ভস্মাবশেষ ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য তখন গোবিন্দলাল, রোহিণী উপলক্ষ্য মাত্র। কল্পনার এই কেন্দ্র-পরিবর্ত্তনের কথা আগে বলিয়াছি—ইহাই রচনাহিসাবে এ গ্রন্থের গুরুতর ত্রুটি। তথাপি রোহিণীকে হত্যা করিবার সময় গোবিন্দলালের মুখে যখন শুনি—'তুমি কে রোহিণী, যে তোমার জন্য' ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন এই নিতান্ত থিয়েটারী বক্তৃতার মধ্যে গোবিন্দলালের মিথ্যাবাদই উচ্চরব করিয়া উঠে; যাহাকে সে এতটুকু স্নেহ করে নাই, যাহার প্রতি সে-ই বিশ্বাস-ঘাতকতার চূড়ান্ত করিয়াছে, যাহার কৃতজ্ঞতার প্রতি তাহার এতটুকু দাবি নাই, তাহাকেই বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া আপনার পাপ তাহার উপরে চাপাইয়া, সে তাহার দণ্ডদাতা হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে, নায়কস্থানীয় পুরুষ-চরিত্রের এত বড় অধঃপতন—এত বড় আত্মঘাতী প্রমত্ততা ও তাহার এমন নিদারুণ পরিণাম চিত্রিত হয় নাই। আমার মনে হয়, কল্পনার এই উগ্র একাগ্রতায় কবিরও কিঞ্চিৎ বিভ্রম

ঘটিয়াছে, তাই রোহিণীর পরিণাম ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ মেলে নাই। তথাপি কবির সেই কল্পনার ফাঁক একটু পূর্ণ করিয়া লইলে, রোহিণীর ওই পরিণাম—চরিত্র ও ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে ওইরূপ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, রোহিণী আজিকার মত সংস্কারমুক্ত নারী নয়, সে নিতান্তই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীব—দেহপ্রাণের আদিম প্রবৃত্তি ও মনের অভ্যস্ত সংস্কার, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাহার জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও সাইকলজিক্যাল নভেল বা প্রব্লেম-নভেল নয়। তাঁহার জীবন-দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনি মানুষের মনের অহং-চেতনা অপেক্ষা তাহার দেহের নিয়তি ও প্রাণের রহস্যময় চেতনাকে তাঁহার কবিদৃষ্টির লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলির সমালোচনা ও সুবিচার করিতে হইলে খাঁটি কবিকল্পনার অনুসরণ করিতে হইবে, আত্মবুদ্ধির মতবাদ, আত্মভাবের পক্ষপাত—মন হইতে দূর করিতে হইবে; জীবনকে কবি যে ভাবে ভাবনা করিয়াছেন, সেই ভাবদৃষ্টির অনুগামী হইয়াই কাব্যের দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ অপর কোনও কবির ধারণার সহিত মেলে না বলিয়াই সে জগৎ মিথ্যা নহে—রসসৃষ্টিতে সত্যমিথ্যার নিরিখ কোনও একটি বিশেষ তত্ত্ব বা যুক্তিমার্গের অধীন নয়—কারণ, সে সৃষ্টিতে জীবনের কোন তত্ত্ব নয়—সুগভীর রহস্যই প্রতিফলিত হয়। অতএব, সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে কোনও মতবাদ বা ব্যক্তিগত ভাবতন্ত্রের শাসন সর্ব্বদা পরিহার করা উচিত।

আজ আমি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীচরিত্র-ঘটিত বাদবিতর্কের প্রসঙ্গে উপরে যাহা লিখিলাম—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় এত কথা

এমনভাবে বলি নাই। তাহা ছাড়া, সেদিন সে উপলক্ষ্যে মুখে যাহা বলিয়াছিলাম, আজ তাহা লিখিতে গিয়া—প্রসঙ্গের গুরুত্ব বিবেচনায় কথাগুলিকে আরও সুবিন্যস্ত করিয়াছি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিকটে আমার মূল বক্তব্য ছিল ইহাই, কতখানি গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছিলাম জানি না—কিন্তু তাহাতেই ফল হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র অতিশয় নিবিষ্ট মনে আমার মতামত শুনিলেন, শুধু তাহাই নয়, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তিনি বিনা দ্বিধায় আমার প্রতিবাদের সারবত্তা স্বীকার করিলেন। তাহার প্রমাণ পাইলাম তাঁহার কয়েকটি মাত্র কথায়। প্রথমে তিনি অকপটে স্বীকার করিলেন যে, তিনি সত্যই এদিক দিয়া কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই—সেজন্য যেন লজ্জিত ও দুঃখিত। শরৎ-চরিত্রের এই অকপট সারল্য ও নিরভিমান সত্যানুরাগ, তাঁহার সুগভীর মনুষ্যত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। সর্ব্বশেষে তিনি কতকটা আক্ষেপের সহিত যাহা বলিলেন, তাহা আমি কখনও আশা করি নাই—আমার প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা আমি কখনও দাবি করিতাম না। সেই তাঁহার শেষ কথা। তিনি বলিলেন, "মোহিত, তোমার সঙ্গে এইরূপ আলাপ-আলোচনার সুযোগ যদি হইত, তাহা হইলে তোমার ও আমার দুইজনেরই উপকার হইত।" শরৎচন্দ্রের মুখ হইতে এমন কথা বাহির হওয়া হয়তো আশ্চর্য্য নয়—তিনি অল্পেই মুগ্ধ হইতেন, এবং অনেকের সম্বন্ধেই নির্ব্বিচার প্রশংসা করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ ছিল না। অতএব ইহাতে আমার কোন আত্মপ্রসাদের কারণ নাই ; তথাপি শরৎচন্দ্রের এই সখেদ উক্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল —আমি আমার নিজের ক্ষতির কথাই ভাবিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত এইরূপ আলাপ-আলোচনায় আমার যে লাভের কথাও তিনি বলিলেন,

তাহা সত্য; কারণ জীবন সম্বন্ধে প্রাণময় অভিজ্ঞতার সেই সব কাহিনী কোন কাব্যে বা সমালোচনা-গ্রন্থে আমি এমন সাক্ষাৎভাবে পাইতাম না। আমার পক্ষে সেইরূপ পাওয়ার যে প্রয়োজন আছে—তাঁহার এই বিশ্বাসকেই, আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৬

ইহাই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ আলাপ, এইখানেই তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সমাপ্তি। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক পরিচয়ের তো শেষ নাই। সেই পরিচয়ের পথ কতকটা সুগম করিয়াছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সংস্পর্শের এই কয়েকটি আলোক-বর্ত্তি; আমি আজ তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এ বিবরণ হয়তো শরৎ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সমালোচকের কিঞ্চিৎ কাজে লাগিবে, আমারও কিছু লাগিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি শরৎ-সাহিত্যকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, তাহাও যেমন আমারই দৃষ্টি, তেমনই শরৎচন্দ্রকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, তাহাও আমারই—আমার দাবি কোনও অভ্রান্ত সত্যদৃষ্টির দাবি নয়। কোনও মানুষকে কেহ কখনও পূর্ণ-দেখা দেখে নাই, অন্তরঙ্গ আত্মীয়কেও নয়। কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির দিব্য আবেশে, এক পরম ক্ষণে, মানুষ আপনাকে দেখার মতই পরকে দেখে। সাহিত্যে সে দৃষ্টিও আজ লুপ্ত হইয়াছে; আজিকার দর্শনশাস্ত্রও আর সেই সমগ্রদৃষ্টিতে বিশ্বাস করে না। অতএব আমার দৃষ্টির খণ্ডতা যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই তাহা লজ্জার বিষয় নহে। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে যেমন হউক একটা

সমগ্রতাবোধের প্রয়োজন আছে, নতুবা রসোপলব্ধি হয় না; এবং এইরূপ সমগ্রতাবোধের কিছু সাহায্য হয় কবিচিত্ত ও কবিজীবনের পরিচয় হইতে। শরৎচন্দ্রের বিষয়ে আমার সেই পরিচয় খুব বেশি নয়, তথাপি আমার পক্ষে সেইটুকুই বরাবর কাজে লাগিয়াছে।

শরৎচন্দ্র জীবনকে একটা ক্ষেত্রে মুখামুখি দেখিয়াছিলেন—সেই দেখারও একটা ব্যক্তিগত ভঙ্গি আছে। যে প্রবুদ্ধ কল্পনাশক্তি কবিকে নৈর্ব্যক্তিক করিয়া তোলে, শরৎচন্দ্রের তাহা ছিল না,—কল্পনা অপেক্ষা অনুভূতির প্রখরতাই ছিল তাঁহার অধিক, তাই তাঁহার সৃষ্টির ভাব-রূপ যত পরিস্ফুট, তাহার পরিধি তেমন বিস্তৃত নয়। শূলবিদ্ধ বৃশ্চিক যেমন যন্ত্রণায় আপনার দেহ আপনি দংশন করে, সে দংশনে আত্মমমতাই প্রবল—শরৎচন্দ্রও তেমনই আমাদের এই সমাজের সহিত একাত্ম হইয়াই তাহার যন্ত্রণা পরম মমতার সহিত নিজদেহে ভোগ করিয়াছেন। তিনি বিচারক নহেন, সংস্কারকও নহেন—তিনি কেবল এই ব্যথার কাব্যকার। তিনি আগামী সভ্যতা ও সমাজনীতির ভাবনা তেমন ভাবেন নাই, যেমন ভাবিয়াছেন—এক যুগের সমাজ-ব্যবস্থার ফলে এক শ্রেণীর মানব-মানবীর অন্তর-মন্থিত অমৃত-গরলের কথা। সেই সমাজ-ব্যবস্থার দোষ ও গুণ তিনি সমভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—সকল ত্রুটি সত্ত্বেও তাহার প্রতি অসীম মমতার ফলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে সেই বাঙালী-জীবনের চারণ-কবি হইতে পারিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের অন্তর্নিহিত যে রূপ, যাহা বাংলার প্রচীনতর শাক্ত ও বৈষ্ণব-সাধনার যুগ্ম-ধারায় সিক্ত, ও রঘুনন্দনের শাসনে দৃঢ়-গঠিত, শরৎচন্দ্র তাহাকেই সাহিত্যে একটি রস-রূপ দান করিয়াছেন। তিনি ইহার দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করেন নাই,

অতিশয় অপরোক্ষভাবে ইহাকে অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই অনুভূতির মধ্যে, যেন তাঁহারও অজ্ঞাতসারে, ইহার প্রতি এক সুগভীর মমত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎ-সাহিত্যের যাহা উৎকৃষ্ট অংশ, যাহা খাঁটি সৃষ্টিধর্ম্মী, তাহা একটা বিশেষ যুগের বিশেষ কাল্‌চারের প্রেরণা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাঁহার দৃষ্টি সেই কাল্‌চারেরই ফল। আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার আঘাতে এই কাল্‌চারেরই একটা আত্মিক শক্তি তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর চরিত্র ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে যে সকল সমস্যার আবির্ভাব দেখা যায়, সমস্যা-হিসাবে আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাহাদের মূল্য স্বতন্ত্র। এই সকল সমস্যার দ্বারা সেই প্রাচীন প্রাণ-মনের তলদেশ যে ভাবে আলোড়িত হইয়াছে—প্রতিক্রিয়ার মুখে তাহার যে শক্তি ও সম্পদ প্রকাশ পাইয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহারই আরতি করিয়াছেন। ইহাই সে সাহিত্যের রস। যাঁহারা সে রসের রসিক নহেন, এবং যাঁহারা বাঙালী-জীবনের সেই ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা এই একান্ত বাঙালী-প্রাণ ও বাঙালী-প্রতিভার গৌরব নির্দ্ধারণ করেন বিদেশী সংস্কার ও বিদেশী চিন্তাপদ্ধতির আদর্শে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যাহাকে প্রাচীন সংস্কারের মোহ ও দুর্ব্বলতা বলিয়া তাঁহারা নাসাকুঞ্চিত করেন, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকার চরিত্র-মহিমার মূলে আছে সেই সংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য শাসন। সকল জাতির মানুষের পক্ষেই সামাজিক বা নৈতিক সমস্যার একটা সাধারণ রূপ আছে; কিন্তু চিন্তা বা জ্ঞানের দিক দিয়া যাহা সার্ব্বভৌমিক, প্রাণের দিক দিয়া তাহা এক নহে। এই প্রাণের দিকই সাহিত্যের দিক, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নরনারী সমস্যা-পীড়িত আন্তর্জ্জাতিক নরনারী নয়; তাহা যদি হয়, তবে তিনি সাহিত্য

রচনা করেন নাই—সমাজতত্ত্ব লিখিয়াছেন ; এজন্য যাঁহারা Karl Marx ও Bertrand Russell, Bernard Shaw ও Aldous Huxley-র নামাঙ্কিত শীলমোহরের ছাপ দিয়া শরৎ-সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়াই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বক্তব্য ইহাও নহে ; বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি এই একটি কথাই বলিতে চাই যে, আধুনিক যুগসঙ্কটের ছায়ায় গত যুগের বাঙালী-সমাজের একটি প্রাণগত পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র প্রাণে মনে সেই গত যুগেরই বংশধর ; তাঁহার রচিত সাহিত্যে আমরা একটা বিলীয়মান যুগের বাঙালী সভ্যতা, বাঙালী সমাজ এবং সেই সমাজের শক্তি ও অশক্তির যে মর্ম্মান্তিক লিপিচিত্র পাইয়াছি, তাহাই বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

সাহিত্যিকের অন্তর্জীবনের উপর বাহিরের জীবনযাত্রার প্রভাব যে আছে, তাহা আমরা জানি ; কিন্তু সেই প্রভাব যে কত বেশি হইতে পারে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়াছি। শরৎচন্দ্র কখনও পুঁথিবিদ্যা, তত্ত্ব ও মতবাদের—এক কথায় পাণ্ডিত্যজীবী—মানুষ ছিলেন না ; তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল—আমি যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক সাধনা, জীবনেরই ঘাটে বাটে, প্রান্তরে শ্মশানে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সাধনায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মন তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, নিজের অনুভূতিশক্তির ঐকান্তিকতার জন্যই, তিনি যেন তাহার বিপরীত সাধনার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। এইজন্য যখন তাঁহার জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, জীবন হইতে পুঁথির জগতে প্রবেশ করিবার সুযোগ বাড়িল, তখন হইতেই তাঁহার স্বকীয় সাধনার আসন

বিচলিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার খ্যাতিই তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যে পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্য কেতাবী ভক্তের দল সৃষ্টি করিল, তাহাদের সঙ্গে তাঁহার সেই প্রতিভাই তাল রক্ষা করিতে গিয়া নিজের ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়াছে। যে সহজাত প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির ফলে কবিগণ পণ্ডিতের গুরুস্থানীয় হন, শরৎচন্দ্র যেন সেই গুরুর অধিকার ত্যাগ করিয়া পণ্ডিতের শিষ্যত্বকামী হইয়া উঠিলেন। তাহার ফলে তাঁহার শেষ রচনাগুলিতে জীবনের সম্বন্ধে সেই সহজ দৃষ্টি আর নাই ; সমাজবিজ্ঞান এবং ব্যক্তিধর্ম্মের নানা কূটকঠিন প্রশ্ন-মীমাংসায় তাঁহার অনুভূতি-কল্পনা নিয়োজিত হইয়াছে—তাঁহার সম্মুখে নারীশক্তির প্রতীক সেই অন্নদাদিদির চিরন্তনী জীবনরহস্যময়ী মূর্ত্তি আর নাই, তাহার স্থানে সকল হৃদয়-রহস্যের প্রতিবাদস্বরূপিণী, কেতাবী বিদ্যার নির্য্যাসভাষিনী আধুনিক ছিন্নমস্তার রূপ বিরাজ করিতেছে। শরৎচন্দ্রের সেই লিপিকুশলতা তখনও আছে—এ সকল রচনাতেও প্রতিভার সেই স্বাক্ষর মুছিয়া যায় নাই ; কিন্তু এ শরৎচন্দ্র সে শরৎচন্দ্র নয়, জীবন-সাধক তান্ত্রিক এখন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছেন। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এই নিবর্ত্তনকে পূর্ণতর বিকাশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই ; আমি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার সম্বন্ধে বলিতেছি—অন্যবিধ শক্তির সম্বন্ধে নয়। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যিক কীর্ত্তি কোন্‌গুলি, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনও রসিকসমাজেই সন্দেহের অবকাশ নাই, ও থাকিবে না। জর্জ এলিয়টের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে যে কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, শরৎচন্দ্রের বইগুলির সম্বন্ধে তাহা আরও সত্য।

তথাপি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি ক্রমে মন্দীভূত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার রচনাশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার

সাহিত্যিক জীবন ধন্য বলিতে হইবে। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইয়ের মধ্যে একটি সার্থক নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক জীবনই ছিল; তিনি যেমন আমাদের জন্য একেবারে প্রস্তুত অন্ন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনই সেই অন্নের শেষ কণাটি বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইয়াছেন। এমন পুণ্যবান সাহিত্যিক আমরা অল্পই দেখিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

রবি-প্রদক্ষিণ

পঁচিশে বৈশাখ দিনটিতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে এক বিষয়ে আমাদের আশান্বিত হইবার কারণ আছে। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি, আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, জগতের সঙ্গে আমাদের সগৌরব পরিচয়ের সমুন্নত পতাকা —আমাদের বড় গর্ব্বের রবীন্দ্রনাথকে, তাঁহার জন্মদিনে আমরা আমাদের হৃদয়ের যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া থাকি, কোনও কবির উদ্দেশে আমরা পূর্ব্বে এমনভাবে তাহা করি নাই। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার ভাস্বর জ্যোতি আমাদের অন্ধ-চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে— আমরা, জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব যে সাহিত্য, তাহার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছি। আমরা আজ রবীন্দ্র-প্রতিভাকে এইভাবে পূজা না করিয়া যে তৃপ্ত হইতে পারি না, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমরা জীবনে এক নূতন দীক্ষা লাভ করিয়াছি ; অতএব আরও এক কারণে বাঙালী জাতি রবীন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী।

আজ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় জীবনের আর এক বর্ষাঙ্কে পদার্পণ করিলেন, দুর্ভাগ্য বাঙালীর পক্ষে ইহা অল্প সৌভাগ্য নহে। হেম-নবীন-মধু-বঙ্কিমের যুগে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, অস্তোন্মুখ বঙ্কিমচন্দ্রের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে তরুণ রবির তখনই প্রায় পূর্ণোদয় ঘটিয়াছিল, আজ সে-যুগের সর্ব্বশেষ প্রতিভা শরৎচন্দ্রের অস্তগমনের পরেও সেই রবি-রশ্মি এখনও দীপ্তি পাইতেছে—এক যুগ

হইতে আর এক যুগে এমন সেতু-যোজনা পূর্ব্বে কখনও ঘটিয়াছে কিনা জানি না। কেবল আয়ুষ্কালের পরিমাণই এ আনন্দের কারণ নয়, —কেবল জীবিত থাকাই নয়, স্থবিরতার গৌরবই নয়—রবীন্দ্রনাথ আজিও জরার আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অফুরন্ত জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছেন; মৃত্যুর ছায়া বার বার তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও সে প্রাণকে অভিভূত করিতে পারে নাই—তাঁহার কবিচিত্তে প্রবেশাধিকার পায় নাই—ইহাই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। আশায়, আশঙ্কায়, আনন্দে আমরা আজিও কামনা করিতেছি—রবীন্দ্রনাথকে এখনও অন্তত কিছুকাল বিধাতার বরে ধরিয়া রাখিতে পারিব। এ বৎসর আমাদের আনন্দ কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে ধৌত হইয়া আরও উজ্জ্বল হইয়াছে; আমরা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিলাম, দুইটি বৃহৎ জ্যোতিষ্ক আমাদের ভাগ্যাকাশ হইতে প্রায় একসঙ্গে খসিয়া গিয়াছে—জ্যোতিষ্কমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী রবিকেও প্রায় হারাইতে বসিয়াছিলাম। বিধাতা এবার আমাদিগকে বড় কৃপা করিয়াছেন। তাই এ বৎসর পঁচিশে বৈশাখ শুধুই আনন্দ নয়—ভগবানের উদ্দেশে নতজানু হইয়া কৃতজ্ঞতা নিবেদনের দিন; সেই করুণাময়ের নিকটে আজ আমরা সকল দেশবাসীর সমবেত প্রার্থনা জানাইতেছি, রবীন্দ্রনাথ যেন শতায়ুঃ হইয়া এ জাতির এই তমসাচ্ছন্ন জীবনে স্থির দীপশিখার মত নৈরাশ্য নিবারণ করেন।

আজ এই উপলক্ষ্যে আমি অতিশয় সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এ আলোচনা অতিশয় অসম্পূর্ণ হইবে; বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজনও নাই, অবকাশও নাই। তথাপি কবিকীর্ত্তির কথঞ্চিৎ আলোচনা আজিকার দিনে বাঞ্ছনীয় মনে করি। রবীন্দ্রনাথের

কবি-প্রতিভার সম্পর্কে একটি উপমা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। হিমালয়ের একটা অংশ আমাদের দেশের সীমানাভুক্ত হইয়া আছে—সমগ্র উত্তর-ভারতের সঙ্গে আমরা এই যে একটি মহাসম্পদের শরিক হইয়া আছি—তাহাতে আমাদের ভাগে পড়িয়াছে হিমালয়ের বক্ষশোভী অসীম সৌন্দর্য্যময় কাঞ্চনগিরি—কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপের তুলনা নাই, বায়ুমণ্ডলচারিণী অপ্সরাগণ আলো ও আঁধারের ইন্দ্রজালে ইহাকে নিরন্তর যে নব নব বর্ণবৈভবে বিচিত্রিত করিয়া থাকে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আমাদের সাহিত্যে ভারতীয় প্রতিভার যে হিমাদ্রিমালা প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্র-প্রতিভা তাহার কাঞ্চনজঙ্ঘা; প্রভাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় তাহার যে সৌন্দর্য্যবিকাশ আমরা দেখিয়াছি, বাস্তবের সমতল-ভূমির উপরে প্রসারিত করিয়া তাহার আদি-অন্ত নিরূপণ করা দুঃসাধ্য—অতি দূর আকাশের পটে অপ্সর-নিষেবিত অমরাপুরীর মতই তাহা আমাদের নিত্য-বিস্ময় হইয়া আছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার কোনও একটি দিক লইয়া পৃথকভাবে বিচার করিতে গেলে সংশয়-বিমূঢ়তা যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই সাধারণ কবি-চরিত্র ও কবিকীর্ত্তির মানদণ্ডে তাহার সমগ্রতা প্রমাণ করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। অনন্তরত্নপ্রভব এই প্রতিভার মূলে যে চিৎশক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে কবিকে হারাইতে হয়; আবার সেই প্রতিভার বিচিত্র সৃষ্টির আরণ্য প্রাচুর্য্যের মধ্যে কোনও স্থূল সুস্পষ্ট পথরেখাকে ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে, প্রত্যেক তরু ও লতার বৈশিষ্ট্যরসে বঞ্চিত হইতে হয়। অনেকে রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত সৃষ্টিলীলার মধ্যে একটি কালক্রমিক বিকাশ বা বিবর্ত্তনধারা লক্ষ্য করিয়াছেন; এমন একটা নিয়ম আবিষ্কার করা অসম্ভব যা

অসঙ্গত নয়—রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় প্রতিভার বিকাশ যে একটা অতি গূঢ় মূল ভাবকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং সর্ব্ববিধ বিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাই যে কোন-না-কোন রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিকাশের ধারা একটু স্বতন্ত্র—আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার রূপ এক নহে; কবির জীবন কাল-হিসাবে যতই অগ্রসর হইয়াছে, ততই যে তাহা আপনাকে একই ধারায় উত্তরোত্তর প্রকাশিত করিয়াছে, তাহা নহে; মূল ভাববীজ এক হইতে পারে, কিন্তু তাহা একই বৃক্ষরূপে শাখাপ্রশাখা বিস্তার না করিয়া, সেই বীজেরই আদি-প্রকৃতি অনুসারে নিরন্তর নব নব রূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এইরূপ একটা ধারণা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। বীজ একই বটে—কিন্তু তাহার বিকাশের যে নানা ভঙ্গি কালে কালে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কোনও একটি তত্ত্বের শাসন অপেক্ষা কবিমানসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ লীলাই প্রকট হইয়াছে। তত্ত্ব যদি কিছু থাকে তবে তাহা সকল তত্ত্বনিরসনের তত্ত্ব—সর্ব্ববন্ধন সর্ব্বসংস্কার হইতে ক্রমাগত মুক্তিলাভের আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যাঁহারা কোনও তত্ত্বের সন্ধান করিবেন, যাঁহারা পূর্ব্বাপর সমস্ত কবিতাগুলিকে একটি কোনও সুদৃঢ় সূত্রে গাঁথিয়া মাল্যের আকারে গ্রন্থিবদ্ধ করিবেন—তাঁহারা এমন একটি নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবেন, যাহা জীবন বা কাব্য কোন হিসাবে সত্য নহে।

আমি এরূপ কোনও তত্ত্বের সূত্র ধরিবার চেষ্টা করিব না, বরং ধারা যে সর্ব্বত্র এক নহে, তাহাতে স্পষ্ট বিচ্ছেদ আছে, কবিজীবনের পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ সুস্পষ্ট ভেদরেখায় বিভক্ত হইয়াছে—সেই কথাই বলিব।

কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি ইহার কোন্ ভাগে অধিকতর সার্থক হইয়াছে, এবং কেন হইয়াছে,—কোন্ ভাগে তাঁহার ব্যক্তিমানসের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। যে একটি বস্তু রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে এমন অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, আমি তাহার নাম দিব—আনন্দ-মুক্তির প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরিয়া যে গান গাহিয়াছেন, সেই গানের সুরই তাঁহার প্রাণের সুর—এই সুর একান্তই তাঁহার নিজের। এই গানের সুরেই সেই আনন্দ-মুক্তির আকুল আগ্রহ বরাবর একভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা এই গানেই আরম্ভ, গানেই শেষ। এক হিসাবে এই গানগুলির কথা ও সুর তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গানের মধ্যেই কবিজীবনের আদ্যন্ত সুপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কবিপ্রাণের আদি-প্রেরণা ও তাহার বিকাশের অখণ্ড ধারা যদি কোথায়ও থাকে, তবে এই গানগুলির ভিতরেই তাহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। রবির উদয়কালে যে বর্ণচ্ছটা পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল, এখনও সেই নানা বর্ণের গীত-গরিমায় অস্ত-গগন ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে রবির প্রতিভা ঊর্দ্ধাকাশের সেই নীল শূন্য ত্যাগ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়াছিল, এবং আপন আলোকে পৃথিবীর রূপ, রঙ, রেখাকে উজ্জ্বল করিয়াছিল। ইহাই ছিল কবির কাব্যসাধনা—ইহা গীত-সাধনা নয়। আমি যে পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগের কথা বলিয়াছি, তাহাই কবি রবীন্দ্রের কাব্যসৃষ্টির যুগ। রবীন্দ্র-নাথের গীতি-প্রকৃতিকে যদি তাঁহার কবিপ্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব হয়, তবেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের আদ্যন্ত বুঝিবার পক্ষে বাধা ঘটিবে না, এবং সেই জীবনের পরিচ্ছেদগুলি বিভক্তভাবেই

সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইবে; গীতিপ্রেরণা ও কাব্যপ্রেরণাকে একই ধারায় মিলাইতে গিয়া কোনরূপ সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ববাদের শরণাপন্ন হইতে হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগে যে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়, তাহা আত্মভাবগত আনন্দ-মুক্তির প্রেরণা নহে। তখন জীবনের সহিত, জগতের সহিত, বিশেষ বা concrete-এর সহিত, সাক্ষাৎ-পরিচয়ের বিস্ময় তাঁহাকে আকুল করিয়াছিল; তখনও খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে উপলব্ধি করিবার আগ্রহ প্রবল হইলেও, রবীন্দ্রনাথ সেই খণ্ডের মোহকে স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যে, মানুষের জীবন এবং মানবহৃদয়জগৎ, বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া, দেশকালের ইতিহাসের মধ্যেই একটি সুপরিস্ফুট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এই কালে রবীন্দ্রনাথ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভাষা ভাব ও ছন্দ অঙ্গাঙ্গী হইয়া আছে, কোনও অঙ্গ অপর অঙ্গকে খর্ব্ব করে নাই; এই জন্য এই সৃষ্টি যথার্থ সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে—ভাব ভাষাকে, কিংবা ভাষা রূপকে অতিক্রম করে নাই। রূপজগৎ ও ভাবজগতের মধ্যে কত অতর্কিত অভাবনীয় মিলন ঘটিয়াছে—ভাষার কি ঐশ্বর্য্য! ছন্দের কি বিচিত্র কলরোল! এই কালে কবিচিত্ত, ভাবপ্রধান হইলেও, রূপের বশীভূত হইয়াছে—জীবনের সুখদুঃখ ও প্রকৃতির রহস্যময় কটাক্ষসঙ্কেত রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রাণ আলোড়িত করিয়াছে; এ পর্য্যন্ত তাঁহার কবি-প্রতিভা জীবনেরই ধ্যান করিয়াছে। আমরাও সেই কাব্যজগতে জীবনকে দেখিলাম জীবনেরই মধ্যে দাঁড়াইয়া। অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ যাহা, যাহাকে আমরা ভাল করিয়া কখনও দেখি নাই, শ্রদ্ধা করি নাই—তাহাই এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল; যাহা ক্ষণিক তাহার মধ্যে

শাশ্বতকে দেখিলাম; অতীতকে বর্ত্তমানে, এবং বর্ত্তমানকে বহুদূরের অতীতের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম; কোমলের মধ্যে কঠোর, এবং ভীষণের মধ্যে মধুরকে দেখিলাম—এক কথায়, জীবন ও জগৎকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম; আমরা যেন এক নূতন অনুভূতির নূতন ইন্দ্রিয় লাভ করিলাম। এই যুগের রবীন্দ্রনাথ যে নূতন ভাবধারার প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহারই ফলে, বঙ্কিম-যুগের বাংলা সাহিত্য পূর্ণ-যৌবনে পদার্পণ করিল, এবং বিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে এ সাহিত্যের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি হইল। এই নবপ্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সাধনারই একটি সুপরিপক্ব ফল—শরৎচন্দ্রের উপন্যাস; বস্তুত, পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের উদয় না হইলে শরৎচন্দ্রের উদয় সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সেই কাব্য-সাধনা একটি নির্দ্দিষ্ট কালে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে; ইহার কারণ, জগৎ ও জীবনকে সে ভাবে দেখা তাঁহার শেষ হইয়াছে। জীবনের এই বাহিরের রূপ তাঁহাকে বেশি দিন মুগ্ধ করিতে পারে নাই, সম্ভবত কখনও সম্পূর্ণ অভিভূত করে নাই। তাঁহার কবিজীবনের যে পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগের কথা বলিয়াছি, তাহাতেও বার বার কবির প্রাণে ক্লান্তি ও অবসাদ আসিয়াছে—রূপের মায়াজাল ভেদ করিয়া অরূপ-রহস্যের প্রতি তাঁহার প্রাণগত আকর্ষণের আভাস এ কালের রচনাতেও আছে। তাঁহার চক্ষে রূপ ক্রমাগত রূপক হইয়া উঠে—পার্থিব বস্তুপুঞ্জের অপার্থিব ছায়া তাঁহাকে বিহ্বল করে। কবির যৌবন জীবনের রসরূপকে অস্বীকার করিতে দেয় নাই বটে, কিন্তু সেই রসাস্বাদন-কালেও তিনি নিজকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—এ কাজ যেন তাঁহার নয়, কোন লীলাময়ের লীলা-সহচররূপেই যেন তিনি এই রূপজগতের নিকটে আত্মনিবেদন

করিয়াছেন, তাঁহারই লীলার পোষকতা ভিন্ন নিজের পৃথক আত্মপ্রসাদ যেন তাহাতে নাই। 'জীবনদেবতা' নামে এই যে এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করিয়া এককালে তিনি আশ্বস্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কারণ, ইহাই বলিয়া মনে হয়; রূপরসসাধনার মধ্যেও তাঁহার চিত্তে একটি গভীর বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন ছিল।

ইহার পরে তাঁহার সেই বন্ধন ঘুচিয়াছে; বিশেষকে ছাড়িয়া নির্ব্বিশেষের যে আনন্দ-মুক্তি, কবি অতঃপর তাহারই সাধনা করিয়াছেন। এ অবস্থা এতই বিপরীত যে, ইহার সহিত পূর্ব্বের সেই সাধনরীতি মিলিবে না। কবি যেন এক পার হইতে অন্য পারে গিয়া উঠিয়াছেন; এপার হইতে যেমনটি দেখিতেন ওপার হইতে আর তেমনটি দেখেন না। কবিদৃষ্টির এই প্রভেদ এত বড় প্রভেদ যে, ইহাকে কবির ব্যক্তিমানসের একটি পরিণতি-অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাঁহার কবিস্বপ্নে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি নিজেও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মসচেতন—তাঁহার 'খেয়া' কাব্যখানির নামই এই তটপরিবর্ত্তন ঘোষণা করিতেছে। 'খেয়া'র পর হইতেই কবি গীতি-বিবশ হইয়াছেন, জগৎ ও জীবন দূর পরপারের তটরেখার মত ছায়াময় হইয়া উঠিয়াছে—"চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়"। কবির ইষ্টদেবতা এখন আর জীবনদেবতা নয়, তিনি আর রহস্যময় নহেন; কবি ও তাঁহার সেই দেবতার মধ্যে জগৎদৃশ্যের অন্তরালখানি ঘুচিয়াছে, সকল সীমাকে তিনি অসীমায় যুক্ত করিয়াছেন। এইখানেই আমরা কবিজীবনের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগের পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে পাই। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ এখনও রূপসাগরে ডুব দিতেছেন বটে, কিন্তু সে অরূপ-রতনের আশায়। এখন কবির কাব্যকল্পনা ক্ষান্ত হইয়াছে—এ যুগ

বিশেষভাবে গানের যুগ, কবিজীবনের সন্ধ্যাকাশ অপূর্ব্ব গীতরাগে রঙিন হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার এই যে রূপান্তর—ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। আমরা সকলেই জানি, এই গীতিরসসাধনার কালে রবীন্দ্রনাথ একবার কতকগুলি কবিতায় একটি অভিনব কাব্যজগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই কবিতাগুলির নাম 'বলাকা'। এমন একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টির নিদর্শন একালের রচনায় আর নাই। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের কবিদেহের জন্মান্তর হইয়াছে—এই কাব্যে কবি যে প্রেরণার বশীভূত হইয়াছেন তাহাতে মনে হয়, পূর্ব্বের সে রবীন্দ্রনাথ ও এই রবীন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নহেন। 'বলাকা'র কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে আমি সেকালের রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। কবিতাটির নাম "যেতে নাহি দিব"। এই কবিতায় কবি বলিতেছেন—

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর,
"যেতে আমি দিব না তোমায়!" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব, যেতে নাহি দিব!" সবে
কহে, "যেতে নাহি দিব!"…

হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়!

চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হ'তে ;
প্রলয়-সমুদ্রবাহী স্বজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্র বাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হুহু ক'রে তীব্রবেগে চ'লে যায় সবে
পূর্ণ করি' বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।
সম্মুখ-উর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিব না দিব না যেতে"—নাহি শোনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া।

চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রান্ত কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন।...

ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে ?"...

মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার।...

আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে

জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
প'ড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

—ইহাই হইল কবিজীবনের সেই পূর্ব্বার্দ্ধের বাণী, এপারে থাকিতে তিনি সংসারকে এই চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ওপারে গিয়া তিনি জীবনের, তথা মনুষ্যহৃদয়ের, এই সকরুণ দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারিয়াছেন। তাই 'বলাকা'র কবির মনে আর সে প্রশ্ন নাই, তিনি নিত্য-ধ্রুবের জন্য ব্যাকুল নহেন, বরং চিরচঞ্চলারই উপাসক। তাহারই উদ্দেশে কবি গাহিতেছেন—

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেমে তা'র নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া !...
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি',...
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে,
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্ম-মূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

*   *

ওরে দেখ্‌, সেই স্রোত হ'য়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর প'ড়ে থাক তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে!
সম্মুখের বাণী
নিক্‌ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তস্তলে যে সর্ব্বভাবনাবিরহিত সর্ব্বসংস্কারমুক্ত প্রাণধারা প্রবাহিত হইতেছে, তিনি এক্ষণে তাহাতেই স্নান করিয়া সর্ব্বভাবনামুক্ত হইয়াছেন—যে জন্মমৃত্যুস্রোত নিরুদ্দেশ মহাকাল-সাগরে বহিয়া চলিয়াছে, তাহারই নিরবচ্ছিন্ন গতিবেগের জয়-শঙ্খ বাজাইয়াছেন। সুখদুঃখ মিথ্যা, মিলন-বিচ্ছেদের হাসি ও অশ্রু দুইই সমান। 'যেতে নাহি দিব'—প্রেমের এই যে আর্ত্ত চীৎকার ইহার মত ব্যামোহ আর নাই। ক্ষণ-সৃষ্টি ও ক্ষণ-ধ্বংসের তরঙ্গলীলাই মহাজীবনের লীলা; অতীতের মায়া নাই, ভবিষ্যতের ভয় নাই; গতি আছে, কোনও ধ্রুবস্থির

গন্তব্য নাই। এই পরিদৃশ্যমান বস্তুরূপময় জগৎ যে অনিত্য, কিছুই স্থায়ী নয়—ইহাই তো পরম আশ্বাসের কথা; কারণ স্থিরতাই মৃত্যু, যাহা গতিহীন তাহাই জড়স্তূপ; জীবন অর্থে সেই গতিধারা—যাহা কখনও থামিবে না, অতএব যাহার শেষ নাই—সৃষ্টিরও যেমন শেষ নাই, ধ্বংসেরও তেমনই শেষ নাই। এই যে অনাদ্যনন্ত কালস্রোত, ইহার সহিত নিজ জীবিত-চেতনা মিলাইয়া লইতে পারিলে কোন ভাবনাই থাকে না; অনিত্যকেই নিত্য-আনন্দের নিদান বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে সকল মোহ দূর হয়—কোনও দায়িত্ব, কোনও বন্ধন আর থাকে না। পথের শেষ নাই বলিয়াই নিত্য-নূতনের আশায় উৎসাহে আত্মার অবসাদ ঘটে না, ক্রমাগত "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে"—অন্তরের এই চির অতৃপ্তিই আত্মাকে অসীমের সন্ধানে ব্যাপৃত রাখিয়া তাহার অফুরন্ত বিকাশের সমাপ্তি ঘটিতে দেয় না। সৃষ্টির অনন্ত-প্রবাহিনী সেই মহাজীবনধারাকে সম্বোধন করিয়াই কবি এই অপূর্ব্ব স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুই বিভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীত। এক হইতে অপরটিতে সংক্রমণের কোনও সহজ সরল সেতু নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতায় একটি গভীর বিধুরতার ভাব আছে; জগতের কঠোর নিয়তিকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অন্তরের প্রেমের শক্তিকে অনুভব করিয়া সান্ত্বনা লাভের যে চেষ্টা আছে, তাহাতে নিখিল মানব-হৃদয়ের স্পন্দন রহিয়াছে। এজন্য ইহা কাব্যহিসাবে অধিকতর সার্থক হইয়াছে। এখানে কবি রূপরসশব্দস্পর্শময়ী জীবধাত্রী ধরণীর প্রত্যক্ষ রূপকে স্বীকার করিয়াছেন। 'বলাকা'য় কবির দৃষ্টি সেই প্রত্যক্ষ রূপজগতের অন্তরালে এক 'অলক্ষ্য সুন্দরী'র ধ্যান করিতেছে; তাহার যে প্রেম, সে

প্রেম কিছুকে ধরিয়া রাখিতে চায় না—সে প্রেম সর্ব্বনাশা। এখানে কবি জীবনের পরিবর্ত্তে যে মহাজীবনের জয়গান করিতেছেন, তাহা দেহমনের সর্ব্বসংস্কারমুক্ত ; স্নেহ-মমতার বন্ধন তাহাতে নাই—সে একটি অতিশয় নির্ম্মম-নিশ্চিন্ত উদাস-স্বাধীন শাক্ত-তান্ত্রিক আদর্শ। ইহাও এক প্রকার নির্ব্বাণ-মোক্ষের শূন্যবাদ। এ তত্ত্বকে কাব্যরসে মণ্ডিত করিবার শক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতেই সম্ভব হইয়াছে, তথাপি ইহাও সত্য যে, কবি এখানে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। একদিন কবি আপনার দেহ-মন-প্রাণের পাত্রে বিশ্বের যত-কিছু রূপরস একই পানীয়রূপ পান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন ; খণ্ডকে তিনি কখনও স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ডকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তখন আমরা কবির মুখে এমন সকল গভীর বাণী শুনিয়াছিলাম—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

কিংবা—

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার !
তোমারই মিলন-শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে, অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত ! ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ !

এ কথা পরম বৈষ্ণবের কথা। জীবনকে এমনভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাকে এমন মহিমময় অপরূপ করিয়া তোলা—ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগের সাধনা। এই রূপচর্য্যা ও এই প্রেম, বাংলা কাব্যে যে লাবণ্য সঞ্চার করিয়াছে, সে লাবণ্য ইতিপূর্ব্বে কুত্রাপি ছিল না; চৈতন্যোত্তর গীতি-সাহিত্যে এই লাবণ্যের যে আভাস আছে, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসঞ্চারী হইয়া সাহিত্যে জীবনকেই মহিমান্বিত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এই শেষার্দ্ধভাগ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বটে, তথাপি এই ভাগে তাঁহার কবিমানসের পরিচয় সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহারই সাহায্যে তাঁহার সকল কবিকীর্ত্তির রসরহস্য-নির্ণয়ের সুবিধা হইবে। 'বলাকা' হইতে আমি যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দ্বারা অবশ্য এই শেষার্দ্ধ ভাগের পরিচয় সমাপ্ত হইবে না। কিন্তু 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির এমন একটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা অতিশয় অর্থপূর্ণ। ইহাতে কবি-প্রাণের যে আকূতি সহসা এক অপূর্ব্ব গীতচ্ছন্দে উৎসারিত হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রারম্ভ হইতে তাহারই অস্ফুট বা স্ফুটতর আভাস পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের বহুস্থানে উঁকি দিয়াছে। অসীমের অভিসারে নিরুদ্দেশ যাত্রা, সুদূরের পিয়াসা, নিরন্তর সমুখের দিকে চলিবার আকাঙ্ক্ষা, সাধনার এক পর্ব্ব শেষ করিয়া আর এক পর্ব্বের উদ্যোগ, কেবল পথ-চলারই আনন্দ—তাঁহাকে চিরদিন প্রলুব্ধ করিয়াছে। অতএব, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, কবি সেই যে কোন্ কালে যাত্রা সুরু করিয়াছেন, আজও তাহার শেষ হয় নাই—এবং শেষ যে হইবে না, তাহার কারণ, তাঁহার কবিপ্রাণ এমন একটি বস্তুতে নিবদ্ধ, যাহার

সীমা নাই, শেষ নাই। এককালে তিনি তাঁহার কাব্যসুন্দরীকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

> আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?
> বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী !
> যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
> তুমি হাস' শুধু মধুরহাসিনী,
> বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে তোমার মনে।
> নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
> অকূল-সিন্ধু উঠিছে আকুলি'
> দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে।
> কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে ?
>
> হোথায় কি আছে আলয় তোমার
> উর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
> মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে ?
> তুমি হাস' শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না ব'লে।

—সে প্রশ্ন এখনও শেষ হয় নাই, কখনও হইবার নয়। এই যে সোনার তরী বাহিয়া তিনি চলিয়াছেন সে চলার অন্ত নাই—এখানে যাহা প্রশ্ন, 'বলাকা'য় তাহাই উত্তর হইয়া উঠিলেও, এ রহস্যের শেষ নাই ; তাই এই প্রশ্ন ও উত্তরের অশেষ ভঙ্গিই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণার উপজীব্য হইয়া তাঁহাকে চিরজীবী করিয়াছে।

এককালে তিনি সংসারের তথা মানবহৃদয়ের বিচিত্র পথঘাট পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন—মুক্তি-পিপাসা লইয়াই নানা বন্ধন স্বীকার

করিয়াছিলেন। আজ তিনি সেই লোকালয় পশ্চাতে ফেলিয়া অসীমের প্রান্তরপথে তারাখচিত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়াছেন। আজ আর জীবনদেবতা নয়, নিজের ব্যক্তিচেতনার মধ্যে অপরাশক্তির অধিষ্ঠান নয়, অথবা আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা সমর্পণের জন্য এক পরমপুরুষের আরাধনাও নয়—বিরাট বিশ্বদেবতার লীলাসাক্ষীরূপে কবি এক্ষণে সকল মোহের অতীত হইয়াছেন। সৃষ্টিকে তিনি আজ আর এক চক্ষে দেখিতেছেন। জন্মমৃত্যুর দোলায় বসিয়া তিনি মহাকালের ছন্দ-হিন্দোল হইতেই রাগরাগিণী সৃষ্টি করিতেছেন; তাই মৃত্যু যখন শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনও কবির কণ্ঠে গান বন্ধ হয় না।

আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সহিত তুলনা করিয়াছি; দূর আকাশে তুষারপুরীর মধ্যে, তাহার শৃঙ্গরাজি যেমন কখনও আবৃত কখনও প্রকাশিত হইয়া থাকে, ঋতুচক্রের আবর্ত্তন এবং আলো-আধারের ইন্দ্রজাল যেমন তাহাকে শতরূপে শতবর্ণে বিলসিত করে, অথচ নভোনীলিমার পটভূমিতে তাহার শুভ্র শেখর অবিকৃত হইয়াই আছে; তেমনই, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র-বিকাশের মধ্যে একটা মূল প্রকৃতি বা স্থির রূপ নিশ্চয় আছে; কিন্তু কাব্যরসিকের পক্ষে সে রূপ আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই; আমরা তাহার বর্ণবৈভব ও রূপ-বৈচিত্র্যের জন্যই সেই গিরিশিখরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আজ আমরা কবির কণ্ঠে যাহা শুনিতেছি, তাহাতে এক দিকে যেমন স্মৃতিস্বপ্নময় অতীত-জীবনের একটি উদাসমধুর রাগিণী ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া উঠিতেছে, তেমনই অনন্তের উদ্দেশে তীর্থযাত্রার নিশ্চিন্ত নির্ভীক পদধ্বনিও তাহাতে শুনিতে পাই—সে গানের পদচারণে ছন্দ ও নিশ্ছন্দের দ্বন্দ্বও লোপ পাইয়াছে। জানি, এ কণ্ঠ একদিন নীরব হইবে, অন্ধকারের

একমাত্র দীপশিখা একদিন কালের ফুৎকারে নিবিয়া যাইবে, তথাপি সমগ্র বাঙালী জাতির এই প্রার্থনা যে, সেদিন যেন এখনই না আসে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

মৃত্যু-দর্শন

মৃত্যুর কথা কেহ ভাবে না, এ কথা সত্য—ভাবিলে মানুষের পক্ষে বাঁচাই কঠিন হইত।

কিন্তু না ভাবিয়া থাকে কেমন করিয়া? জীবনের মোহ-রসে আচ্ছন্ন থাকে—মৃত্যু-বিভীষিকা সে মোহ ভেদ করিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; সে বাঁচা দিন হইতে দিনে, বা বৎসর হইতে বৎসরে নয়—পলে অনুপলে; তাই মৃত্যুকে দেখিলেই সে পাশ কাটায়, বেশিক্ষণ তাহার দিকে তাকাইতেও পারে না। মানুষের জীবধর্ম্ম এতই প্রবল, দেহের অণু পরমাণু এত চঞ্চল যে, থামিবার ভাবিবার অবকাশ তাহার নাই। সে যে মুখে ছুটিতেছে তাহার বিপরীত মুখে মৃত্যু তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, উভয়ে চক্রাকারে ছুটিতেছে—যখনই দেখা হয় শিহরিয়া উঠে; কিন্তু গতির বিরাম নাই, ঘূরণের নেশায় মৃত্যুকে আমরা দেখি না। যখনই সংঘর্ষ ঘটিবে তখনই চুরমার হইয়া যাইবে এ কথা সে জানে, কিন্তু ঘূর্ণনের মুখে তাহা মানে না। ইহারই উল্লেখ করিয়া মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং'।

মৃত্যুকে ভাবিতে পারা যায় না; আর সব-কিছু মানুষের জ্ঞান-গম্য—পরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, কিন্তু মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিতে না পারিলে তাহার পরিচয় করা হয় না; এবং সাক্ষাৎ করিলে আর কিছু বলিবার থাকে না। অস্তিত্বের বিলয়-মুহূর্ত্তে যে অপরোক্ষ অনুভূতি ঘটে, তাহা বজ্রাঘাতের মত; নিমেষের মধ্যে মহাশূন্য জাগিয়া উঠে—তাহাতে দিক-কাল নাই, অগ্রপশ্চাৎ নাই, স্মৃতি-বিস্মৃতি নাই; সেই

মহানির্ব্বাণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কি অনুভব হয়, তাহা কেহ কাহাকে জানাইতে পারে না। মৃত্যু কি, তাহা কেহ জানে না, জানিবার কোনও উপায় নাই ; যাহা জীবনের বিপরীত, জীব তাহা ধারণা করিতে পারে না। তাই মৃত্যুর ঘটনা মানুষ দেখে, মৃত্যুকে জানে না ; বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় সত্যকার মৃত্যুচিন্তা কেহ করে না।

যে দ্বার রুদ্ধ, যে পৈঁঠার পরে আর পদক্ষেপ নাই—যাহাকে ক্রমাগত চলিতেই হইবে সে সেদিকে চাহিবে কেন? যাহাকে জানা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ—জানার নামই জীবধর্ম্মের নিবৃত্তি, তাহাকে জানিবার প্রবৃত্তিই যে হয় না!

তাই মৃত্যুকে একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনারূপেই সে দেখে—ক্ষণিক বিভীষিকা প্রতি রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত প্রভাতের আলোকে প্রত্যহ মুছিয়া যায়, জীবনের জাগ্রত যাত্রার অবিরত তাড়নায় মৃত্যুর ফাঁক ভরিয়া উঠে। এ যাত্রায় কিছুই ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ নাই, ইহাতে বর্ত্তমান ছাড়া কাল নাই ; পরের মৃত্যু অতীত, নিজের মৃত্যু ভবিষ্যৎ—এ দুইটার কোনটাই বাস্তব নয়।

অতএব মৃত্যু কি তাহা আমরা যেমন জানি না, তেমনই জানিবার কোনও প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু তথাপি মৃত্যুর একটা রূপ আমরা দেখি, সেই পরোক্ষ দেখাও অপরোক্ষ হইয়া উঠে—যখন চোখের সম্মুখে প্রাণসম প্রিয়জনের শেষ নিশ্বাস-ত্যাগের সেই চরম মুহূর্ত্ত গণনা করি। জীবনের সেই অবসান-দৃশ্য, প্রাণবায়ু-ত্যাগের সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তখন একটা বিস্ময় বা বিভীষিকার মত কেবল একটা বিমূঢ় ভাবের উদ্রেক করে না, কেবল মন বা মস্তিষ্কের উপরেই আঘাত করে না—হৃদয় মথিত করে ;

জীবনের পুষ্প-পতাকাময় তোরণের অন্তরালে যে কঙ্কাল লুকাইয়া আছে, তাহা যেন নির্লজ্জভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। সেও মৃত্যুর স্বরূপ নয়—তবু একটা রূপ আমরা দেখি; এই দেখিতে-পাওয়ার কারণ আর কিছু নয়, আমাদেরই একটা অংশ—প্রাণবৃক্ষের একটি শাখা—তখন শুকাইয়া খসিয়া যায়। সে যেন আমাদেরই আংশিক মৃত্যু, সে মৃত্যু তখন অনুভব করি প্রাণের মধ্যে; এই প্রাণী-দেহ যে স্নায়ুশিরা-বন্ধনের শত গ্রন্থিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে সেই গ্রন্থিতে চোট লাগে—সে বন্ধন আর তেমন থাকে না, শিথিল হয়; কয়েকটা স্নায়ু হয়তো ছিঁড়িয়া যায়। যাহাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহাকে হৃদয়ের স্নেহরসে পুষ্ট করিয়াছিলাম, যাহার জীবনে আমার জীবন বেগ সঞ্চার করিয়াছে—মৃত্যু যখন তাহাকে গ্রাস করে, তখন আমারই কতকটা তাহার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; না মরিয়াও আমি মৃত্যুর স্পর্শ লাভ করি।

সাধারণে ইহাকে বলে শোক। শোক বাহিরের আক্ষেপমাত্র, সে বেশি দিন থাকে না। জীবন্ত দেহে অস্ত্রোপচার করিলে ক্ষত-অঙ্গে স্নায়ু-পেশীর যে স্পন্দন অবশ্যম্ভাবী, শোক তদতিরিক্ত কিছু নহে। এই শোক বা আক্ষেপ অস্ত্রাঘাতমাত্রেই হয়; কিন্তু সকল অস্ত্রাঘাতে অঙ্গহানি হয় না—দেহের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয় না। শোক কালে শান্ত হয়; কিন্তু সেই অঙ্গহানি, প্রাণের সেই আংশিক মৃত্যুর কোনও প্রতিকার নাই; বরং বাহিরের আক্ষেপ বা শোক যত প্রবল ততই সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আত্মীয়-বিয়োগে মৃত্যু যাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার পক্ষে সকল সান্ত্বনা নিরর্থক বলিয়াই বাহিরে কোনও আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায় না; সে মূঢ় মূক হতচেতন

হইয়া যায়, ভিতরে পক্ষাঘাত হয়—যাবজ্জীবন সে অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে সেই পক্ষাঘাত বহন করে।

ইহারই নাম মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎকার—নিজ মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষ মৃত্যুকে আর কোনও রূপে দেখিতে পায় না। সাধারণত মৃত্যুকে আমরা জানি না, জানিতে চাই না—জীবিতের পক্ষে অপরের মৃত্যু একটা অর্থহীন দুর্জ্ঞেয় উপদ্রবমাত্র; যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ মৃত্যুকে স্বীকার করা অসম্ভব—মৃত্যুকে স্বীকার করাই মরা। স্বীকার এক রকম করি—যখন বুকের পাঁজর কয়খানার কোনটা খসিয়া যায়; তখন নিজের মনের মুকুরে নিজের সেই লাঞ্ছিত হতশ্রী মূর্ত্তি দেখিয়া মুখ লুকাই, সে মুখ কাহাকেও দেখাইতে লজ্জা হয় না; মানুষের সভায় যখন বসি তখন প্রাণপণে নিজের সেই ক্ষতিচিহ্ন লুকাইয়া রাখি। যে শোক করে, সে মানুষের সান্ত্বনা সহানুভূতি চায়, সে জীবনের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে চায়—সে মৃত্যুকে দেখে নাই।

জীবনে যাহার মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় নাই—সে ভাগ্যবান, যে তাহাকে দেখিয়াও দেখে নাই—সে হৃদয়হীন। যে মৃত্যুর অন্তরালে পরম আত্মাকে আবিষ্কার করে, মৃত্যুকে যে অমৃতের সোপান বলিয়া উপলব্ধি করে, মৃত্যু কোথাও নাই বলিয়া যে ঘোষণা করে, সে—হয়, জানিয়া শুনিয়া মধুর মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়; নয়, সে কখনও বাঁচে নাই—দেহ পরিগ্রহ করিয়াও বিদেহ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ সে প্রেত-পিশাচের সামিল। মানুষ যতক্ষণ মানুষ, ততক্ষণ সে তাহার ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তা বিস্মৃত হইতে পারে না—সেই সত্তার উপরে যে ব্যক্তিত্বহীন অমৃত-সত্তার আরোপ করিয়া আশ্বস্ত হইতে চায় তাহার আত্মপ্রবঞ্চনা কৃপার উপযুক্ত বটে। কিন্তু যে সেইরূপ আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারে সে

মানুষ নয়—যে বস্তু কবি-বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, সেই হৃদয় নামক যন্ত্রটি তাহার মধ্যে বিকল হইয়া আছে। যাহারা লোক-লোকান্তরের স্বপ্ন দেখে, যাহারা মৃত্যুর পরেও অবিচ্ছেদে জীবনযাপন করার কথায় বিশ্বাস করে, তাহারা শিশুর মত রূপকথার ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তফাৎ এই যে, এক দল তত্ত্বজ্ঞানের অভিমানে হৃদয়বৃত্তি নিরোধ করে; অপর দল হৃদয়াবেগের মোহে নির্ব্বিচারে মিথ্যার শরণাপন্ন হয়।

মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই—এ কথা যতই সত্য বলিয়া মনে হউক—স্বীকার করিতে সকলেই ভয় পায়। মৃত্যুর সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই মনের মধ্যে একটা অন্ধকার শূন্য মাত্র অনুভব করি—অথচ, শূন্য বা নাস্তিত্বের কল্পনাও আমাদের সংস্কার-বিরোধী; তাই মন সেই শূন্য বা নাস্তি-চেতনাকে নানা কৌশলে আবৃত করিবার চেষ্টা করে—সেই অন্ধকার গহ্বরকে কোন কিছু দিয়া ভরাইয়া রাখিতে চায়। মানুষ মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা চায়—তাহার অর্থ, মৃত্যুকে সে মানিতে চায় না; অস্তিত্বের ঐকান্তিক বিলোপ তাহার জীব-সংস্কারের পক্ষে বিষবৎ মারাত্মক, তাই আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মানুষ সাধারণ মৃত্যু-ঘটনায় বিশেষ বিচলিত হয় না; যে মরিয়া গেল, জীবন-ব্যাপারে তাহার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকে না বলিয়া তাহাকে সে আর গণনার মধ্যেই আনে না। শোকের আক্ষেপ মনের একটা সাময়িক পীড়া মাত্র; যে বাঁচিয়া আছে সে প্রাণবন্ত—প্রাণ-হীনের সঙ্গে প্রাণীর যে সম্পর্কহীনতা, তাহা ধর্ম্মের মত দুর্ল্লঙ্ঘ্য—যে মৃত সে আর আমাদের কেহ নয়, এই সংস্কার যেন প্রাণের মর্ম্মমূলে জড়িত হইয়া আছে। অতএব শোক মিথ্যা, সান্ত্বনা সুসাধ্য।

মৃত্যু জীবনের উপরে রেখাপাত করিতে পারে না। মৃত্যুর সম্বন্ধে শিশুর যে মনোভাব—নিত্যসঙ্গীরও অকস্মাৎ তিরোধানে শিশুর যে আচরণ—বয়স্ক ব্যক্তির আচরণও তাহাই, মূল জীবন-চেতনার বা সত্যকার জীবন-ধর্ম্মের তাগিদে আমরা মৃতজনকে আমাদের জগৎ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিই; অমৃতের আশ্বাস, ধর্ম্মের সান্ত্বনা, পরলোকের কাহিনী-কল্পনা—এ সকলই তাহার প্রমাণ। মৃতজন আমাদের প্রাণের সন্নিকটে আর বাস করে না; আমাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাহাদের কোনও যোগ নাই। যাহার কায়া নাই তাহার সঙ্গে দেহধারীর কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না—তাই থাকেও না; তথাপি যে সম্পর্কের দাবি করি তাহা ভান মাত্র; তাহা যে সত্য নয় তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র; মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে মৃতজনের সম্বন্ধে কোনও চেতনা, কোনও সজ্ঞানতা, তাহার মধ্যে কুত্রাপি নাই। শিশুর আচরণ অবিমিশ্র সত্য, তাহাতে ভান নাই; বয়স্ক ব্যক্তির স্মৃতি নামক একটা মানস-ব্যাধি আছে—হয়তো লজ্জাও আছে, তাই সে মাঝে মাঝে স্মরণ করে, দুঃখ করে, লজ্জা পায়।

মানুষ আপনার চেয়ে কাহাকেও ভাল বাসে না; যদি কাহাকেও খুব ভাল বাসে, তবে তাহা আপনার চেয়ে নয়—আপনার মত। তাই স্নেহ যত গভীর হউক, প্রেম যত বড় হউক, তার মূলে স্বার্থ থাকে। পরের জন্য আপনাকে হত্যা করা—পরের মৃত্যুতে নিজের জীবন-সংকোচ করা জীবের ধর্ম্ম নহে, মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জীবেরও নহে। যে মরিয়া গেল তাহাকে ভাল বাসিতাম, খুব ভাল বাসিতাম—তাহার অর্থ, আমার প্রীত্যর্থে তাহাকে প্রয়োজন ছিল; তাহার মৃত্যুতে

আমার আত্মপ্রীতির বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আত্মপ্রীতির জন্য এই যে পরকে আশ্রয় করা—ইহারই নাম হৃদয়-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের চরম বিকাশে মানুষ শেষে আত্মবিস্মৃত হয়, আত্মরক্ষা শেষে আত্মবিসর্জ্জনে পর্য্যবসিত হয়। এই বিসর্জ্জন বা বিসৃষ্টিও আত্মহত্যা নয়—আপনাকেই ভিতর হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া, বিষয়ান্তরে আপনাকেই সৃষ্টি করা। এতখানি কল্পনা সকলের নাই, কিন্তু মূলে সকলের ধর্ম্মই এক—সকলেই আত্মধর্ম্মী, আত্মব্রতী। যাহাকে ভালবাসি, স্নেহ করি, সে আমার আত্মীয়, আত্ম-সম্পর্কিত, অর্থাৎ আত্মপ্রীতির আশ্রয়। সেই আত্মীয় যখন মরিয়া যায় তখন যে শোক উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণত স্বার্থহানির শোক। কিন্তু তাহাকে আর কোনও প্রয়োজনে পাইব না, এই জীবনের প্রত্যক্ষ লীলামঞ্চে কোনও সূত্রে সে আমার সঙ্গে আর বাঁধা নাই; মৃত্যুর পরে যদি সে থাকে-ও, তবে তাহার জাত্যন্তর ঘটিয়াছে—জীবিত আত্মার সঙ্গে মৃত আত্মার কোনও গুণ-সামান্য নাই, অতএব সে আর আত্মীয় নহে;—প্রাণের গভীরতম চেতনায় মানুষ ইহাই অনুভব করে, তাই অজ্ঞানে প্রাণ-ধর্ম্ম পালন করে; কেবল মানস-ধর্ম্মের তাড়নায় তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। মানুষ কাঁদে, কিন্তু প্রকৃতি হাসে—জীবধর্ম্ম পালন করিতে সে বাধ্য, করে-ও। এক দিকে শোক করে, আর এক দিকে নিজ জীবনের প্রয়োজন পুরাপুরি সাধন করে।

আত্মীয়-বিয়োগে আত্মার বিয়োগ হয় না; আমাকেই কেন্দ্র করিয়া যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে, আমারই প্রয়োজনে যাহার অস্তিত্ব, আমারই প্রীত্যর্থে যাহাকে আমি চাই—যতক্ষণ আমি বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ তাহার ক্ষতিবৃদ্ধির হিসাবে কোনও স্থায়ী তারতম্য হইতে পারে না।

আমি ছাড়া আর সবটাই এই জগতের অন্তর্গত ; এই আত্মপ্রয়োজনাধীন জগতের এক টুকরাও হারাইবে না—যতক্ষণ না আমি আমাকে এতটুক হারাইতেছি। সকলই পর, সকলই পর, সকলই পর। এ পরের যেটুকুকে আপন বলিয়া ভাবি, তাহাও জীবনের লীলা-সুখের জন্য নিজ আত্মার অভিমান পরের উপর আরোপ করা ; কাজেই তাহা মিথ্যা। প্রিয়জনের মৃত্যুতে সেই অভিমান ব্যর্থ হয়—সে যেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দেয়, তাই আঘাত পাই, সেই আঘাতের নাম শোক। তারপর, সে ক্ষতি তখনই অন্য দিক দিয়া পূরণ করিয়া লই ; কিংবা ব্যয়-সংক্ষেপ করি, অর্থাৎ বৈরাগ্য-সাধনা করি। আত্মীয়ের মৃত্যুতেই প্রমাণ হয়—সে কতদূর অনাত্মীয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত মিথ্যা ; মানুষের ভাগ্য-বিধাতা মানুষকে কতটা আত্মৈক-শরণ, আত্মপরায়ণ, নিঃসঙ্গ, একক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহার জীবনে স্বকর্ম্মনির্দ্ধারিত পথ বা আত্মস্বার্থসাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আত্মীয়-অনাত্মীয় যাহার দশা যেমন হউক, যে যখন যেখানে যেরূপ করিয়াই জীবনলীলা শেষ করুক—আসলে তোমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তোমার পথে তুমি চলিতে থাকিবে, তুমি ফিরিয়াও চাহিতে পার না—চাহ না। ফিরিয়া যদি চাহিতে, তবে তুমিও মরিতে—পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ-কাহিনী স্মরণ কর। তুমি মরিতে চাও না—তাই ফিরিয়া চাহিতেও নারাজ। তাই বিশ্বাস হয়, অপরের মৃত্যু অপরেরই—সে যতই প্রিয়জন হউক ; সে মৃত্যু আমাদের নিকট অবাস্তব—নিজের মৃত্যুই একমাত্র বাস্তব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুকে আমরা দেখিয়াও দেখি না ; তথাপি সময়ে সময়ে প্রাণসম প্রিয়জনের মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিকে অপলক

নিশ্চল করিয়া রাখে। পরের মৃত্যু একটা নিত্যদৃষ্ট ঘটনা মাত্র; সে ঘটনাকে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশও যেন আমরা পাই না—একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি হয় মাত্র; সে অনুভূতিকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিই না, মনের দরজা বন্ধ করিয়া দিই। জীবনের বাসগৃহে একটা ভূতের ঘর আছে, সে ঘর খুলিয়া কখনও উঁকি মারি না—সময়ে সময়ে যখন আপনি খুলিয়া যায়, তখন তাহাকে বন্ধ করিয়া দিই। ইহাই আমাদের স্বভাব—ইহা না হইলে আমরা বাঁচিতাম না। কিন্তু যাহাকে এমন করিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, যাহার নিশ্বাস-বায়ু আমারই নিশ্বাসবায়ুর প্রতিশ্বাস বলিয়া মনে করিতাম; যাহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া বহু দিন ও বহু রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যাপন করিয়াছি; সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়, আবার সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত, অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা—যাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রাণশক্তির গতি নিরীক্ষণ করিয়াছি, নাড়ীর বেগ বা হৃদ্‌স্পন্দন গণিবার সময় মৃত্যুর আক্রমণ নিজের নাড়ীতে, নিজের হৃদ্‌স্পন্দনে অনুভব করিয়াছি; যাহার মৃত্যুকরনিষ্পেষিত কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শুনিয়া, শুধু আমার নয়, জগতের সকল জীবিত জনের জীবন-শ্বাসকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইয়াছে;—মৃত্যু যখন তাহাকে কবলিত করিল, বিস্ফারিত অক্ষিতারকা স্থির জ্যোতিহীন হইয়া শেষে জালাবৃত হইয়া গেল; পরে ক্ষণকাল দেহের আনাভি-কণ্ঠ আন্দোলন, ও শেষে মুখ-গহ্বর হইতে প্রাণবায়ুর শেষ-শ্বাস-নির্গম প্রত্যক্ষ করিলাম—যে মুহূর্ত্তে সে মরিয়া গেল সেই মুহূর্ত্তকে চাক্ষুষ করিলাম, তখন কি দেখিলাম? কি অনুভব করিলাম? দেখিলাম, একটা জীবনের অবসান হইয়া গেল—বুঝিলাম, যে ছিল সে আর নাই! সে আর নাই, এই পরম সত্য উপলব্ধি

করিলাম—উপলব্ধি করিলাম, আমি বাঁচিয়া আছি। শবদেহ বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম, মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলাম; কারণ, তখন স্পষ্ট বুঝিলাম, অবশিষ্ট যাহা তাহা এই দেহটা, উহার অতিরিক্ত আর কিছু অস্তিত্বের সীমানায় আর নাই। চিরদিনের শিক্ষা-সংস্কার বিস্মৃত হইলাম—যে গেল সে ওই দেহটা নয়, আর কিছু; সে আর উহার মধ্যে নাই, ত্যক্ত বসনের মত সে উহাকে পরিহার করিয়া গিয়াছে—এ সকল কথা বিশ্বাস হইল না। দেহের দিকে না তাকাইয়া তাহার আত্মার প্রয়াণ-পথ কল্পনা করিতে পারিলাম না; কারণ, মৃত্যু কি, তাহা সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। জীবন ওই দেহেরই ধর্ম্ম—জীবিতের মূর্ত্তি ওই দেহ—ওই মূর্ত্তি মরিয়াছে, সে আর বাঁচিয়া নাই—সে আর নাই। তবু যতক্ষণ ওই দেহটা আছে, প্রাণহীন হইলেও তাহাকেই দেখিতেছি—তাহাকে আর কোনও রূপে কল্পনা করিতে পারি না। যে রহস্যময় প্রাণবায়ু ওই দেহকে ত্যাগ করিয়া গেল, সে মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাণ হইলে শিখা যেমন শূন্যে বিলীন হয়। সে বায়ু ওই দেহকেই সঞ্জীবিত করিয়াছিল—তাই তাহার এত মূল্য; সেই বায়ু এখন নিঃশেষ হইল, মানুষ মরিল। শব-মুখে যতই চাহিয়া দেখি, ততই মনে হয় সে মুখ যেন কাঙালের মুখ—প্রাণ হারাইয়া সে যেন সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে, তার আর কিছু নাই—কিছু নাই! সে মুখে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম—এই শেষ! এইখানেই সব শেষ—তাহার অস্তিত্বের শেষ নিদর্শন ওই দেহ। মৃত্যু তাহার মুখে ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্ন অঙ্কিত করে নাই—অতি দীন দুঃখী ভিখারীর মত সে মুখে একটি বড় করুণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে; জীবন ও মৃত্যুর সন্ধি-মুহূর্ত্তে যে সত্য তাহার মুখে মুদ্রিত হইতে দেখিলাম তাহাতে সকল

মিথ্যা সংস্কার দূর হইল; যে অবস্থা ধারণা করিতে পারি না, জীবিতের পক্ষে যাহা অপরোক্ষ করা অসম্ভব—সেই চিরনির্ব্বাণ, সেই মহাশূন্য বা চরম পরিণাম যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। ওই প্রাণহীন শবদেহও যতক্ষণ ধ্বংস না হয়, ততক্ষণ তাহা সত্য; সৃষ্টির মূল সত্য—যে মূর্ত্তি বা কায়া, তাহা তখনও সম্মুখে বিদ্যমান। মনে হইল প্রাণ নাই, তবু সে আছে—প্রাণহীন সে; সে-হীন প্রাণ—যাহাকে আত্মা বলে, তাহা কল্পনা করিতেই পারিলাম না; যাহাকে হারাইলাম তাহার শেষ সত্য ওই দেহটা, তাই সেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম।

ইহাই মৃত্যু—দেহ-বিযুক্ত আত্মার লোকান্তর-প্রাপ্তি নহে। মৃত্যু-শোক বিরহ-দুঃখ নয়, কারণ মৃত্যু লোকান্তর-বাস নয়—অতলস্পর্শ শূন্য-গহ্বর। যে আর নাই—তাহার সম্বন্ধে বিরহ-ভাব হয় কেমন করিয়া? কাহারও মৃত্যু যদি গভীরভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে, যদি তাহাকে এমন ভালবাসিয়া থাক যে তাহার অভাবে—তোমার কি হইল না ভাবিয়া—তাহার কি হইল ভাবিতে পার, তবেই মৃত্যুর স্বরূপ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যে মরিল সে যে আর নাই—এ কথা ভাল করিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করা দুরূহ; আমার জীবন-সংস্কার অর্থাৎ 'আমি আছি'র সংস্কার সে পক্ষে প্রধান বাধা। এই সংস্কার যদি মুহূর্ত্তের জন্য ঘুচিয়া যায় তবে মৃত্যু সম্বন্ধে কোনরূপ কল্পনা-বিলাস আর টিকিতে পারে না। প্রাণসম প্রিয়জনের মৃত্যু-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া যখন মনে হয়—আমি আছি, আর, সে নাই; আমার বাঁচিয়া থাকার তুলনায় তাহার না-বাঁচার অবস্থা যখন তীব্রভাবে অনুভব করি, তখন এই ভাবিয়া মর্ম্মমূল ছিঁড়িয়া যায় যে, আমি যাহা ভোগ করিতেছি সে তাহা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। যে আয়ু অপেক্ষা পরম ধন আর নাই,

যে আয়ু আমি এখনও ভোগ করিতেছি—শোকের আবেগে নিজের সেই আয়ুকে যতই ধিক্কার দিই না কেন, অন্তরের অন্তরে যাহার মূল্য সম্বন্ধে আমি সচেতন—সেই আয়ু—অস্তিত্বের সেই একমাত্র স্বাদ-সুখ হইতে যখন তাহাকে বঞ্চিত হইতে দেখি, তখন কপট বৈরাগীর মত, নিজে গোপনে ভোগসুখে আসক্ত থাকিয়া অপরের সম্বন্ধে সুমহান বৈরাগ্যের আদর্শ প্রচার করার মত, নিজে জীবিত থাকিয়া মৃতের জন্য আত্মা বা পরলোকের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখনই মৃত্যু কি, তাহা বুঝিতে পারি। যখন জীবন-বঞ্চিত হতভাগ্যের সেই দুঃখ অনুভব করি—আমার অভাব নয়, তাহার সেই অভাব—সেই সব-শেষ-হওয়ার মহা দৈন্য যখন উপলব্ধি করি, তখন এক দিকে জীবনকে যেমন পরম আশীর্ব্বাদ বলিয়া বুঝি, তেমনই, আর এক দিকে মৃত্যু যে কত বড় অভিশাপ, তাহাও অন্তরে অন্তরে অনুভব করি।

পরক্ষণেই মনে হয় যে রহিল না, যে আর নাই, তাহার জন্য দুঃখ কি?—দুঃখ তাহার, না তোমার? জীবন-বঞ্চিত হইয়াছে কে? 'হইয়াছে' কথাটা যাহার সম্বন্ধে খাটে তাহার একটা সত্তা মানিতে হয়—কিন্তু সে যে নাই! মৃত্যু যে মহা অবসান—চির সমাপ্তি! তখন বুঝি, দুঃখটা আমার—আমারই সম্পর্কে, আমারই স্বার্থজড়িত। শোক করিতে গিয়া মনের মধ্যে বাধা পাই। চোখ ফাটিয়া যে অশ্রুর উদ্গম হয়, তাহার হেতুরূপে আমা ছাড়া আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাই না।

তখন বুঝিতে পারি, যাহার শব-দেহ বার বার বক্ষে ধারণ করিতেছি—সে আর নাই বটে, তবু আমার জীবনে তাহার জীবনের রেশ রহিয়াছে—আমি যে আছি! এই যে 'সে নাই' ভাবিতেছি ইহা তো আমারই ভাবনা, 'না থাকা' যে কি, তাহা যে নাই সে তো আর বুঝে না;

যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণই মৃত্যু আছে—যাহার মৃত্যু ঘটে তাহার আর কিছু নাই—মৃত্যুও নাই! শবদেহ যেমন চিতার অগ্নিজ্বালা অনুভব করে না, কিন্তু জীবিত দেহের একটা অঙ্গ যখন অগ্নিদগ্ধ হয় তখনই দহন-জ্বালা যে কি তাহার অনুভব হয়—তেমনই, মৃত্যু-রূপ জ্বালার অনুভূতি জীবিতেরই হইয়া থাকে। আবার, অপরের দেহ দগ্ধ হইলে সে জ্বালা যেমন আমি অনুভব করি না, তেমনই পরের মৃত্যু যতই অনুমান-সাপেক্ষ হউক, আমার অনুভূতি-গোচর হয় না। কিন্তু আমারই একটা অঙ্গ দগ্ধ হওয়ার মত যখন আমার জীবনের অংশস্বরূপ কোনও পরম প্রিয়জনের মৃত্যু হয়, তখনই আমি মৃত্যুকে অনুভব করি—আমি যখন একেবারে মরিব, তখন আমিও তাহা অনুভব করিব না। মৃত্যুকে অপরোক্ষ করার আর কোনও উপায় নাই—আমারই জীবনের অংশ-রূপে আর একটা জীবন যখন আমার মধ্যে মরিয়া থাকিবে, তখনই মৃত্যুর সহিত আমার পরিচয় ঘটিবে; যে মরিল, মৃত্যু যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমারই জীবনের মধ্যে বাসা বাঁধিল! অতএব মৃত্যুর জন্য যে সত্যকার শোক সম্ভব—তাহা মানুষের নিজেরই মৃত্যু-শোক; মৃত্যুকে আর কোনও অবস্থায় আমরা বুঝি না, অনুভব করি না—আর সকল মৃত্যুই আমাদের নিকটে অবাস্তব; সে সকল মৃত্যুতে যে শোক আমরা করিয়া থাকি তাহা সুখবোধের বিপরীত একটা দুঃখবোধ মাত্র—নানা অন্যবিধ যন্ত্রণার মতই একটা যন্ত্রণা। সে মৃত্যু বাহিরের আঘাত মাত্র, তাহা জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয় না, প্রাণের মর্ম্মস্থানে ক্ষতচিহ্নরূপে বিরাজ করে না; করিলে, সে শোক একটা ঝড়ের মত জীবনের শাখা-প্রশাখাগুলিকে কিছুকাল আন্দোলিত করিয়াই নিবৃত্ত হয় না—মূল হইতে রস-সঞ্চারে বাধা দেয়, পত্র পুষ্প বিবর্ণ হইয়া যায়; সম্পূর্ণ

অলক্ষিতে তাহার প্রভাব ক্রমশ ভিতর হইতে বাহিরে প্রকট হইয়া পড়ে।

কিন্তু এমন ভাবে আমরা মৃত্যুকে সচরাচর অপরোক্ষ করি না—পর এমন আত্মীয় হয় কদাচিৎ। অতি বড় শোকও যে কালে আরোগ্য হয়—আমরা যে সান্ত্বনা খুঁজি এবং পাই, তাহার কারণ, মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি আমরা করি না, মৃত্যু যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় পাই ; যে মরিয়াছে তাহাকে বিস্মৃত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করি—বাঁচিতে চাই। স্ত্রী-বিয়োগে, সন্তান-বিয়োগে, বন্ধু-বিয়োগে আমরা যে ব্যথা পাই, তাহা মৃত্যু-চেতনা নয়—জীবনেরই একটা দুঃখবোধ—সুখভোগে একটা বাধার মত। কিন্তু মৃত্যুকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার অবকাশ যদি কখনও ঘটে, তবে জীবনের যত কিছু সংস্কার মুহূর্ত্তে উড়িয়া যায়—শোক ও সান্ত্বনা দুইই অনর্থক বলিয়া মনে হয়। সে অবস্থায়—যাহাদের হৃদয়বৃত্তি অতি গভীর ও প্রবল, তাহারা প্রিয়জনের মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ নিজেও মরিয়া যায় ; এমন যুগপৎ মৃত্যুর দৃষ্টান্ত বিরল নহে—'মৃতে ম্রিয়তে যা' বলিয়া যে প্রেমিকার বর্ণনা আমরা পাঠ করি, তাহা মিথ্যা নয়। যাহাদের জ্ঞানবৃত্তি প্রবল, তাহারা—শূন্যবাদী, নাস্তিক বা বৈদান্তিক মনোবৃত্তির অনুশীলন করিয়া, কাঠ-পাথরের মত হইয়া—আত্মপ্রসাদ লাভ করে ; মৃত্যুকেই মোক্ষ বলিয়া বুঝে, কেবল তৎপূর্ব্বে অবশিষ্ট জীবনটা কোনও রূপে অতিবাহিত করিবার জন্য কূটতর্কের জালে তাহাকে আবৃত করে। যাহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবল, তাহারা মৃত্যুকে স্বীকার করিয়াও জীবনের সুযোগটা উত্তমরূপে ভোগ করিতে চায় ; সত্যকার শক্তিমান নাস্তিক তাহারাই—জীবনের মদিরাপাত্র আকণ্ঠ পান করিয়া কীর্ত্তির নেশায় মশগুল থাকে ; মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করে না—শেষ কোথায় ? ইহারাই

পরম বিস্ময়ের পাত্র—কারণ, ইহারা সাধারণ নরনারীর মত ক্ষুদ্রমনা বা স্বার্থমোহগ্রস্ত নয়। তথাপি ইহারা মৃত্যুর মত এত বড় একটা ঘটনার সম্বন্ধে উদাসীন—মনের মধ্যে সে প্রশ্নকেই যেন ঠাঁই দিতে নারাজ।

মৃত্যুতে শোক করা, আর মৃত্যুকে দেখা—এই দুইটা এক নয়; এই কথাটাই বার বার বলিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। শোক সকলেই করে; কিন্তু মৃত্যুকে দেখিতে সকলে চায় না, বা পারে না। মৃত্যুকে যথার্থ দেখিতে পাইলে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা বজ্রালোকের মত—জীবনের সকল তিমির-সংস্কার বিদীর্ণ করিয়া সে আলোকচ্ছটা মানুষের মানস-চক্ষু ধাঁধিয়া দেয়; সে বজ্র যাহার উপর পতিত হয় সে তন্মুহূর্ত্তেই মহা রহস্য-সাগরে বিলীন হইয়া যায়। যে তাহাকে দেখিয়াছে মাত্র, সেই বজ্রের আলোক যাহার দুই চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছে, সে অস্তিত্বের ঐকান্তিক অভাব চকিতে অনুভব করিয়াছে; সে বুঝিয়াছে, সকল জ্ঞানের সীমা কোথায়—মানুষের মানসবৃত্তি মহাশূন্যকে আচ্ছাদন করিয়া জীবন-রঙ্গভূমির জন্য যে মিথ্যা-বিচিত্র যবনিকা রচনা করে তাহার ছিদ্র কোথায়। সে ছিদ্রমুখে দৃষ্টি সংলগ্ন করিলে যে সত্যের উপলব্ধি হয়, তাহাতে এই প্রতীতি জন্মে যে, জীবনের বাহিরে আর কিছুই নাই—মৃত্যুর পরে আর কোনও রহস্য নাই, মৃত্যু অমৃতের দ্বার নহে। এই জীবনই—'তিক্ত হোক, মিষ্ট হোক—একমাত্র রস'। ইহার হিসাব বা ব্যবস্থা করিবার কালে কোনও অদৃষ্ট ভবিষ্যৎকে গণনার মধ্যে গ্রহণ করা ভুল; সে ভরসা ত্যাগ করিয়া বীরের মত জীবন-যাপনের নীতি স্থির কর; ভগবান বা পরলোক, আত্মার অমরতা বা ব্রহ্মণ—এ সকল মরীচিকা মাত্র; মৃত্যুকে চাক্ষুষ করিবার মত সাহস নাই বলিয়া,

জীবনকে যথার্থরূপে ভোগ করিবার মত হৃদয়-বল নাই বলিয়া, এ পথ্য হজম করিবার মত পরিপাক-শক্তি নাই বলিয়া—সাধারণ জীব আমরা দুধে জল মিশাইয়া, নানা পেটেণ্ট ঔষধের সহযোগে জীবন-পিপাসা নিবৃত্তির উপায় করিয়া থাকি।

মৃত্যুকে যে যথার্থরূপে দেখিয়াছে, সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে—মিথ্যা হইতে সত্যে নব-জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার মানস-প্রকৃতির একটা পরিবর্ত্তন এই হয় যে, সে কোনও কিছুর পরিণাম বা ভবিষ্যৎ পূর্ণতায় আর বিশ্বাস করে না। সে আর যাচ্ঞা করে না, প্রাথনা করে না—লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল তাহার নিকটে সম-মূল্য। জীবন-বিধাতার নিয়তি-রূপ সে মানিয়া লয় বটে, সে শক্তিকে সে প্রত্যক্ষ করে জীবন-মৃত্যুর বন্ধন-পাশরূপে—সে শক্তি ঈশ্বর নয়, তাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই; এই জগতের অণু-পরমাণু হইতে মানুষের প্রাণ পর্য্যন্ত সৃষ্টির যত কিছু রূপ-বৈচিত্র্য যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন, সেই নিয়ম-বন্ধনের মূল-গ্রন্থিরূপেই সে তাহাকে চিনিয়া লয়; সে গ্রন্থি—আপনাকে আপনি উন্মোচন করা দূরে থাক—একটু শিথিল করিতেও পারে না। ইহাও সে বুঝে—তাহার সেই শক্তির সীমা কতদূর। আমার জীবন-সংস্কারের বাহিরে আমার উপরে তাহার অধিকার কোথায়? জীবনে আমি তাহারই স্ব-বন্ধন-রজ্জুতে আবদ্ধ আছি; মৃত্যুতে আমি সকল বন্ধনমুক্ত—অস্তিত্বের বহির্ভূত। অতএব যে মৃত্যুর স্বরূপ-সন্ধান পাইয়াছে—সে আশাহীন, ভয়হীন; তাহার পরিণাম-চিন্তা নাই, তাহার ভগবান নাই। সে হাতযোড় করিয়া কিছুই যাচনা করে না। যে কেহ এইরূপ দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সুযোগ-মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে দেখিতে পাইয়াছে—সে দেখা এমন দেখা যে, তাহার পর জীবন-সংস্কারের

অনুকূল কোনও রঙিন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। জীবনের নিশীথ-প্রহরের যে লগ্নে সকলে ঘুমাইয়া থাকে, সে তখন সহসা জাগরিত হইয়া প্রকৃতির নেপথ্যগৃহে দৃষ্টিপাত করিয়াছে; সেখানে যে দৃশ্য তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে দুই চক্ষের মায়া-অঞ্জন মুছিয়া গিয়া সর্ব্বমোহের অবসান হইয়াছে—সে চরম সত্যের দীক্ষালাভ করিয়াছে।

মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে—পশুও করে; পশুর জীব-সংস্কার অস্পষ্ট, তাই তাহার ভয়ও অস্পষ্ট। এই অস্পষ্ট সহজাত মৃত্যু-ভয়ের উপরে মানুষ খুব বড় একটা কাল্পনিক ভয়কে খাড়া করিয়াছে—'the dread of something after death'। মানুষ বাঁচিতে চায়—কারণ, বাঁচিয়া-থাকার একটা জ্ঞান তাহার আছে—দেহগত জীব-সংস্কার ছাড়া একটা মানস-সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে; এই সংস্কার বশে সে ইহজীবনকে পরজীবনে প্রসারিত না করিয়া পারে না। এই অন্ধ প্রাণগত বিশ্বাসের বশে সে মৃত্যুকে একটা জীবনান্তর সেতু বলিয়া মনে করে—এই সেতুই বৈতরণী, এক পার হইতে আর এক পারে পঁহুছিবার অগ্নিময় খেয়া-পার। পার হওয়ার পর সে থাকিবে; কিন্তু কি অবস্থায় থাকিবে তাহা জানে না। মৃত্যুর সঙ্গেই যদি জীবন-শেষ না হয়, তবে জীবনের শেষ কোথায়? সেই অনন্ত জীবন এক দিকে যেমন তাহাকে আশ্বস্ত করে, অপর দিকে অবস্থান্তরের অনিশ্চয়তা তাহাকে অধিকতর শঙ্কাকুল করিয়া তোলে। মনুষ্য-সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস অতীত কালে যতদূর আমাদের দৃষ্টিরোধ না করে, তাহাতে—খুব আধুনিক যুগ ছাড়া আর আর সকল যুগে—মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধীয় এই ধারণাই তাহার জীবনকে সমধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষ তাহার জীবনের

অর্দ্ধেক—কি তাহারও বেশি—ভগবান ও দেবতাকুলকে বাঁটিয়া দিয়াছে, জীবনের সূর্য্যালোক মৃত্যুপারের রহস্যময় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছে, জীবনের উপরে মৃত্যুচিন্তাকে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে প্রশ্রয় দিয়াছে। এই ভয়-সংশয় আশা-বিশ্বাস তাহার সর্ব্ববিধ ভাবনা ধারণা—হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্তুগুলিতে পর্য্যন্ত—জড়াইয়া আছে ; সে এই নশ্বর দেহের ক্ষুৎপিপাসাকে অমৃতপিপাসায় শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ভোগের মধ্যে ত্যাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনুষ্য-চরিত্রকে একটা বিরাট বীর-মহিমার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এ সকলের মূলে ওই এক সংস্কার—মৃত্যুই শেষ নয়, আত্মা অমর, তাহার গতি লোকলোকান্তরে অপ্রতিহত, এ জীবন তাহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। এইরূপ ভাবনার দ্বারা জীবনকে শোধন করিয়া মানুষ যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছে, মৃত্যুকে মহিমান্বিত করিয়া মৃত্যু-ভয় নিবারণের যে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মানুষ জীবিতকালেই মৃত্যুর সাধনা করিয়াছে—জীবনের অনেকখানি মৃত্যুর নামে উৎসর্গ করিয়া একটা আপোষ করিতে চাহিয়াছে ; নিরতিশয় শূন্য যাহা তাহাকে কল্পনায় পূর্ণ করিয়া সে বিভীষিকা হইতে যতটা সম্ভব বাঁচিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই যে মিথ্যা, ইহাই আজও পর্য্যন্ত জীবনের মূল ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। জীবন একটা প্রকাণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনা—মানুষের যত কিছু ভাবনা সাধনা এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস।

অতি আধুনিক কালে মানুষের এ বিশ্বাস টলিতে সুরু করিয়াছে, মানুষ ভগবান পরলোক প্রভৃতিতে আর তেমন আস্থাবান হইতে পারিতেছে না, আত্মপ্রবঞ্চনার শক্তি, অর্থাৎ নিছক ভাব-চিন্তা বা কল্পনার শক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। জীবন ও জগৎ এখন বে-আব্রু হইয়া

পড়িয়াছে, প্রত্যক্ষের তাড়নায় অপ্রত্যক্ষের রহস্য বা ভয়-বিস্ময় এখন ফিকা হইয়া পড়িতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, তাহার ফলে মানুষের আত্ম-প্রত্যয় যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, মানুষ যেন আত্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। মৃত্যুকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখার যে কথা বলিয়াছি, সে বিষয়ে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই—স্বাভাবিক কারণেই তাহা হইতে পারে না; অথচ মানুষ অপ্রত্যক্ষের ভয় বা আশ্বাস হারাইতেছে। প্রত্যক্ষ জীবনের কোনও মহত্ত্ব সে উপলব্ধি করে না—ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালের যত কিছু সুখ দুঃখ, কেবলমাত্র ভোগ-করিতে-পারা বা না-পারার মূল্যে সে গ্রহণ করিতেছে; জীবনকে সে পণ্যস্ত্রীর মত ভোগ করিতে চায়, মৃত্যু সম্বন্ধে সে উদাসীন।

মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের মনোভাবের এই দুই দিক তুলনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য ধারণা জীবনের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনই প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ্যা কল্পনার প্রয়োজন আছে; সেই মিথ্যাই মানুষের জীবনকে যে রঙে রঙিন করিয়া তোলে, তাহার রক্তে যে অবসাদ বা উন্মাদনা জাগায়, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ হয়—কামনার শক্তি বাড়ে। দেহযন্ত্রে রক্ত-সঞ্চালনই জীবন নহে—সেটা জীবন-ক্রিয়া মাত্র, কামই জীবনীশক্তির মূল। এই কাম যদি কল্পনাহীন হইয়া পড়ে—যদি জীবন-ক্রিয়ার বাহিরে তাহার কোনও স্ফূর্ত্তির অবকাশ না থাকে, তবে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার ভোগ-ক্ষমতাও কমিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত মানুষ যেখানে যত শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহার মূলে আছে প্রবল কামনা। তাহাকে জয় করা, অথবা জয়ী করা—এই উভয়ের শক্তি এক; এ শক্তির মূলে আছে মরণান্তরিত মহাজীবনের স্বপ্ন, অমরতার আশ্বাস। তাহার

ভরসায় মানুষ যেমন ইহজীবনের সর্ব্বস্ব হাসিমুখে ত্যাগ করিতে পারে, তেমনই ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া জীবনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভোগের পথে নিঃশেষে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে; কারণ উভয়ত্র এ বিশ্বাস আছে যে, ইহাই শেষ নয়—আমার মৃত্যু নাই, শেষ পর্য্যন্ত কোন খানে ক্ষয় বা ক্ষতির আশঙ্কা নাই; যে অসীম অনন্ত জীবন সম্মুখে নিত্যকাল প্রসারিত হইয়া থাকিবে, তাহাতে কত অবস্থান্তর, কত জয়-পরাজয়, কত লাভক্ষতির অবকাশ আছে! দুঃখ কিসের? কার্পণ্যের প্রয়োজন কি? ভোগেই হোক আর ত্যাগেই হোক, মানুষের অন্তরের অন্তরে সেই বিশ্বাস থাকে—সেই কল্পনার শক্তিই মানুষকে এত শক্তিশালী করিয়া তোলে।

অতএব, মানুষের পক্ষে এই কল্পনাই ভাল—সত্য ভাল নয়; সত্য বিষ, সত্য মারাত্মক। মানুষের সমগ্র জীবনাদর্শের মূলে আছে এই প্রকাণ্ড ছলনা, এই মহতী মিথ্যা। যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, দার্শনিক কেহই এই মিথ্যার সেবা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই; নাস্তিক বা আস্তিক, ভক্ত বা জ্ঞানী, সকলেই—কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূলভাবে—এই মিথ্যার আরাধনা করিয়া থাকে। মৃত্যুর অন্তর্নিহিত যে সহজ প্রত্যক্ষ সত্য তাহাতে আস্থাবান না হইবার একমাত্র কারণ—মানুষ মরিতে চায় না; এমন কথা স্পষ্টই বলে, যেহেতু আমি মরিতে চাই না, অতএব আমি মরিব না। মৃত্যুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই দার্শনিক যে সকল তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাতে সে প্রশ্নের কোনও সরাসরি জবাব মেলে না। সচ্চিদানন্দ-ব্যবসায়ী বৈদান্তিক অস্তি-ভাতি-নাম-রূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যার দ্বারা, ক্ষুদ্র আস্তিক্যবুদ্ধি লোপ করিয়া মহা আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হইয়া উঠেন। বেশ বুঝিতে

পারিবে, থাকা অর্থে তুমি যাহা অনুভব কর, তোমার যে একমাত্র সহজ ব্যক্তি-চেতনা ব্যতীত আর সকলই তোমার সংস্কার-বিরোধী—যাহাকে ছাড়িয়া আর কিছুর ভাবনা তোমার সত্যকার ভাবনা হইতেই পারে না—তাহা যে মিথ্যা, অর্থাৎ তুমি থাকিবে না, তোমার সে অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইবে—এ কথা দার্শনিক মাত্রেই স্বীকার করিবে; কিন্তু তাহার স্থানে একটি অতি বিশুদ্ধ অস্তিত্ব, একটি নাম-গোত্রহীন সত্তার আশ্বাসে তোমাকে আশ্বস্ত হইতে হইবে—ইহারই নাম্ আস্তিকতা। যাহারা নাস্তিক্যবাদী তাহাদের মতের সঙ্গে এই মতের বিশেষ পার্থক্য নাই; যাহা কিছু পার্থক্য—সে কেবল চিন্তাপ্রণালীর সূক্ষ্ম কৌশল-ভেদ। ইহাদের নিকট মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই দেখিবে, ইহারা সহজভাবে তাহার উত্তর দিবে না—যেন প্রশ্নটা নিতান্তই স্থূল। তাহার কারণ, তাহারাও মৃত্যুকে দেখিবার সাহস করে না, প্রাণের অনুভূতিকে জ্ঞানের দ্বারা রোধ করিয়া মনস্বিতার নামে অন্যমনস্ক হইতে চায়। আসল কথা, তাহারাও মানুষ—জীবধর্ম্মী; মৃত্যুর স্বরূপ-চিন্তা তাহাদেরও সংস্কার-বিরোধী।

মনে কর, কোনও বড় কর্ম্মী বা জ্ঞান-বীরের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। মৃত্যুর আক্রমণে দেহ বিবশ, মুহুর্মুহু আক্ষেপ হইতেছে—মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত, চেতনা আচ্ছন্ন, চক্ষুতারকা দৃষ্টিহীন। সে সময়ে, সে ব্যক্তির মহত্ত্ব, তাহার কীর্ত্তি বা তপস্যা-গৌরব স্মরণ করিয়া—তাহার সেই মৃত্যু-মলিন দীন কাতর মূর্ত্তির প্রতি করুণা অনুভব না করিয়া পার? ভাল করিয়া তাহার সেই মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট নিশ্বাস, দেহের সেই অন্তিম মিনতি-পূর্ণ আবেদন যদি বুঝিয়া থাক, তবে মহান আত্মা বা মহতী কীর্ত্তির এই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিরীক্ষণ করিয়া, এই ভাবিয়া আশ্বস্ত

হইবে না যে, যে ব্যক্তির জীবন ধন্য হইয়াছে—তাহার মৃত্যু মৃত্যুই নয়; বরং, মনে হইবে, ওই ব্যক্তি সর্ব্বজীবের মতই আজ মৃত্যুর অধীন হইল—এ মুহূর্ত্তে তাহার নিজের পক্ষে সর্ব্ব কীর্ত্তি, সর্ব্ব গৌরব বৃথা; তাহার কীর্ত্তির জন্য জীবিতেরা জয়ধ্বনি করিবে, কারণ সে কীর্ত্তির উত্তরাধিকারী তাহারা; কিন্তু ঐ যে প্রাণ-বুদ্বুদ অসীম শূন্যে বিলীন হইতেছে, উহার রহিল কি? নশ্বরতার হাত হইতে কোন্ কীর্ত্তি তাহাকে রক্ষা করিবে? সকল মিথ্যা অভিমান, মনোগত সংস্কার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুর পানে চাহিয়া দেখ—তাহার মরজীবনের চরম লাঞ্ছনা, তাঁহার ক্ষণ-অস্তিত্বের চির-অবসান, নিয়তির নির্ম্মম অট্টহাস চাক্ষুষ করিতে পারিবে। জীবনের চেয়ে বড় কি আছে?—সেই জীবন হইতে বঞ্চিত হওয়ার যে নিদারুণ নিঃস্বতা, তাহা কি ওই ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়? সে কি কাহারও চেয়ে কম হতভাগ্য? মৃত্যুর আঘাতে তাহার মুখ কি কালিমালিপ্ত হয় নাই—তাহার মহাপ্রাণী কি শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচিবার চেষ্টা করিবে না? চাহিয়া দেখ—মহামনীষী মহাপুরুষ বা মহাবীরের মৃত্যুও মৃত্যু; তাহার সেই মৃত্যুকালীন মুখচ্ছবি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে, মৃত্যুই চরম অভিশাপ, কোনও কীর্ত্তি কোনও গৌরব সে ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না—যাইবার সময়ে তাহাকেও ভিখারীর মত যাইতে হইবে!

মৃত্যুকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়—মস্তিষ্কের সাহায্যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নয়। যাহার প্রেম যত বড়, যাহার হৃদয়-বৃত্তি যত গভীর—সেই মৃত্যুকে তত সুস্পষ্ট দেখিতে পায়; সে সহজেই আত্মসংস্কার বিসর্জ্জন দিতে পারে বলিয়াই মৃত্যু তাহাকে ফাঁকি দিতে পারে না। মহাপ্রেমিক নহিলে নাস্তিক হইতে পারে

না। মৃত্যু যে কত বড় পরিসমাপ্তি, কত বড় শূন্য, তাহা আত্মাভিমানী জ্ঞানী বুঝিবে কেমন করিয়া? যে আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে না, যে নিজে মরিতে ভয় পায়, সে আপনার জন্য একটা অবিনশ্বরতার স্বপ্ন দেখে—যেমন অর্থেই হোক, একটা অস্তিত্বের অভিমান সে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া থাকিবে। তাই, যে গেল সে যে একেবারেই গেল, এমন বিশ্বাস সে প্রাণ থাকিতে করিবে না। কিন্তু যে পরের মৃত্যুতে আপনার ভাবনা না ভাবিয়া পরের ভাবনাই ভাবে; যে মরিল তাহার আত্যন্তিক অভাব অনুভব করার পক্ষে যাহার নিজ পরিণাম-ভাবনা বাধা হইতে পারে না, সে-ই অন্তরের অন্তরে বুঝিতে পারে—মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না; কারণ, সে যে মৃত প্রিয়জনের সম্পর্কে সত্যকেই চায়, মিথ্যা দিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে তাহার হৃদয় একান্ত বিমুখ। এজন্য প্রেমই মানুষকে মৃত্যুর স্বরূপ দেখায়, প্রেমিক ভিন্ন আর কেহ নাস্তিক হইতে পারে না। জগতের আদি মহাপ্রেমিক বুদ্ধ-ভগবান এই জন্যই নাস্তিক ছিলেন; তিনি আত্মার গল্পে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—তিনি মৃত্যুকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই জন্মস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য নির্ব্বাণ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

মৃত্যু-দর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা তত্ত্বালোচনা বা চিন্তাবিলাস নয়। মৃত্যুর তত্ত্বালোচনা করিতে হইলে সমগ্র মানব-চিন্তার ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে হয়, তাহাতেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও সংশয়রহিত জ্ঞান লাভ হইবে না; তাহার প্রমাণ, মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা এ পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে। যত যুক্তি, যত পাণ্ডিত্য, যত সূক্ষ্ম দার্শনিক তর্করীতিই এ বিষয়ে নিয়োজিত কর, কিছুতেই কিছু হইবে না। এই মহা রহস্য-নিকেতনের দ্বারে স্বয়ং মহাকাল ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া

দাঁড়াইয়া আছে—কোনও জিজ্ঞাসার অবসর সেখানে নাই। সে উপায় নাই বলিয়া মানুষ দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়াছে, অর্থাৎ এক-তরফা আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে—কিন্তু মহাকাল তেমনই নীরব। যে কলস শূন্য তাহাকে উল্টাইয়া নিঃশেষ করা যেমন অসম্ভব, তেমনই যে তত্ত্ব মূলেই নাস্তি, তাহার সন্ধান শেষ হইতে পারে না। তাই, সন্ধানের বস্তুটার চেয়ে সন্ধানের নেশাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার কারণ, সত্য মানেই ধ্বংস, প্রলয়, শেষ,—নেশাই জীবন। এ নেশা ভাঙিতে চাহিবে কে? অর্থোপার্জ্জন যেমন নেশা, ধর্ম্মোপার্জ্জন যেমন নেশা—বিদ্যা-উপার্জ্জন বা তত্ত্ব-চর্চ্চাও সেইরূপ নেশা। যে সত্যের পিছনে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া ছুটিতেছে তাহাকে পাইতে হইলে সকল নেশা ত্যাগ করিতে হয়; চক্ষুর দৃষ্টি—দূরে নয়—নিকটে সংলগ্ন করিতে হয়; জ্ঞানের অভিমান নয়—প্রাণের ঐকান্তিকতা অর্জ্জন করিতে হয়। যাহাকে শিকার করিয়া ধরিতে চাও সে শিকারের বস্তু নয়, জ্ঞান-বুদ্ধির নিশিত শরও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না; সে ধরা দেয় স্বেচ্ছায়—সে বাস করে হৃদয়ের অতি সন্নিকটে। সমস্যার সে গ্রন্থি অতি সরল; তাহাকে খুলিতে হইলে অতি লঘুস্পর্শ অঙ্গুলির চকিত প্রয়োগই যথেষ্ট, বল প্রয়োগ করিলেই সে বন্ধন বজ্রকঠিন হইয়া উঠে। মৃত্যু আমাদের প্রাণের অতি সন্নিকটে বাস করিতেছে, তাহাকে আমরা অহরহ দেখিতেছি তথাপি তাহাকে চিনি না কেন? চিনিলে যে আমাদের নেশা ছুটিয়া যায়! আমরা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি বাঁধিয়া নেশা বজায় রাখিয়াছি, পাছে সকল রহস্যের মূল এই মৃত্যু অতি সবল হইয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে—তৎক্ষণাৎ সকল আশা সকল সংশয় ছুটিয়া যায়। যাহা চরম সত্য তাহাই পরম সরল—যাহা

যত জটিল তাহা ততই মিথ্যা। জগতে যেখানে যে সত্যকে লাভ করিয়াছে সে এইরূপ সরল অকুতোভয় দৃষ্টির সাহায্যেই তাহাকে লাভ করিয়াছে—তাহাতে তর্ক নাই, চিন্তা-বিলাস বা যুক্তি-তর্কের আস্ফালন নাই। মৃত্যু সম্বন্ধে যে সত্য, তাহাকেও তেমনই ভাবে লাভ করা যায়—অন্য উপায় নাই। সে সত্য প্রবেশ করে হৃদয়ে, অথচ হৃদয়কেই বিদীর্ণ করে। যখন সেই মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন শোক করিতে গিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হয়—কোনও অজুহাত কোনও আশ্রয় পায় না; উচ্ছ্বসিত রোদন যখন সেই মহাশূন্যের অট্টহাস্যে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন মনে হয়, এ সত্যের সাক্ষাৎকারে কতখানি শক্তির প্রয়োজন। যে নিমেষে মিথ্যার মোহপাশ মোচন করিয়াছে তাহার শাস্তি কি ভীষণ! তাই মৃত্যু-দর্শনের কথা যাহা লিখিয়াছি, তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যু যত বড় অভিশাপ, মৃত্যু-দর্শন তাহার চেয়ে অনেক বেশি। মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা দার্শনিক চিন্তা-বিলাস লইয়াই থাকুক—মৃত্যুর সত্যকে উপলব্ধি করার মত দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়।

শ্রাবণ, ১৩৩৯

বাঙালীর অদৃষ্ট

১

বাঙালী জাতির পূর্ব্ব-ইতিহাস যতটুকু চোখে পড়ে, তাহা হইতে ইহাই মনে হয় যে, ব্যবহারিক জীবনের কোনও বৃহৎ সমস্যা এই জাতিকে কখনও কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে নাই ; উর্ব্বর পলি-মৃত্তিকা ও বালুচরের উপর সে কখনও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি নির্ম্মাণের প্রয়াস করে নাই। জীবনের দিকটা কোনও রূপে নির্ব্বিঘ্ন হইলেই হইল ; সংসার, সমাজ ও ধর্ম্মায়তনে যেখানে যেমন প্রয়োজন—দৃঢ়তা ও শৈথিল্য, নিয়ম-নিষ্ঠা ও ভাবাবেগ, তাহার জীবনে সমান মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছে। কল্পনা ও কূটতর্ক তাহার প্রাণের আরাম-স্থল, সেইখানে কোনও বাধা না ঘটিলেই হইল ; সমাজে বা রাষ্ট্রজীবনে নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতির উদ্ভাবনা তাহাকে শান্ত ও সন্তুষ্ট রাখিয়াছে, তাহার মনোবৃত্তির উল্লাস ওইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে—বাস্তবজীবনে ইহার অধিক কিছু করিতে হইলে মনো-জীবনের শান্তি নষ্ট হয়! কিন্তু বিধাতা তাহার ধাতু-প্রকৃতির মধ্যে একটা নিদারুণ উৎপাতের বীজ নিহিত রাখিয়াছেন—বস্তুচেতনার দিকে সে যেমন অলস, ভাব-চেতনার দিকে সে তেমনই চঞ্চল ও স্পর্শকাতর। মার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে যেমন কর্ম্মবিমুখ, উদাসীন—জীবন-যাত্রার যাবতীয় ব্যাপারে হৃদয়হীন করিয়া রাখিয়াছে, সে যেমন পল্লীসমাজের গণ্ডির মধ্যে পর্ণকুটীর আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধনগ্ন দেহে যুগের পর যুগ কাটাইয়া দিতে পারে, অতিশয় ক্ষুদ্র বস্তুকেও বৃহৎ সমস্যার বিষয় করিয়া তাহারই সমাধানে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে,

বসন-ভূষণ-বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের শত মশকদংশন উপেক্ষা করিতে পারে, সংসারকে নিরাপদ করিবার জন্য নারীর নারীত্ব লুপ্ত করিয়া তাহার মাতৃত্বের আশ্বাসে আপনার পৌরুষ-বীর্য্য স্তম্ভিত করিয়া তামসিক তৃপ্তি উপভোগ করে,—তেমনিই, আর এক দিকে প্রবল ভাবাতিরেকের উত্তাপে সে শুষ্ক ইন্ধনের মত জ্বলিয়া উঠে ; তখন তাহার নিশ্চিন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশে সে স্বপ্নসঞ্চরণ করিতে থাকে। এই স্বপ্নের আবেশে সে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়,এবং দিগন্তবিসর্পী পল্লীপ্রাঙ্গণে—কখনও বজ্রবিদ্যুৎ, কখনও অবারিত জ্যোৎস্নার উদ্দীপন-মন্ত্রে—সে জাগর-স্বপ্নে বিভোর হয় ; আবার স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে ফিরিয়া আসে। বাঙালীর যাহা কিছু ঐতিহাসিক পরিচয় তাহা এই ভাববিপ্লবের কাহিনী। এক একটা ভাবের ধাক্কায় সে যাহা কিছু করিয়াছে তাহাই তাহার এক মাত্র কীর্ত্তি। সে রাজনীতি অর্থনীতির সেবা করে নাই, নগর পত্তন করে নাই, ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা শস্যশ্যামলা দেশলক্ষ্মীকে মণিমাণিক্যভূষণা করিয়াছে বলিয়াও শোনা যায় না—অন্তত কবি-কাহিনীর বাহিরে। কিন্তু এমন কথা ঐতিহাসিকের মুখেও শোনা যায় যে, কোনও নূতন ভাব বা আইডিয়ার আবেগে সে ঘর ছাড়িয়াছে, হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে চীনে সে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ; সমুদ্র পার হইয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—তালীবন ও লবঙ্গলতার দেশে—সে তাহার প্রাণের সৌরভ ছড়াইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে রাজবংশ বা রাজসিংহাসনের উত্থান-পতনের সঙ্গে বাঙালীজাতির অভ্যুদয়-কাহিনী কতটা জড়িত আছে, রাষ্ট্র-বিপ্লবের তরঙ্গচূড়ায় বাঙালীর নগ্নশির কোথায় কতগুলি দেখা দিয়াছে, এবং দিলেও তাহার ফলে বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি বা সংগঠনী প্রতিভা কতখানি বিকাশ লাভ

করিয়াছে—বলা দুরূহ ; কিন্তু ভাবরাজ্যের ভাঙন-প্লাবনের ফলে তাহার অলস কর্ম্মকুণ্ঠ মন ও বৈভব-বিমুখ, স্বাচ্ছন্দ্যলোলুপ প্রাণ যে প্রয়াস-প্রযত্নের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে বাঙালীর সম্বন্ধে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ভাবজীবনই এই জাতির সত্যকার জীবন ; সমাজে বা রাষ্ট্রে সে কোনও রূপে টিঁকিয়া থাকিতে চায়, সেখানে তাহার কোনরূপ আত্মপ্রসারের চেষ্টা নাই, সেখানে তাহার প্রকৃতি অতিশয় স্থিতিস্থাপক—ভাবের ধাক্কা ভিন্ন আর কোনও প্রয়োজনে সে সাড়া দেয় না। এজন্য—অলস, আত্মতৃপ্ত, নিরুৎসাহ, তর্কপ্রিয়, বচন-বিলাসী—প্রভৃতি বিশেষণের সে যথার্থ ই উপযুক্ত।

২

মুসলমান আমলের পূর্ব্বে বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের কোনও নিদর্শন নাই। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যখন বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হইল, তখন হইতেই এই জাতির একটা স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে এই জাতির, রক্ত, ভাষা, এমন কি, তাহার বাস্ত-সীমান্তের পরিচয় পর্য্যন্ত অনুমানসাপেক্ষ। বৌদ্ধ-প্রভাব ও নব-হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই জাতির প্রকৃতি কেমন ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল ; জল, বায়ু, রক্ত ও ভাষার নানা উপাদানে একটা নূতন race-type কেমন করিয়া ক্রমশ গড়িয়া উঠিল ; এবং অবশেষে মুসলমান প্রভাবের পীড়নে সেই মিশ্রতরল উপাদানরাশি—যাহা এতকাল কেবল ভাববাষ্পের চাপে নানা আকারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল—তাহাই কেমন করিয়া শেষে দানা বাঁধিয়া কতকটা জমাট

হইয়া উঠিল, সে ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নাই। যতদিন সে ইতিহাস উদ্ধার না হইতেছে ততদিন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপে একটা করকোষ্ঠী নির্ণয় করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আর্য্যের ইতিহাস বাঙালীর ইতিহাস নয়; অন্য প্রাদেশিক জাতি হইতে সর্ব্ববিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য অতিশয় পরিস্ফুট। বেদ-বেদান্ত—ষড়দর্শনের মনীষা, ভাস-কালিদাস-ভবভূতির প্রতিভা, অজন্তা-কোণারক-খণ্ডগিরির শিল্পচাতুর্য্য বাঙালীর পরিচয়-পত্র নয়। গত আট শত বৎসরের বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃত-চর্চ্চার ইতিহাসে তাহার যে পরিচয় আছে, এবং তাহার সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীনতর কীর্ত্তির প্রবাদ বা প্রমাণ আছে, সেই সকলের সহিত—আজও পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবন, পূজা-পার্ব্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, গান ও গাথায় তাহার জাতীয় সাধনার যে ধারাটি লুপ্ত হইয়াও হয় নাই, তাহা মিলাইয়া বাঙালীর যে অন্তরঙ্গ পরিচয়টি ফুটিয়া উঠে, তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে। তথাপি মনে হয়, বহুজাতির রক্ত-মিশ্রণের ফলে বাঙালীর চরিত্রে একটা অস্থিরতা আছে; অতিশয় বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকৃতির বহুবিরোধী সংস্কার একত্র হওয়ায় তাহার স্বভাব—চারিত্র্যের একনিষ্ঠা অপেক্ষা, আত্মহারা ভাববিলাসের অনুকূল। এই ভাবজীবনের স্ফূর্ত্তিতে সে প্রথম প্রচণ্ড বাধা পাইয়াছে মুসলমান-অধিকার কালে। মুসলমান ধর্ম্মের মধ্য দিয়া যে রুক্ষ কঠিন সেমিটিক কাল্‌চারের সঙ্গে তাহার প্রাণমনের সংঘর্ষ ঘটিল, তাহাতে তাহার প্রথম স্বপ্নভঙ্গ হইল। সমাজে ধর্ম্মজীবনে, বা ভাব-সাধনায় সে এই নূতনের সঙ্গে কোনও দিক দিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারে নাই—তাহা এতই পৃথক, এতই অনাত্মীয়। মুসলমান সমাজের সংঘবদ্ধতা, সে ধর্ম্মের অতিশয় বাস্তব ব্যবহারিক আদর্শ—ভাব ও কল্পনার

পরিবর্ত্তে বিশ্বাসের শাসন—এই সকলের সম্মুখে তাহার জাতীয় জীবনের বিকাশপথ কতকটা রুদ্ধ হইয়া আসিল। প্রায় ছয় শত বৎসর ধরিয়া বাঙালী আপনার সমাজ, ধর্ম্ম ও ভাষাকে এই একান্ত অনাত্মীয় পরধর্ম্মের সংঘাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়া রহিল। এই কালে সে আপনার ধারা ত্যাগ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় ভাব, ভাষা ও চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হইয়া উঠিল; তাহার নিজস্ব স্বপ্ন-কল্পনার ভাবাবেগ—ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও সমাজনীতির আদর্শে—একটা নূতন আকার ধারণ করিল। ইতিমধ্যে তাহার নিজ ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে ভাষায় প্রবল প্রাণের স্ফূর্ত্তি নাই; পাঁচ শত বৎসরেও এমন একজন কবি জন্মিল না যাহার বাণীতে হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্য্য অথবা বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। এককালে পৃথিবী যাহার গৃহপ্রাঙ্গণ ছিল, গিরিলঙ্ঘন ও সমুদ্রপারাপার যাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল, সে এক্ষণে আম্রবনচ্ছায়ে সুপ্ত, গুপ্ত, অথবা লুপ্ত হইয়াই রহিল! তাহার গানে ছন্দের পক্ষবিস্তার নাই, তাহার কাব্যে কল্পনার নিরুদ্দেশ-যাত্রা নাই। কতকগুলি গ্রাম্য-গীতি ও গাথা, এবং গৃহদেবতার মহিমাবর্ণনই তাহার প্রতিভার শেষ নিদর্শন। মনে হয়, এ কোন্ জাতি? মুসলমান-পূর্ব্ব ইতিহাসে, বৌদ্ধ-হিন্দুর নবসমন্বয়ের যুগে, যে জাতির নানা কীর্ত্তির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সংবাদ ঐতিহাসিকের বিস্ময় উৎপাদন করে—সেই জাতি, অবশেষে, এক দিকে তাহার স্বাধীন ভাব-সাধনা গুহ্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে চরিতার্থ করিতেছে; অপর দিকে আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া, জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, সমাজে, ধর্ম্মে ও চিন্তাপদ্ধতিতে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে! সংস্কৃত ভাষায় তাহার নিজ ভাষার

ভিত-পত্তন হইল বটে, কিন্তু সে ভিত্তির উপরে সাহিত্যের সৌধ-নির্ম্মাণ হইল না। স্বাভাবিক প্রাণ-স্পন্দনের অভাবে নবসৃষ্টির শক্তি নাই, তাই ভাষা-সাহিত্য অতিশয় গ্রাম্য আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিল না। কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের গৌরব হইল; প্রাণের উপরে মনের, এবং কল্পনার উপরের বুদ্ধিবৃত্তির জয়লাভ হইল। তাই এ যুগের কীর্ত্তি হইল—নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, সমাজ-দেহের অষ্টপৃষ্ঠে স্মৃতিশাস্ত্রের রক্ষাকবচ বন্ধন, এবং সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারের অসাধারণ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। ইহাই বাংলাভাষাভাষী অধুনাতন বাঙালী-জাতির মধ্যযুগের ইতিহাস।

৩

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির আবির্ভাবে, সর্ব্ববিভাগে বাঙালীর যে প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল, তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ দেশ-প্রেমিক মনীষী বাঙালীরা নবজন্ম বা রেনেসাঁস বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। রেনেসাঁস এক হিসাবে বটে, কিন্তু সেই ব্যাপারের মধ্যে দুইটা বিভিন্ন লক্ষণই আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমান প্রভাবের তাড়নায় বাঙালী তাহার সমস্ত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য আর্য্যসংস্কৃতির শরণাপন্ন হইয়াছিল—বোল্‌তা যেমন কাঁচপোকার দৃষ্টিপ্রভাবে বর্ণপরিবর্ত্তন করে, বাঙালীর তখন সেই রূপান্তর উপস্থিত। আবার সেই মুসলমান প্রভাবের ফলেই তাহার অন্তর-চেতনা আর এক দিকে সাড়া দিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য আদর্শমূলক সমাজ-ব্যবস্থা তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, সেই কঠিন ও কৃত্রিম বর্ণ-বিভাগের অন্তরালে তখনও বৌদ্ধসংস্কার একেবারে লুপ্ত হয় নাই; তাই, মুসলমানধর্ম্মের একটি মাত্র উদার নীতি—তাহার অপূর্ব্ব সাম্যবাদ,

মানুষমাত্রের প্রতিই শ্রদ্ধা—তাহাকে ভিতরে ভিতরে অভিভূত করিতেছিল। এই ভাব হিন্দুভাবুকতায় মণ্ডিত ও তান্ত্রিক সহজিয়া তত্ত্বে রঞ্জিত হইয়া একটি বিশিষ্ট ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাই মধ্যযুগের বাঙালীজাতির বাঙালিয়ানার নিদর্শন, ভারতীয় কাল্‌চারে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। শ্রীচৈতন্যেরও এক শত বৎসর পূর্ব্বে মানুষের সুগভীর মনুষ্যত্বই বাঙালী কবির ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল; মানুষের দেহ-মন-প্রাণের রহস্যনিকেতনেই সুন্দর-দেবতার যে অপরূপ লীলা বাঙালী-কবিকে পুলকবিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল, এবং তাহারই আবেগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কৃষ্ণতত্ত্ব যে নরত্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—ভারতীয় কাব্যে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এই 'রসতত্ত্ব' হইতে যে প্রেমধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার ধারা প্রতিকূল ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই—সে সাধনা জীর্ণ পরিত্যক্ত খোলসের মত আজিও সমাজের অঙ্গে জড়াইয়া আছে। সেই একবার বাঙালী আপনাকে চিনিয়াছিল, তাহার আত্মস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল; কিন্তু তাহার সে স্বপ্ন টিঁকে নাই। তখন শাক্তধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের প্রয়োজনই ছিল অধিক। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল সংঘাতে তাহার ক্রমাগত কুলক্ষয় হইতেছিল, তাই আত্মরক্ষার জন্য সে যে নীতি ও আদর্শের আশ্রয় লইল, তাহাতে কোনরূপে টিঁকিয়া থাকিবার উপায় হইল বটে, কিন্তু সত্যকার প্রাণশক্তি বা জাতির প্রতিভার উদ্বোধন আর হইল না। আর্য্যসংস্কৃতির পূর্ণ প্রভাব সত্ত্বেও ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সমাজ-ব্যবস্থায় তাহার প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য কতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। তথাপি মনে হয়, ব্রাহ্মণ্য আদর্শের

শাসন যেন পরধর্ম্মের মতই তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি রোধ করিয়াছিল। বৈষ্ণবের সেই নর-প্রীতি, সেই পুরাতন অধ্যাত্মবাদ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসায় জটিল হইয়া উঠিল। জাতিনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবমাত্রেই পূজনীয় হইলেও, ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে এই বৈষ্ণবপূজাও ব্রাহ্মণপূজার রূপান্তর হইয়া উঠিয়াছে; এবং এই প্রেমধর্ম্মের ফলে একটা দাস-মনোভাব সমস্ত জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই, এই রেনেসাঁসের মধ্যে বাঙালীর বাঙালীত্বের কতখানি উন্মেষ হইয়াছিল, এই নব-জাগরণ তাহার জীবনকে কতখানি জয়যুক্ত করিয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখিলে, ইহার অন্তরালেও একটা বিপুল ব্যর্থতার প্রমাণ মিলিবে। মনে হয়, এই জাতি যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াও করিতে পারে নাই, নানা বিরুদ্ধ শক্তির তাড়নায় সে পরিশেষে বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে—নানা জঞ্জাল ও আবর্জ্জনায় তাহার জীবনস্রোত রুদ্ধ হইয়া সমাজে, সাহিত্যে ও ধর্ম্মে কতকগুলি পল্বলের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ঐতিহাসিক কালের মধ্যে বাঙালী সেই একবার জাগিয়াছিল, এবং সেই একযুগের অর্জ্জিত ভাব-সম্পদ ও সাধনার বলে সে আরও তিন চার শত বৎসর পার হইয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে এক দিকে মুসলমান শাসনের ফলে সমাজে যে নূতন ধরনের aristocracy-র অভ্যুদয় হইয়াছে, এবং অপর দিকে গুরু-ব্রাহ্মণের যে পূজা ক্রমশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এক দিকে রাজপূজা ও অপর দিকে ভূদেবতার সম্মান, এই উভয়বিধ সংস্কারের চাপে বাঙালীর ভাবস্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে, পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। জাতিহিসাবে সে তখন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশধর,—সমুদ্রে বিন্দুবৎ যাহারা মিশিয়া গিয়াছিল, তাহাদের সেই আর্য্য-রক্তের গৌরব গুরু-ব্রাহ্মণ ও

aristocracy-র দলকে মোহগ্রস্ত করিয়াছে; জাতির বাকি অংশ যে কি, সে পরিচয়ের প্রয়োজনও নাই—তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে সমাজের এই শীর্ষস্থানীয়দের মুখপানে চাহিয়াই কৃতার্থ। এক দিকে দাস-মনোভাব অস্থিমজ্জাগত, অপর দিকে কৌলীন্য-লালায়িত ভূস্বামী ও শাস্ত্রমর্য্যাদা-লোলুপ বর্ণ-ব্রাহ্মণ জাতির যে কুলজী প্রস্তুত করিল, তাহাতে বাঙালীর ইতিহাস মুখ্যত উপনিবিষ্ট আর্য্যের ইতিহাস বলিয়াই একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গেল। এই সংস্কার তাহার আত্মরক্ষার সহায়তা করিলেও, তাহার বিশিষ্ট প্রতিভা ও প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্কোচ সাধন করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার, সংস্কৃত সাহিত্য, ও আর্য্যের ইতিহাস বাঙালীকে যেমন এক দিকে রক্ষা করিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে তাহাকে হতচেতন করিয়াছে। তথাপি তাহার রক্তের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সে স্বাতন্ত্র্য আজিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই; তাই প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইতে আবার যে প্রচণ্ড প্রভাবের সূত্রপাত হইল—তাহাতে তাহার মনের দুয়ার-জানালা আবার যখন খুলিয়া গেল, তখন তাহার সেই বহুকাল-মুক্ত অসাড় প্রাণ-ধর্ম্ম আবার এক নবজাগরণে জাগিয়া উঠিল।

বাঙালী ভাবপ্রবণ, স্বচ্ছন্দ-সুখাভিলাষী, কল্পনাবিলাসী। তর্কশাস্ত্রে তাহার অধিকার যতই অসামান্য হউক, জীবনে সে কোনও উৎকৃষ্ট যুক্তি বা কঠিন নীতির পক্ষপাতী নয়। অতিশয় বিরোধী ভাব ও ভাবনাকে একই কালে প্রশ্রয় দিতে সে কুণ্ঠিত নয়—এ বিষয়ে এমন চরিত্রহীন জাতি বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই। সমাজ ও ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য শাসন স্বীকার করিয়াও সে গোপনে ভাব-তান্ত্রিক, স্বৈরাচার বা নানা অশাস্ত্রীয় গুহ্যসাধনা হইতে কখনও নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার স্বভাবে জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নাই—ভাবই

তাহার নিকট একমাত্র সত্য। জ্ঞানের চর্চ্চাতেও সে ভাবের অধীন। এজন্য জ্ঞানমাত্রই তাহার ব্যবহারিক জীবনে ফলপ্রসূ হয় না। জ্ঞানচর্চ্চায়, তর্কবিচারের মস্তিষ্কচালনায়, সে যে আনন্দ পায় তাহা একটা বিলাস মাত্র—সে বস্তু তাহার প্রাণ বা কামনা-বাসনার নিয়ামক নয়, সেখানে সে যুক্তি অপেক্ষা কুযুক্তি, ন্যায়নিষ্ঠা অপেক্ষা মমত্ববোধ, নিয়ম অপেক্ষা অনিয়মের পক্ষপাতী। এই প্রবৃত্তিকে সে এতদিন গোপনে তৃপ্ত করিয়া আসিতেছিল, প্রবল ব্রাহ্মণ্য-শাসনের মধ্যেও সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ খনন করিয়া তাহার হৃদয়ের পিপাসা মিটাইতেছিল। ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা এই প্রবৃত্তিকে দুই দিক দিয়া আঘাত করিল। ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের বন্ধন ভিতরে ভিতরে শিথিল হইয়া আসিল, তাহাতে বাঙালীর প্রকৃতগত ভাব-স্বাধীনতা প্রশ্রয় পাইল। অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া যে যুক্তিবাদ, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম ও নীতির প্রভাবে—যে চারিত্র্যের আদর্শ—তাহার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল, তাহার ফলে তাহার এতদিনের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার আবার নূতন করিয়া জাগ্রত ও উদ্যত হইয়া উঠিল—এই নূতনকে পুরাতনের অধীন করিতে চাহিল। গত এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালীর ভাব-জীবনের ইতিহাসে —ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে এবং নব সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায়—তাহার যে অন্তর-বিপ্লবের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাণপণ প্রয়াসের মধ্যে এই দুই বিপরীত প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং মনে হয়, পরিশেষে এই দ্বন্দ্বে অবসন্ন হইয়া সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

৪

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত বড় প্রভাবে বাঙালী ধরা না দিয়া পারে নাই; ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় ইহাই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বনাশের কারণ। কোনও কিছুকে কঠিন ভাবে ধরিয়া থাকিয়া নূতনের গতিরোধ করা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এ যুগের প্রথম বাঙালী মনীষী রাজা রামমোহন রায়। পৌরুষ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁহার সেই অসাধারণ মনীষায়, এই নবযুগের সমস্যা একটি অতি বাস্তব ব্যবহারিক রূপে যুক্তিসম্মত সমাধানের বিষয় হইয়া দেখা দিল। বাঙালী জাতির যে বিশিষ্ট প্রকৃতির কথা বলিয়াছি রামমোহনে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রামমোহনের মধ্যে বাঙালীর ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তাহার সমস্ত বাঙালিয়ানা হইতে মুক্ত হইয়া, খাঁটি আর্য্যসংস্কৃতির অভিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুগের পর যুগ ধরিয়া নানা মন্ত্র ও নানা তন্ত্রের সাধনায়, ভারতীয় জাতিসমূহের, তথা বাঙালীর ধাতু-প্রকৃতি যে ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব যেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি যেন এই ঐতিহ্যের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া অতি প্রাচীন আর্য্য-মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। যে sensuous mysticism ঐতিহাসিক হিন্দু-সাধনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, রামমোহনে তাহার আভাস মাত্র নাই—তিনি ঘোরতর যুক্তিবাদী, Pragmatist। তাই, যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বাঙালীর বহির্জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেই সংস্কারের সংস্কৃতি করিয়া জ্ঞান ও যুক্তিবাদের সাহায্যে তিনি এই জাতির আত্মরক্ষার একটা পথ নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু এই পথ বাঙালীর জাতি-ধর্ম্মের বিরোধী—

একটা সুবিচারিত সত্যের কঠিন বন্ধনে তাহার মন কখনও ধরা দিতে পারে না। রামমোহন বাঙালীর ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থার অবনতির দিকটাই দেখিয়াছিলেন, এবং মনে করিয়াছিলেন, বেদ-উপনিষদের সত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই তাহার এই দশা ঘটিয়াছে। কিন্তু বাঙালী জাতির রক্তের ধর্ম্ম যাইবে কোথায়? বাঙালীর ব্রাহ্মণ্য সংস্কার একটা সংস্কার মাত্র; তাহার জাতিধর্ম্মই তাহার নিয়তি, তাহাকে সে লঙ্ঘন করিবে কেমন করিয়া? এজন্য রামমোহনের ঈপ্সিত বা ইঙ্গিতকৃত যে আদর্শ, বাঙালীর চিন্তাধারায় তাহা কতক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিলেও—তাহার প্রাণমূলে শক্তিসঞ্চার করিল না। ষড়দর্শন যেমন তাহার কীর্ত্তি নহে, বেদান্ত ও উপনিষদও তেমনই তাহার মনোধর্ম্ম নহে। নব হিন্দুধর্ম্মের পুরাণ-উপপুরাণের মধ্যে সে কতকটা আত্মতৃপ্তির উপায় করিয়াছিল, তথাপি কোনও একটা তত্ত্বকে সে প্রাণ সমর্পণ করে না; সে ভাবপন্থী, জ্ঞানপন্থী নয়। রামমোহন এই পুরাণ-উপপুরাণের মূলোচ্ছেদ করিয়া হাজার বৎসরের সংস্কারকে উৎপাটন করিয়া যে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মকে, আধুনিক যুক্তিবাদ ও সেমিটিক ধর্ম্মবিশ্বাসের সুকঠিন একেশ্বরবাদের দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের সহিত বহির্জগতের এবং পুরাকালের সহিত আধুনিক কালের একটা রফা-মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম তো একটা চিন্তাপ্রণালীর সিদ্ধান্ত নয়—উৎকৃষ্ট উপদেশ বা চরিত্র-সংগঠনী শিক্ষাই ধর্ম্মের সার মর্ম্ম নয়, যুগ প্রয়োজনই তাহার সর্ব্বস্ব নয়। ধর্ম্ম জাতির স্বভাবের অনুকূল হইয়াই তাহার প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসের প্রতিরূপ-হিসাবে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠে। তাই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; খ্রীষ্টের ধর্ম্ম আজিও য়ুরোপের ধর্ম্ম হইয়া উঠিতে পারে নাই;

ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে ইস্‌লামও বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই, মুসলমান-আগমন হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে ইস্‌লাম কোনও সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় দেয় নাই। বাঙালীর জাতি-ধর্ম্ম এক, আবার সেই ধর্ম্মের সঙ্গে, বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বন্দ্ব ও মিলনের ফলে তাহার যে প্রকৃতি দাঁড়াইয়াছে তাহা তেমনই জটিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই জটিল গ্রন্থিপাশে টান পড়িয়াছে; রামমোহন তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তি-তত্ত্বের আঘাতে এই গ্রন্থিপাশ ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, অথবা সকল গ্রন্থি খুলিয়া একটি গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা একপ্রকার অসাধ্য-সাধন বলিয়াই রামমোহনের প্রতিভা প্রতিভাই রহিয়া গিয়াছে, তাহা জাতির একটা মুক্তিপথ—নির্দ্দেশ করিলেও—নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই।

৫

মুক্তিপথ আজিও মেলে নাই, তখনও মিলিবে কি না কে জানে! কিন্তু এ যুগে বাঙালীর সেই জাতি-ধর্ম্ম প্রবল পাশ্চাত্য প্রভাবে আবার সাড়া দিয়াছে—সে আবার ভাবের ঘোরে স্বপ্ন-সঞ্চরণ করিয়াছে। রামমোহনের মধ্যে বাঙালীত্বের পরিবর্ত্তে যে আর্য্য-সংস্কার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল, আর এক দিক দিয়া সেই আর্য্য-সংস্কারের নামে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ যে নব্য-হিন্দুয়ানির স্বপ্ন দেখিলেন, যে ভাবসাধনা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা কিন্তু আদৌ আর্য্য-সংস্কৃতি নহে, তাহা বাঙালীর নিজস্ব মনীষা ও কল্পনার ফল। বাঙালীর এ যুগের

রেনেসাঁসের পুরোহিত এই দুই যুগন্ধর ব্যক্তি। পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষ করিয়া ইঁহাদেরই মধ্য দিয়াই বাঙালীর ভাব-জীবন উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। নূতনকে গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার যে প্রতিভা, এবং তদ্দ্বারা—জাতি-ধর্ম্মের অনুযায়ী, অথচ নূতনেরই পূর্ণপ্রভাববিশিষ্ট—একটা আদর্শের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের বাঙালিয়ানার নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর ইতিহাস জানিতেন না, জানিবার জন্য অধীর হইয়াছিলেন, এবং কত মনোহর স্বপ্নই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণ জাগিয়াছিল ইংরেজী আদর্শের প্রভাবে; সে আদর্শের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়, বাঙালীসুলভ ভাবগ্রাহিতার বলে তিনি তাহা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে প্রতিভা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই একবার বাঙালীকে এক নূতন স্বপ্নে বিভোর করিয়াছিল, সেই প্রতিভাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর ভাবজীবনে আর এক রূপের সন্ধান পাইল। সত্যকে সুন্দরের রূপেই বাঙালী চিরদিন আরাধনা করিয়াছে, সুন্দরের জন্য কূলত্যাগ করিতে তাহার কখনও বাধে নাই। বঙ্কিমের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তাঁহার বাঙালীত্বকে খর্ব্ব করে নাই—একটি অপূর্ব্ব সেন্টিমেণ্ট রূপে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে মাত্র। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই জাত্যভিমান একটা ইতিহাসকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিল—হিন্দুর ইতিহাসকেই তিনি বাঙালীর ইতিহাস বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় Renaissanceএর যুগেও নব্য ইটালীয়গণ যে কৌলীন্য-অভিমানের মোহে একটা Latinistic Revival-এর চেষ্টা করিয়াছিল—প্রাচীন রোমানদের ইতিহাস তাহাদেরই ইতিহাস, রোমক কাল্চার ও লাটিন ভাষায় তাহাদেরই ন্যায্য অধিকার—এইরূপ “legitimist illusion”-এর বশে নবজীবন লাভ করিতে চাহিয়াছিল, এবং অবশেষে ‘Latin

Eloquence'-কেই সেকালের সকল ভাষা ও সাহিত্যের দীক্ষামন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল—অনেকটা সেই ধরনের মোহে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত-হিন্দু-কাল্‌চারকেই তাঁহার স্বজাতির জন্য দাবি করিয়াছিলেন, এবং Sanskrit Eloquence-এর আদর্শে বাংলা ভাষার অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন; বাংলা সাহিত্যে নব-জীবন সঞ্চারের পক্ষে তাঁহার এই মোহই মুক্তিরূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার এই প্রতিভার মূলে ছিল তাঁহার খাঁটি বাঙালী প্রাণ। ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বঙ্কিমের এই সাহিত্য-বিগ্রহ এক নব-সৃষ্টি; ইহার উপাদান যাহাই হউক, ইহার সৃষ্টিমূলে বাঙালীর প্রাণই স্পন্দিত হইতেছে। কারণ, এই বিগ্রহের আদর্শ ছিল ইংরেজী, কিন্তু প্রাণ-ধর্ম্মের আশ্চর্য্য মহিমায় এই বিগ্রহের মধ্যেই বাঙালীর ইষ্টমন্ত্র মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। নূতনকে বরণ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া—তাহাকে কেবল তত্ত্বের মধ্যে নয়, একটি ভাব-মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া—সেই নূতনকে আপনার মন্ত্রে আরতি করাই বাঙালীর বাঙালীত্বের নিদান। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় এই নূতনের আরতি, এই পাশ্চাত্য রস-রসিকতার আবেগ যে কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে, এবং হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের নূতনতর ব্যাখ্যার মূলে তাঁহার যে ভাবদৃষ্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহাতেই নব্য বাঙালিয়ানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অথচ বঙ্কিম এ সকলই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—নিজে কখনও একদিনের জন্যও ব্রাহ্মণ্য-গৌরব ত্যাগ করেন নাই। রামমোহনের প্রতিভায় বাঙালীত্ব অপেক্ষা আর্য্যসংস্কার প্রবল; বঙ্কিমের আর্য্য-সংস্কার একটা মোহ মাত্র—তাঁহার কবিত্ব ও দেশাত্মবোধের অবলম্বন; মনে প্রাণে তিনি খাঁটি বাঙালী। রামমোহন জ্ঞানপন্থী, বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতান্ত্রিক;

তাই বঙ্কিমই তাঁহার স্বজাতির অন্তরে একটা নূতন চেতনা সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন।

৬

বাঙালীর এই Renaissance-এর দ্বিতীয় পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ, রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যপন্থী। বিবেকানন্দের যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ছিল, সে ধর্ম্মমতের জন্য নয়—বাঙালীর ভাব-জীবনে শক্তি-সঞ্চারের জন্য; বিবেকানন্দও ভাবুক, তাঁহার চক্ষেও কবি-স্বপ্ন। ইংরেজী দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস তাঁহাকে সংশয়বাদী করিয়াছিল; বঙ্কিমের মত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের মোহ তাঁহার ছিল না; তিনি প্রথম হইতেই একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটে বিপন্ন হইয়াছিলেন—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সত্য-সন্ধান তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। তিনি প্রথমে সম্ভবত রামমোহনের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাবপ্রবণ চিত্ত তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই। সকল বিরোধ-বৈচিত্র্যকে একটা কঠিন ঐক্যতত্ত্বের দ্বারা নিরাকৃত করার যে বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি তাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; জীবনকে জীবনের দ্বারাই বুঝিবার—বিচিত্র প্রাণধর্ম্মকে বহুরূপা শক্তির লীলারূপে উপলব্ধি করার যে আশ্বাস, তাহাই তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এই মন্ত্র-দীক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে। সহস্রাধিক বৎসরের হিন্দুসাধনার সর্ব্ব বিরোধ ও বৈচিত্র্য যে বাঙালী মহাপুরুষের অলৌকিক ভাবসাধনায় এক অপরূপ সত্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, বিবেকানন্দের প্রাণ তাঁহার নিকটেই আত্মসমর্পণ করিল। বেদান্তের মায়াবাদ তাঁহাকে বিচলিত

করিল না, যাহা শূন্য তাহাই রূপে-রসে পূর্ণ হইয়া দেখা দিল। অদ্বৈতবাদ একটা তত্ত্বমাত্র না হইয়া, মানুষেরই মনুষ্যত্ব-মহিমার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিল—একটা জীবন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উদ্দীপন-মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। এই যে তত্ত্বের সঙ্গে ভাবের, সত্যের সঙ্গে জীবনের অপূর্ব্ব সমন্বয়—ভাবকে রূপময় করিয়া দেখা, ইহার মূলে ছিল সর্ব্বসংশয়-ভঞ্জন তাঁহার গুরুর সেই প্রত্যক্ষ বাস্তব সাধন-মূর্ত্তি। তিনি কেবল বুঝিয়াই তৃপ্ত হন নাই, দেখিতে চাহিয়াছিলেন—সেই অপরোক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল, তাই তিনি প্রাণের মধ্যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার এক নূতন মন্ত্রদৃষ্টি লাভ হইয়াছিল; তাহা না হইলে নরেন্দ্রদত্ত বিবেকানন্দ হইতে পারিতেন না। সেই প্রত্যয়-বিশ্বাসের আনন্দে তিনি যে বাণী প্রচার করিলেন তাহাতে ভারতের ব্রহ্মবাদ বা বেদান্তদর্শনের কতখানি বিশুদ্ধি রক্ষা হইয়াছে, তাহার বিচার ভারতীয় দার্শনিক অথবা যোগী-সাধকেরা করিবেন। কিন্তু সে বাণী সম্পূর্ণ আধুনিক, তাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র সাদৃশ্য আছে, মানুষের মোক্ষসাধনার সঙ্গে তাহার জীবন-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে; তাহার মতে, অনাসক্ত কর্ম্ম-যোগীর পক্ষেও মানব-মমতা স্বদেশ-প্রেমের ঐকান্তিক সাধনার আবশ্যকতা আছে। বিবেকানন্দের মনে মহাপুরুষের যে আদর্শ ছিল তাহাতে একাধারে শঙ্করের মত মনীষা ও বুদ্ধের মত হৃদয় থাকা চাই। ভারতের এই দুই যুগাবতারের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু এই দুইজনের একটিকেও তিনি পূর্ণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের যে পরিচয় তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও অনেকটা এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা আছে। মানবত্বের এই

যে নূতন আদর্শ একই কালে দুই যুগন্ধর বাঙালীর চিত্তে স্থান পাইয়াছিল, ইহা হইতে আমরা বাঙালী জাতির গভীরতম প্রবৃত্তির পরিচয় পাই। উভয়ের মধ্যেই এই আদর্শ জাগিয়াছিল পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে, উভয়েই ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসূত নবভাবের সাধক—উভয়ের মধ্যেই যুগধর্ম্মের পূর্ণ প্রেরণায় সনাতন বাঙালিয়ানা এক নূতন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা ও মনীষা ছিল বড়—তিনি ছিলেন নিছক ভাবুক ও কবি; বিবেকানন্দের প্রাণশক্তি বা প্রেম ছিল বড়—তিনি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রয়াসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষা ও সাধনার ক্রমবিকাশকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুযায়ী একটি সুসঙ্গত ব্যাখ্যার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে; বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন—হিন্দুসাধনার ইতিহাস যেমনই হউক, তাহার বীজ যে কালেই অঙ্কুরিত হউক এবং ইতিহাসিক জোয়ার-ভাঁটায় তাহা যত রূপেই বিবর্ত্তিত হউক—তাহার মূল মন্ত্রটিকে জাতির জীবনে ফলবান করিয়া তুলিতে। কোনও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় নয়, ইতিহাস উদ্ধার করাও নয়, একটা বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাও নয়; তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল—জাতিকে, ধর্ম্মবিশ্বাসী নয়, আত্ম-বিশ্বাসী করিয়া তোলা। তিনি জানিতেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট, কারণ 'The soul may be trusted to the end'। এইজন্য রামমোহনের মত সংস্কার-প্রবৃত্তি থাকিলেও, পাছে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, এজন্য তাহার সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহার প্রাণের আকুতির দিকটিকে তিনি শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন—পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-উপবাস তীর্থযাত্রাদির মধ্যে যেখানে যেটুকু প্রাণের সত্য রহিয়াছে, সেখানে বুদ্ধিভেদ ঘটিতে দেন নাই। তত্ত্বের দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া, জীবনেরই মধ্য দিয়া সত্যকে

উপলব্ধি করাইতে হইলে, জাতির বিশিষ্ট ভাবনা-সাধনা, মনোবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তির উচ্ছেদ-সাধন চলিবে না; যাহা আছে তাহাকেই উপাদান ও উপায়স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার মধ্য হইতে প্রাণের আলস্য ও জড়তা দূর করিয়া, এক নূতন ভাব-জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করাই, তাঁহার মতে এ জাতিকে উদ্ধার করার একমাত্র পন্থা। তাই এই নব-বেদান্তবাদী বাঙালী সন্ন্যাসী, ভারতীয় অদ্বৈতবাদকে মস্তিষ্ক হইতে হৃদয়ের মধ্যে নামাইয়া, জাতির সমস্ত কামনা-বাসনা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলে নবশক্তি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন। সে শক্তিমন্ত্র এইরূপ। আমি নিত্যমুক্ত, অপাপবিদ্ধ, আমি স্বাধীন, আমি অজেয়; অগ্নি যেমন পাবক—যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই পবিত্র করিয়া তোলে—আমিও তেমনই; কোনও কর্ম্মে, কোনও অনুষ্ঠানে, কোনও নীতি-নিয়মের অনুবর্ত্তনে আমার অকল্যাণ হইতে পারে না; সত্য-মিথ্যা, সংস্কার-কুসংস্কার, একেশ্বরবাদ-বহুদেববাদ কিছুই আমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, যদি আমার মধ্যে বীর্য্য, আত্ম-বিশ্বাস, স্বাধীনকর্ত্তৃত্ববোধ, ও ত্যাগের শক্তি থাকে—এক কথায় আত্মার দৈন্য না থাকে। এই বাণীর বীজমন্ত্র তিনি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে, তাহাকে প্রসারিত ও প্রচারিত করিবার ভার লইয়াছিলেন নিজে। একজন নিরক্ষর বাঙালীর অসামান্য প্রতিভায় যাহা ধরা পড়িয়াছিল—আর একজন ইংরেজীশিক্ষিত, পাশ্চাত্য প্রভাবে পূর্ণ-প্রভাবান্বিত বাঙালী হইল সেই মন্ত্রের আধার! যেন বাঙালী-জাতির মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার ভাব-সাধনার যে মন্ত্রবীজটি সুপ্ত ছিল, পাশ্চাত্য প্রভাবের জল বায়ু তাহাকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই কি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সেই আদর্শের

সন্ধান পাইয়াছিলেন? শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের প্রেম, এই দুই বিরোধী তত্ত্বের সমন্বয় তিনি কি এই বাঙালী মহাপুরুষের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন? এইরূপ সমন্বয় কি সম্ভব? কিন্তু বিবেকানন্দের নিজের মধ্যে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর মানবধর্ম্ম-সমস্যার একটা সমাধানের ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ সমস্যা এ যুগেরই; পাশ্চাত্য জাতির অদম্য ভোগপিপাসা, সেই পিপাসার পৌরুষ, এবং সেই সঙ্গে তাহার পরিণাম-জিজ্ঞাসা হইতেই এ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বাঙালীর প্রাণে ইহার সাড়া জাগিয়াছিল, সমস্ত হৃদয় দিয়া সে ইহাকে অনুভব করিয়াছিল—পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত হইয়াই সে আপনাকেও ফিরিয়া পাইয়াছে। কারণ, এই ভোগবাদ—মনের এই স্বাধীনতা ও সংশয়-ব্যাকুলতা—তাহার নিজের চরিত্রেও বিশেষরূপে বর্ত্তমান। তাই বিবেকানন্দ বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহাতে মায়াবাদ কর্ম্মবাদকে পুষ্ট করিল, জীবব্রহ্মের অভেদ-তত্ত্ব জীবেরই এক নূতন মহিমার প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। বিবেকানন্দের চেয়ে শঙ্কর বড়—মনীষায়, বুদ্ধও বড়—তাঁহার ত্যাগে ও তপস্যায়। কিন্তু বিবেকানন্দ এই উভয় হইতেই স্বতন্ত্র, কারণ বিবেকানন্দ বাঙালী,—ভোগবাদ তাঁহার অস্থিমজ্জাগত। তিনি জীবনকে ও জগৎকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সৃষ্টির এই রস-মাধুর্য্য অপেয় অগ্রাহ্য মনে করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। বরং, তাঁহার মতে, প্রকৃতিকে পুরুষের মতই ভোগ করিতে হইবে; সেই ভোগ সম্রাটের ইচ্ছার মত আত্ম-ইচ্ছার অধীন হইবে, এবং ভোগে ও ত্যাগে কোনও পার্থক্য থাকিবে না। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের সন্ন্যাস নয়; অতিশয় বলিষ্ঠ জীবন-ধর্ম্মের জন্য যে

বিবেক, আত্মপ্রত্যয় ও শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন—সেই শিক্ষা ও সাধনার আদর্শস্থাপনের জন্যই এই সন্ন্যাস।

* * *

বাঙালীর এই নব-জাগরণের প্রমাণ-প্রসঙ্গে আমি যে দুই মহাত্মার নাম করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে আমরা উৎকৃষ্ট বাঙালী প্রতিভার বিকাশ দেখিয়াছি। বঙ্কিমের সাধনায় বাঙালীর আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফুটিয়া উঠিয়াছে; বিবেকানন্দের প্রতিভায় বাঙালীর আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। দুই জনেই উচ্চ ভাবের ভাবুক, সমাজের অগ্রগামী। উভয়ের সাধনাতেই একটা স্বতন্ত্র আদর্শের কল্পনা থাকিলেও, সে কল্পনায় কেবলমাত্র সংস্কার-প্রবৃত্তি বা missionary spirit-ই ছিল না; জাতির হৃদ্‌গত আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার প্রাণের ভুল ও অভ্যাসের মোহ—এ সকলের প্রতি তাঁহাদের একটি শ্রদ্ধা ও মমত্ব-বোধ ছিল; এক কথায় তাঁহারা জাতিরই একজন হইয়া তাহারই ভাবনার ভার লইয়াছিলেন। এইজন্যই আমরা এই দুই মহাত্মাকেই বাঙালীর এই দ্বিতীয় Renaissance-এর প্রধান প্রতিনিধিরূপে বরণ করি। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, আধুনিক বাঙালীর প্রাণমূলে যেখানে যেটুকু সত্যকার স্পন্দন জাগিয়াছে, বাঙালীর জীবনে যেখানে সেটুকু সত্যকার রঙ ধরিয়াছে, যে সকল Idea—মস্তিষ্ক-বিলাস নয়—তাহার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে যেটুকু খাঁটি জাতীয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের বাণীই মিলিবে। সত্য বটে, গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের এই সাধনার সূত্র যেন কতকটা ছিন্ন হইয়াছে, আধুনিকতম বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে তাঁহাদের সেই ভাব-প্রতিমা যেন ম্লান হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু তাহার কারণ এই নয় যে, বাঙালীর সেই নবজাগরণ প্রভাতের পর প্রভাতে নূতনতর হইয়া উঠিতেছে; বরং তাহার কারণ ইহাই বলিয়া প্রতীতি হয় যে, ইতিমধ্যে রাষ্ট্রে ও সমাজে এমন বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে, এবং দেশের জলবায়ুতে মারী-বিষ এমনই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, বাঙালী ক্রমেই শক্তিহীন ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছে, তাহার প্রাণশক্তি দ্রুত ক্ষয় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একালেই সেই পাশ্চাত্য-প্রভাব আর এক দিক দিয়া তাহার ভগ্নদেহ আক্রমণ করিয়াছে—পশ্চিমের সহিত সেই সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, ততই তাহার বিষকে হজম করিবার শক্তি কমিয়া আসিতেছে। তাই যে Renaissance-এর কথা বলিয়াছি তাহার পরিণতির পথ আজ রুদ্ধ হইয়াছে, বাঙালীর বাঙালীত্ব আজ মুমূর্ষু। ইহার উপর, কিছুকাল যাবৎ রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে যাহা শুনাইয়া আসিতেছেন, তাহাও বাঙালীর এই শেষ দশারই উপযুক্ত। বিশ্বকবির অতি উচ্চ, ব্যক্তিগত, সূক্ষ্ম ভাববিলাস তাহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া ভূমায় বিলীন করিবার পক্ষে বড়ই ফলপ্রদ হইয়াছে। যে জাতির মেরুদণ্ড বক্র ও শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যাহার উদরে অন্ন নাই, চক্ষে দীপ্তি নাই—যে জাতিহারা, বাস্তুহারা হইতে বসিয়াছে—সে এখন কবির মুখে বিশ্বভারতী ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনিয়া কেমন করিয়া সঞ্জীবিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কবি তাহাকে বঙ্গভারতীর পরিবর্ত্তে বিশ্বভারতীর আদর্শে দীক্ষিত করিতেছেন; দেশ ও জাতি ভুলাইয়া মহামানবের বন্দনা-গান শুনাইতেছেন; তাহার রসবোধ উন্নত ও মার্জ্জিত করিবার জন্য সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলায় নব-নব ধারায় বেগসঞ্চারে সাহায্য করিতেছেন; সত্যকার রক্ত-মাংসের চেতনা স্তিমিত করিয়া, অরূপ-রূপকের মিষ্টিক-রসে তাহার মরণাহত

প্রাণে সান্ত্বনা সিঞ্চন করিতেছেন। তাই মনে হয়, বাঙালীকে লইয়া বিধাতার কি পরিহাস! এত বড় প্রতিভাও জাতির পক্ষে নিষ্ফল হইল! রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর Renaissance-এর শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক না হইয়া তাহার মৃত্যুযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন!

চৈত্র, ১৩৩৫